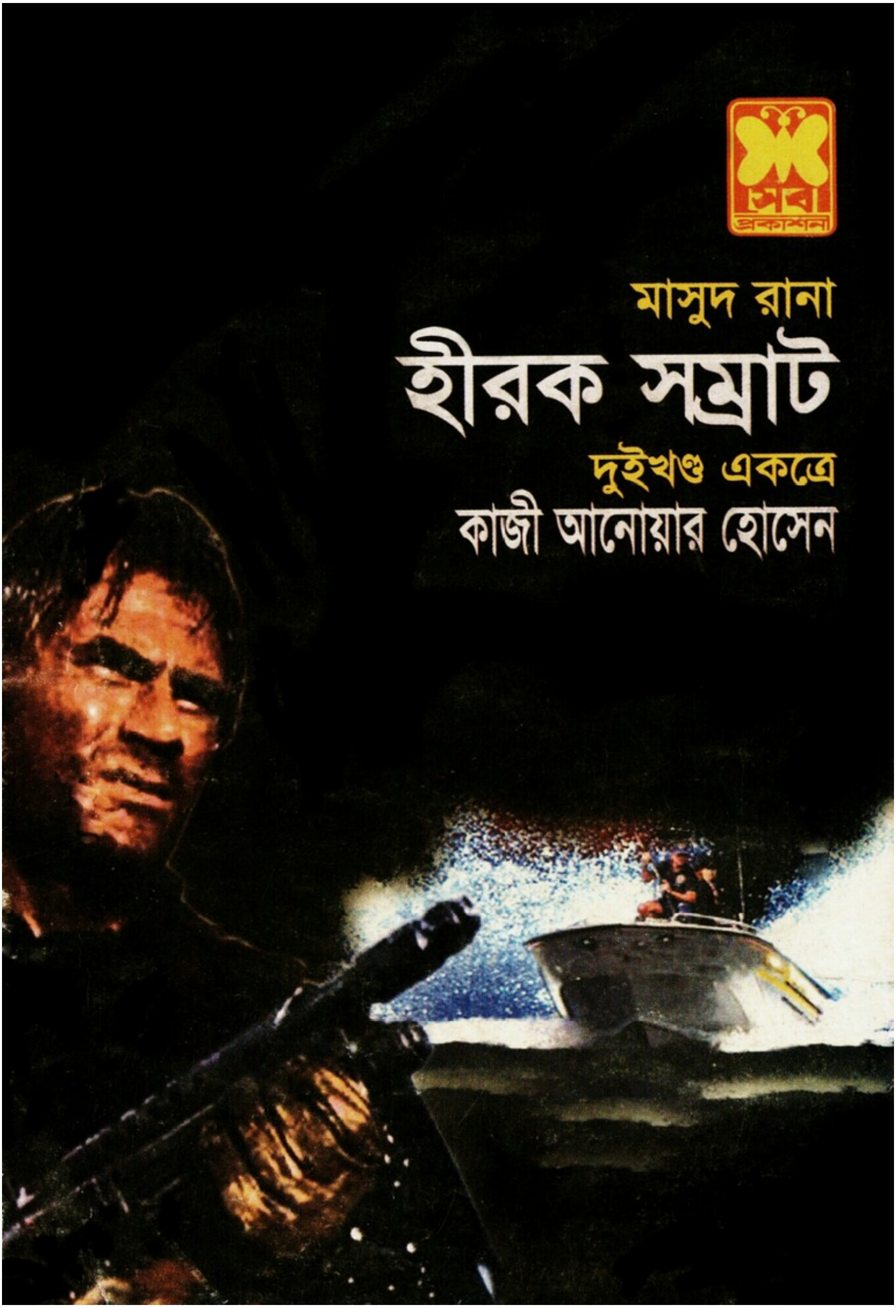

সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
হীরক সম্রাট
দুইখণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

হীরকসম্রাট

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

দেড় হাজার মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, জিওলজিস্ট আর সাধারণ শ্রমিককে চাকরি দেওয়ার নাম করে বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারপর এক বছর হতে চলল তাদের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট্ট একটা সূত্র পেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে চলে এল মাসুদ রানা, এসে দেখে স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী আর দ্বীপ ও জাহাজের লোকজন কি এক রহস্যময় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল, নিখোঁজ বাংলাদেশী ও ভয়াবহ মড়কের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে, আর নেপথ্যে বসে কলকাঠি নাড়ছেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের একজন, হীরকসম্রাট রডনি বুমার। শুরু হলো রানার সঙ্গে তাঁর মরণপণ লড়াই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-16-7263-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩

Masud Rana
HIRAKSAMRAT
Part I & II
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

বিয়াল্লিশ টাকা

হীরক সম্রাট-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

কুক আর সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পুবে, রিমাতারা থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে রুরালি এক অভিশপ্ত দ্বীপ . বহুকাল আগে থেকেই প্রকৃতির কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে, এই পাথুরে দ্বীপ থেকে দূরে সরে থাকো। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যারাই পা ফেলে রুরালিতে, তাদের সাধারণত আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হয় না অন্তত রুরালিতে ছড়িয়ে থাকা কবরগুলো সেই সাক্ষ্যই দেয়।

দ্বীপটায় দেখার মত তেমন কিছুই নেই বহুকাল আগে বিস্ফোরিত হয়েছিল আগ্নেয়গিরি, সেই থেকে পুরু ছাই গোটা দ্বীপ ঢেকে রেখেছে। সেজন্যেই অ্যান্টার্কটিক মহাদেশ খুব বেশি দূর না হলেও এখানে কখনও বরফ জমতে পারে না, গাছপালাও জন্মায় না। পাহাড় আর উপত্যকার রঙ ধূসর ও কালচে; একঘেয়ে আর বৈচিত্র্যহীন। কয়েক জাতের আগাছা ছাড়া গাছপালা কিচ্ছু নেই। ঘর বানাবার জন্যে অঢেল ছোট পাথর থাকায় এখানে শুধু পেঙ্গুইনরা বাস করে। ডিম পাড়ার জন্যে নির্জন রুরালি তাদের জন্যে আদর্শ জায়গা।

প্রকৃতি প্রথম বার হুঁশিয়ার করে দেয় আঠারোশো উনষাট সালে। একদল নরওয়েজিয়ান নাবিক অ্যান্টার্কটিক অভিযানে বেরিয়ে এদিকে এসেছিল, বরফে ধাক্কা খেয়ে তাদের জাহাজ ভেঙে যায় রুরালিতে আশ্রয় নেয় তারা। সঙ্গে যে খাবার ছিল তাতে দুটো শীত কোনরকমে কাটল, তারপর একে একে মারা গেল সবাই। নিখোঁজ হবার প্রায় এক যুগ পর তাদের অবিকৃত লাশ আবিষ্কার করল ব্রিটিশরা, রুরালিতে একটা হোয়েলিং স্টেশন গড়ে তুলতে এসে। অসম্ভব ঠাণ্ডা বলেই লাশগুলোয় পচন ধরেনি। পাথর কেটে কবর তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, ব্রিটিশরা অবশ্য কাজটা খুব যত্নের সঙ্গেই করে।

ওই কবরস্থানে পরে আরও অনেক লোককে জায়গা দিতে হয়। তিমি ধরার মরশুম শুরু হবার আগে রহস্যময় অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে কিছু লোকের মারা যাওয়াটা প্রতি বছর যেন একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়াল আর মরশুম শুরু হবার পর দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু তো আছেই। প্রতি বছর আরও কিছু লোক প্রাণ হারাল হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন থেকে দূরে চলে যাওয়ায়—হয় তারা অপ্রত্যাশিত ঝড়ের মধ্যে পড়ে, নয়তো তীব্র ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হয় এদের প্রত্যেকের কবরই চিহ্নিত করা আছে। শীতে আটকা পড়া হোয়েলাররা আর কোন কাজ না পেয়ে পাথরের ফলকে বাটালি দিয়ে মৃত ব্যক্তির নাম খোদাই করত। অপমৃত্যুর সংখ্যা মাত্রা ছাড়াতে উনিশশো তেত্রিশ সালে ব্রিটিশরা স্টেশনটা বন্ধ করে দেয় ততদিনে ছোট দ্বীপ রুরালিতে ষাটজন লোককে কবর দেয়া হয়েছে

রুরালি প্রায় পরিত্যক্ত দ্বীপ হলেও, আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, অভিযাত্রী আর নাবিকদের অস্থির আত্মা নিশ্চয়ই আজও এখানে ঘোরাফেরা করে। তারা কি কখনও ভাবতে পেরেছে যে তাদের এই বিশ্রামের জায়গায় ভিড় জমাবেন সরকারী হিসাবরক্ষক, আইনবিদ, গৃহবধূ, অবসরপ্রাপ্ত প্রথমশ্রেণীর নাগরিকরা? ভাবতে পেরেছে, রুরালিতে তাঁরা আসবেন বিশাল এক বিলাসবহুল প্লেজার শিপে চড়ে? তীরে নেমে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন কবরগুলোর দিকে, ফলকে খোদাই করা নামগুলো বিড়বিড় করে পড়বেন? রুরালিতে পা দিয়ে খুব কম লোকই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে, কে জানে প্রকৃতির সেই পুরানো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ট্যুরিস্ট দলটারও কোন ক্ষতি বা বিপদ হয় কিনা।

ভাসমান প্রাসাদ মর্নিং রোজ থেকে আরোহীরা রুরালি দ্বীপে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সবাই তাঁরা কৌতূহলী ও উত্তেজিত, দ্বীপটা সম্পর্কে কারও মনে কোন ভয় নেই। এই প্রথম কোন ট্যুরিস্ট পার্টি পা ফেলছে রুরালিতে, কাজেই এ সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। প্ল্যান অনুসারে এদিকের পাঁচটা দ্বীপে নামবেন তাঁরা, রুরালি পড়েছে তিন নম্বরে। ট্যুরিস্টরা বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান, তবে কিছু আমেরিকানও আছেন; প্রায় সবাই প্রতি বছর নিয়মিত ভ্রমণে বেরোন। ইতিমধ্যে নাম করা বেশিরভাগ জায়গাই তাঁদের দেখা হয়ে গেছে। এখন তাঁরা এমন সব জায়গা দেখতে চান যেখানে আগে খুব কম লোকই গেছে। ডেকে, বোর্ডিং মইয়ের কাছে ভিড় করেছেন সবাই, টেলিফটো লেন্স তাক করে রেখেছেন ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইনের দিকে। ওঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মলি, ইতিমধ্যে বিলি করা কমলা রঙের ইনসুলাটেড জ্যাকেট আর লাইফ জ্যাকেট চেক করছে। মলি সত্যি অদ্ভুত এক মেয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা চাই, প্রাণশক্তিও যেন ফুরোবার নয় এই দলে মহিলা যাঁরা আছেন তাঁদের সবার চেয়ে লম্বা ও, ব্যায়ামপুষ্ট সুঠাম শরীর। ওর লালচে-সোনালি লম্বা চুল একজোড়া সাপের আকৃতি পেয়েছে, বেণী হয়ে ঝুলছে পিঠে। চোখ দুটোয় গভীর সাগরের নীল খেলা করে, চওড়া চোয়াল, ঠোঁটে সবসময় আন্তরিক হাসি লেগে আছে–ওপরের সারির একজোড়া দাঁতের মাঝখানে খুদে একটা ফাঁক।

মলির বয়েস ছাব্বিশ, জুলজিতে মাস্টার্স করেছে গ্র্যাজুয়েট হবার পর মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে তিন বছরের একটা কোর্স কমপ্লিট করতে হয় ওকে–পোলার এলাকায় পশু-পাখি পর্যবেক্ষণ। এই কোর্সই মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট পাবার পথ সুগম করে দেয়। আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে ছুটি দেয়া হয় ওকে। কোথায় যাওয়া যায় ভাবছিল মলি, এই সময় স্যাকার অ্যান্ড স্যাকার নামে একটা ক্রুজ লাইন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর-এর ঘোষণা দিল। এ-ধরনের ট্যুরের আয়োজন আগেও তারা করেছে, যোগ্য গাইডদের খুব ভাল বেতন দেয় কাজেই সুযোগটা নিল মলি, কাজটা পেয়ে কোম্পানীর জাহাজ মর্নিং রোজে চেপে বসল।

সব মিলিয়ে নব্বুইজন আরোহী। ন্যাচারালিস্ট গাইড মলিকে নিয়ে চারজন, ওদের কাজ তীরে নামার পর ট্যুরিস্টদের ঘুরিয়ে-বেড়িয়ে আনা। রুরালিতে

পেঙ্গুইনদের কলোনি তো আছেই, হোয়েলিং স্টেশনের ভবনগুলো পরিত্যক্ত হলেও আজও ভেঙে পড়েনি। দেখার মত আর আছে কবরস্থানটা। এ-সব আছে বলেই রুরালিকে দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থানের তালিকায় ফেলা হয়েছে।

দ্বীপটায় পা ফেলার পর সম্ভাব্য কি বিপদ ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আচরণবিধিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। শ্যাওলা বা আগাছায় কেউ পা ফেলতে পারবে না। কেউ কোন নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারবে না, এমনকি ছোট একটা পাথর নেয়াও বারণ। কোন পাখি বা প্রাণী দেখলে সেটার পাঁচ মিটারের মধ্যে যাওয়া নিষেধ।

রুরালিতে যেতে মাত্র বিশজন রাজি হলেন। তালিকা ধরে তাঁদের নাম উচ্চারণ করল মলি, একে একে তাঁরা বোর্ডিং ল্যাডারে পা রাখলেন, সেখান থেকে উঠে পড়লেন কমলা রঙের রাবার বোটে। সবার শেষে মলি উঠবে, এই মুহূর্তে বোর্ডিং ল্যাডারের মাথায় ওর সঙ্গে কথা বলছেন মর্নিং রোজ-এর ফার্স্ট অফিসার।

মলিকে দু'ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হলো। একশো মাইল দূরে একটা ঝড় তৈরি হচ্ছে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে মর্নিং রোজ রুরালির উত্তর প্রান্তে আশ্রয় নেবে। ওদিকে সীল কলোনি আছে, ট্যুরিস্টদের একটা কৌতূহলী গ্রুপকে এই সুযোগে সেটা দেখিয়ে আনাও হবে। ঠিক দু'ঘণ্টা পর মলিদের নিতে আসবে মর্নিং রোজ। ইতিমধ্যে যদি কোন বিপদ ঘটে, পোর্টেবল কমিউনিকেটর আছে মলির কাছে, জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে ও।

রাবার বোট জোডিয়াক রওনা হয়ে গেল। সাগরের পানি আয়নার মত সমতল আর চকচকে। বাছাই করা ট্যুরিস্টদের উদ্দেশে লেকচার দিচ্ছে মলি, 'রুরালি প্রথম ধরা পড়ে আঠারো শো বিয়াল্লিশ সালে একজন নরওয়েজিয়ান নাবিকের চোখে। আঠারো শো ঊনষাট সালে নরওয়ের একদল অভিযাত্রী ওখানে মারা যায়। ওখানে ওদের কবর আছে...'

'দ্বীপটায় এখন কেউ বাস করে?'

'উত্তর প্রান্তে আর্জেন্টিনা একটা রিসার্চ স্টেশন খাড়া করেছিল বছর পাঁচেক আগে, এখনও সেটা আছে কিনা বলতে পারছি না।'

'দ্বীপটা কত বড়?' আশি বছরের এক বৃদ্ধা জানতে চাইলেন।

'উত্তর-দক্ষিণ ত্রিশ কিলোমিটার, পুব-পশ্চিমে কিছুটা কম,' জবাব দিল মলি।

আরোহীরা পানির তলায় নগ্ন পাথর দেখতে পাচ্ছে, কোন রকম জলজ উদ্ভিদ গজায়নি। একজন ক্রু আউটবোর্ড মোটর বন্ধ করে দিল, ধীরে ধীরে পাথুরে তীরে ভিড়ল রাবার বোট। নাম না জানা এক ঝাঁক পাখি উড়ল আকাশে। জ্যান্ত আর কিছু চোখে পড়ল না। আরোহীরা নামার পর বোটটাকে টেনে নুড়ি পাথর ছড়ানো তীরে তোলা হলো। এতক্ষণে ওদের জাহাজ মর্নিং রোজের দিকে তাকাল মলি। নাক ঘুরিয়ে নিয়ে এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে সেটা, বাঁক নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিপথের বাইরে।

অন্যান্য ক্রুজ শিপের তুলনায় মর্নিং রোজ আকারে ছোট। মাত্র বাহাত্তর মিটার লম্বা ওটা, পঁচিশ হাজার টনী। নরওয়েতে তৈরি করা হয়েছে পোলার এলাকায় চালাবার উপযোগী করে, প্রয়োজনে আইসব্রেকার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

কবরস্থানে পৌঁছে ছবি তোলার জন্যে বিশ মিনিট সময় বেঁধে দিল মলি। তারপর দলটাকে খেদিয়ে নিয়ে এল হোয়েলিং স্টেশনে। এখানে তিমির সাদা হাড়গোড় পাহাড়ের মত স্তূপ হয়ে আছে। মলি ব্যাখ্যা করল কিভাবে একটা তিমিকে ধাওয়া করা হয়, হার্পুন দিয়ে কিভাবে শিকার করা হয়, বিশাল প্রাণীটাকে কেটে কি পদ্ধতিতে তেল বের করা হয়। পরিত্যক্ত হলেও, হোয়েলিং স্টেশনটাকে অতীতের স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখার জন্যে বছরে একবার এখানে আসে ব্রিটিশরা, প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ করা হয়। বিল্ডিংগুলোকে দেখে মনে হবে ভেতরে লোকজন আছে। ভেতরে ঢোকার পর দেখা গেল বেডরুমের বিছানা, কিচেনের তৈজস-পত্র সব যেখানে যেমন থাকার কথা তেমনি আছে। মলি সাবধান করে দিল, 'কেউ কোন জিনিস ছোঁবেন না, প্লীজ।'

এবার গুহার ভেতর ঢোকার পালা। হোয়েলাররা পাথর কেটে এই গুহা তৈরি করে, তেলের পিপে রাখার জন্যে। এখানে একটা বাক্স আছে, ভেতরে অনেকগুলো টর্চ, সম্ভবত ব্রিটিশরাই রেখে গেছে। সবাইকে একটা করে টর্চ বিলি করল মলি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কেউ ক্লসট্রোফোবিয়ায় ভোগেন না তো?' উত্তরে সত্তর আর আশি বছরের দুই বৃদ্ধা হাত তুললেন।

'ঠিক আছে, আপনারা দু'জন এখানে অপেক্ষা করুন,' বলল মলি। 'গুহা দেখে ফিরতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না আমাদের।'

দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা টানেল ধরে এগোল ট্যুরিস্টরা। খানিক দূর যাবার পরই চওড়া একটা গুহায় পৌঁছুল সবাই। অসংখ্য পিপে দেখা গেল, দেয়াল ঘেঁষে সাজানো রয়েছে। ট্যুরিস্টরা গুহার ভেতর ঢোকার পর দাঁড়াল মলি, প্রবেশপথের মুখের কাছে পড়ে থাকা বিশাল পাথরটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'এই যে বিরাট পাথরটা দেখছেন, এটা গুহার ভেতর থেকে কাটা হয়েছে। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঠেকাবার জন্যে এটা ব্যবহার করা হত। একটা আর্মারড ট্যাংকের মত ভারী, তবে কৌশলটা জানা থাকলে বাচ্চা একটা ছেলেও ওটাকে নড়াতে পারবে।' এগিয়ে এসে পাথরটার মাথার দিকে এক জায়গায় হাতের তালু রেখে চাপ দিল মলি, খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে প্রবেশপথ বন্ধ করে দিল পাথরটা। 'বিস্ময়কর এঞ্জিনিয়ারিং, মানতেই হবে। নিচে, ঠিক মাঝখানে, একটা শ্যাফটের মুখে জটিল পদ্ধতিতে ব্যালেন্স করা আছে পাথরটা। ভুল দিকে ঠেলুন, এক চুল নড়বে না।'

গুহার ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার, অবশ্য সে অন্ধকার দূর করছে টর্চের আলো। একটা পিপে থেকে তেল তুলে সবাইকে পরীক্ষা করতে দিল মলি। 'এদিকে অসম্ভব ঠাণ্ডা তো, একশো ত্রিশ বছর পরও তেল তাই পচেনি...'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ ও কাতর একটা চিৎকার শুনে থেমে গেল মলি। তাকিয়ে দেখে, প্রৌঢ়া এক মহিলা নিজের মাথার দু'পাশ চেপে ধরেছেন চোখের পলক পড়ল না, আরও ছ'জন একই আচরণ শুরু করল। মহিলারা যন্ত্রণা আর আতঙ্কে চিৎকার করছেন, পুরুষরা গোঙাচ্ছেন। ছুটোছুটি করে ঘটনা কি জানার চেষ্টা করছে মলি, ওদের চোখে তীব্র ব্যথাতুর দৃষ্টি লক্ষ করে হতভম্ব হয়ে পড়ল। 'কি হয়েছে বলুন আমাকে! আপনারা এমন করছেন কেন?' কান্না আর গোঙানির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা। 'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

পরমুহূর্তে শুরু হলো ওর নিজের পালা। ছোরা গাঁথার মত অনুভূতি হলো মস্তিষ্কে, অকস্মাৎ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ডের গতি। নিজের অজান্তেই মাথার দুই পাশ দু'হাতে চেপে ধরল মলি। ট্যুরিস্টদের দিকে তাকাল ঝাপসা দৃষ্টিতে। ব্যথা আর আতঙ্ক এক ধরনের ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ওদেরকে, প্রত্যেকের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারপর হঠাৎ বমি পেল ওর, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

কি ঘটছে কারও কোন ধারণা নেই। গুহার ভেতর বাতাস এত ভারী হয়ে উঠেছে যে শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। টর্চের আলো অপার্থিব নীলচে আভার মত লাগছে। কোন কম্পন সৃষ্টি হয়নি, ভূমিকম্পও হয়নি, অথচ গুহার ভেতর ধুলো উড়ছে। একমাত্র শব্দ বলতে যন্ত্রণায় কাতর ট্যুরিস্টদের চিৎকার-চেঁচামেচি।

মলির চারপাশে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে সবাই। প্রবল অবিশ্বাস নিয়ে মলি উপলব্ধি করল, ওর চিন্তাশক্তি জট পাকিয়ে যাচ্ছে, স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে ধারণাগুলো লোপ পাচ্ছে।

অজানা কোন উৎস থেকে ছোবল মেরেছে মৃত্যু। কয়েক সেকেন্ড পর, কোন ব্যাখ্যা নেই, মাথা ঘোরা, ব্যথা আর বমি বমি ভাব হালকা হয়ে এল। তারপর অতি দ্রুত সবাই আবার সুস্থ বোধ করল।

নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে মলির। তেলের একটা পিপেতে হেলান দিল ও, চোখ বুজে আছে, তীব্র ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

দু'মিনিট কারও মুখে কোন কথা ফুটল না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তিনি তাঁর স্ত্রীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে কপালে হাত বুলাচ্ছেন 'কি ঘটল বলুন তো?' বেসুরো গলায় জানতে চাইলেন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মলি। 'আমার কোন ধারণাই নেই

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে অনেক কষ্টে দাঁড়াল মলি। সবাই বেঁচে আছে দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। ক্লান্তি ছাড়া আর কোন অভিযোগ নেই কারও। সবাইকে গুহায় অপেক্ষা করতে বলে বিশাল পাথরটা গুহামুখ থেকে সরাল। টানেলের মুখে দুই বৃদ্ধাকে রেখে আসা হয়েছে, দেখে আসা দরকার তাঁরা কেমন আছেন তাছাড়া, মর্নিং রোজ-এর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে।

টানেল থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে মলি দেখল, সাগরকে আগের মতই নীল আর শান্ত লাগছে। আকাশে কোন মেঘ নেই, সূর্য আরেকটু ওপরে উঠে এসেছে। তারপর দুই বৃদ্ধার দিকে চোখ পড়ল ওর। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তাঁরা, নাগালের মধ্যে পাথরগুলোকে এমন শক্ত ভঙ্গিতে ধরে আছেন, যেন অজানা কোন শক্তি ওগুলোকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। ঝুঁকল মলি, ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল। অকস্মাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ও। দু'জনের কারও চোখেই দৃষ্টি নেই, হাঁ হয়ে আছে মুখ–দু'জনেই পেট থেকে সব উগরে দিয়েছেন।

ছুটে রাবার বোটের কাছে চলে এল মলি। যে ক্রু ওটা চালিয়ে এনেছিল সে-ও মারা গেছে–তার চোখও স্থির ও বিস্ফারিত, মুখ খোলা, মারা যাবার আগে বমি করেছে। দুই বৃদ্ধার মত ক্রুর গায়ের রঙও কেমন নীলচে-বেগুনি হয়ে উঠেছে।

কোমরে, বেল্টের সঙ্গে আটকানো কমিউনিকেটর-এর সুইচ অন করল মলি, মেসেজ পাঠাচ্ছে, 'মর্নিং রোজ, তীরে আমরা প্রথম দল। এখানে ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে। প্লীজ সাড়া দিন এখুনি। ওভার।'

কোন সাড়া নেই।

বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছে মলি। নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল, কোন জবাব নেই।

সারাটা দিন কেটে গেল, মর্নিং রোজ ফিরল না। রাত এগারোটার দিকে মেরু সূর্য দিগন্তরেখার দিকে কাত হয়ে পড়ল। আধ ঘণ্টা পরপর মর্নিং রোজকে ডাকছিল মলি, ট্র্যান্সমিটারের ব্যাটারি বাঁচানোর জন্যে এখন আর ডাকছে না। ওর পোর্টেবল রেডিওর রেঞ্জ মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার, অথচ পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে মর্নিং রোজ ছাড়া অন্য কোন জলযান নেই বলেই ওর ধারণা। দ্বীপের অপরপ্রান্তে আর্জেন্টিনাদের একটা রিসার্চ স্টেশন আছে বটে, কিন্তু সেখানে শীতকালে লোকজন থাকে কিনা সন্দেহ; থাকলেও তারা মলির মেসেজ না-ও পেতে পারে। আর পেলেও যে সাহায্য করতে আসবে বা আসতে পারবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

মর্নিং রোজ গেল কোথায়? এই চিন্তাটা মলিকে পাগল করে দিচ্ছে। ওরা যে রহস্যময় অসুখে আক্রান্ত হয়েছিল, সেই একই অসুখে পড়েনি তো মর্নিং রোজের ক্রু আর প্যাসেঞ্জাররা? সবাই তারা মারা যায়নি তো?

গুহার ভেতর বিশজন লোককে নিয়ে আপাতত নিরাপদই থাকবে মলি। তবে সঙ্গে খাবার আর বিছানাপত্র না থাকায় দু'তিন দিনের বেশি টিকে থাকা সম্ভব হবে না। টেমপারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের অনেক নিচে। সময়মত সাহায্য না পৌছুলে ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাবে শরীরগুলো। না, তা হবে না। গুহার ভেতর তিমির তেল আছে। অন্তত আলো আর আগুনের কোন অভাব ঘটবে না। সাহায্য না এলে তারা আসলে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

চব্বিশ ঘণ্টা পর তিনজন পুরুষকে নিয়ে পেঙ্গুইন ধরতে বেরুল মলি। ডিম পাড়ার মরশুম চলছে, সমতল সৈকতের একটা প্রান্ত পুরোটাই দখল করে নিয়েছে ওগুলো। সিদ্ধান্ত হয়েছে, কিছুই যখন নেই, আপাতত পেঙ্গুইনের মাংস খেয়েই বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে ওরা। কিন্তু পেঙ্গুইনের ডিম পাড়ার জায়গায় এসে ওরা দেখল, সবগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, একটাও নড়ছে না। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা, দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাখির মধ্যে একটাও বেঁচে নেই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পর শুরু হলো তুষার ঝড়। ঝড়ের মধ্যে গুহা ছেড়ে কেউ ওরা বেরুল না। শীত, খিদে আর নার্ভাসনেসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন এক বৃদ্ধা। কোন প্রতিবাদ করেননি, কোন অস্থিরতাই প্রকাশ করেননি, মারা গেলেন নিঃশব্দে। মলির হাতটা ধরে ছিলেন, সেটা আলগা হয়ে গেল শুধু।

ঝড় কমল দু'দিন পর। সবাইকে ইঙ্গিতে গুহায় থাকতে বলে টানেল হয়ে একা বাইরে বেরিয়ে এল মলি। সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়েছে ও, টানেলের শেষ অংশটুকু হেঁটে আসতে পারল না, হামাগুড়ি দিয়ে দিনের আলোয় বেরিয়ে এল।

মাথা ঘুরছে, চোখে ঝাপসা দেখছে। বাতাসে প্রচুর তুষার কণা, বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। প্রথমে মূর্তিটাকে চিনতে পারল না, মনে হলো একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মনে পড়ল রুরালিতে কোন গাছ নেই। ভাবল, তাহলে হয়তো দৃষ্টিভ্রম। তবে দৃষ্টিভ্রম হোক বা না হোক, মূর্তিটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। দাঁড়াবার চেষ্টা করল মলি, পারল না। তবে শোয়া অবস্থা থেকে বসতে পারল। মূর্তিটার গায়ে তুষার আর বরফ লেগে রয়েছে। প্রায় সাদাই দেখাচ্ছে। তুষারমানব নাকি? মলি মনে মনে প্রার্থনা করছে, ঈশ্বর, এ যেন দৃষ্টিভ্রম না হয়, যেন স্বপ্ন না হয়।

মূর্তিটা এগিয়ে এসে ওর দিকে ঝুঁকল। কাঁধ ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। মলি উপলব্ধি করল, এত শক্ত হাত আগে কখনও ওর কাঁধ ধরেনি। 'আপনি কে? কোত্থেকে এলেন? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি?'

আগন্তুক খুব লম্বা, পারকা পরে আছে, বাম বুকের ওপর একটা ব্যাজ, তাতে লেখা 'নুমা'। চোখ-থেকে গগলস খুলল, দৃষ্টিতে কৌতূহল আর বিস্ময়, খানিকটা উদ্বেগও। 'আপনি কে? এখানে কি করছেন?'

কি ঘটেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল মলি সবশেষে জানতে চাইল, 'দুনিয়া জুড়ে কোন বিপর্যয় ঘটেছে নাকি?'

লোকটা চোখ সরু করে জবাব দিল, 'আমার অন্তত জানা নেই। এ প্রশ্ন কেন করছেন?'

রহস্যময় অসুস্থতা সম্পর্কে বলল মলি। দুই বৃদ্ধা ও একজন ক্রু, যারা টানেলের বাইরে ছিল, মারা গেছে। মারা গেছে কলোনির সমস্ত পেঙ্গুইন। ওরা যারা গুহার ভেতর ছিল, সম্ভবত সেটার দরজা বন্ধ থাকাতেই সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লেও, মারা যায়নি কেউ। খবরটা আগন্তুককে বিস্মিত করল কিনা বোঝা গেল না। প্রতিবাদ সত্ত্বেও দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নিল মলিকে, টানেলের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'ঠাণ্ডা বাতাসে থাকা ঠিক নয়, চলুন গুহায় ঢুকি। ওখানে আরও বিশজন আছেন বলছেন?'

'উনিশজন,' বলল মলি। 'গত চারদিন কারও পেটে কিছু পড়েনি। একজন মারা গেছেন। কিন্তু··· আপনি কে? কোত্থেকে এলেন রুরালিতে?'

আগন্তুক মলির কাছ থেকে টর্চটা চেয়ে নিল।

'আপনি সম্ভবত ভারতীয়,' বলল মলি।

মাথা নাড়ল আগন্তুক। 'না। আমি বাংলাদেশী।'

'তাই!' হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল মলি। 'আমি কিন্তু সত্যি আপনাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।'

'জানেন? কি জানেন?'

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল মলির চেহারা। 'অনেক কিছু জানি বলাটা ঠিক হয়নি, দুঃখিত। আমি আপনাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানি। সে-সম্পর্কে বেশ কয়েকটা বই পড়েছি।'

'মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানলে বাংলাদেশ সম্পর্কে আর কিছু জানতে বাকি থাকে না,' আগন্তুক বলল। 'ধন্যবাদ।'

'আপনার নামটা তো বলছেন না।'

'আমি মাসুদ রানা, আপনার…'

'আমি মলি, শুধুই মলি,' বলল সে। 'নামের বাকি অংশটুকু সাধারণত ব্যবহার করি না।'

ওহ্, গড! বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। একেই বলে কাকতালীয় ঘটনা!

টানেলের ভেতর ঢুকে মলিকে নামিয়ে দিল রানা, তারপর মুখ থেকে স্কি মাস্কটা খুলল। মলি উপলব্ধি করল, আগে কখনও সে কল্পনাও করেনি, কোন পুরুষের চোখে এত মায়া থাকতে পারে। ওর মনে হলো, এ এমন একজন পুরুষ, যার আশ্রয়ে যে-কোন মেয়ে নিরাপদ বোধ করবে।

এক মিনিট পর ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ট্যুরিস্টরা সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে ঘিরে ধরল রানাকে, যেন প্রিয় ফুটবল টীমের ক্যাপটেন ও, এইমাত্র ফাইনাল খেলায় একমাত্র গোল করে দলকে জিতিয়েছে। বৃদ্ধারা যেন তাদের আদরের সন্তানকে ফিরে পেয়েছে। উষ্ণ কোমল আলিঙ্গনে খুবই লজ্জা পাচ্ছে রানা, কিন্তু বাধাও দিতে পারছে না। মনে মনে ওঁদের প্রশংসা করল ও, চার দিন না খেয়ে আছেন অথচ একজনও মুমূর্ষু হয়ে পড়েননি। সবাই কথা একযোগে বলছেন, জানতে চাইছেন, হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো রানা।

নিজেকে নুমার অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্টর বলে পরিচয় দিল রানা। এদিকের পানি থেকে সীল আর ডলফিন আশঙ্কাজনক হারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তাই একটা রিসার্চ ভেসেল পাঠানো হয়েছে তদন্ত করার জন্যে। ওই রিসার্চ ভেসেল থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল ওরা, এই সময় রুবালির তীরে জোডিয়াক রাবার বোট দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে বোট আছে অথচ মানুষজন দেখা যায় না, ব্যাপারটা কি? ওর কথায় তিনশো মিটার দূরে হেলিকপ্টার নামায় পাইলট। কপ্টারে একজন বায়োলজিস্টও আছে। বোটটার দিকে হেঁটে আসার সময় মলিকে দেখতে পায় ও

মলি জানতে চাইল, 'আপনাদের রিসার্চ শিপ এখান থেকে কতদূরে?'

'চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পুবে।'

'হেলিকপ্টার নিয়ে ঘোরাফেরা করার সময় আমাদের মর্নিং রোজকে আপনারা দেখেননি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'গত এক হপ্তায় অন্য কোন বোট চোখে পড়েনি।'

এক বৃদ্ধ কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন, 'আমাদের জাহাজে প্রায় সত্তর জন ট্যুরিস্ট আছেন, ক্রু আর নাবিক আছেন পনেরো-ষোলোজন, তারা কি বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে?'

'আগে আপনাদেরকে রিসার্চ শিপে নিয়ে যাই, তারপর এ-সব কথা ভাবা যাবে,' বলল রানা 'হেলিকপ্টারটাকে কাছাকাছি আনতে হবে। তবে পাঁচ-ছ'জনের বেশি জায়গা হবে না, অর্থাৎ বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হবে। আমি তাহলে যাই, পাইলটকে বলি…'

'আপনার সঙ্গে আসতে পারি আমি?' জিজ্ঞেস করল মলি।

'পারেন, যদি আপনার নাম মলি বুমার হয়,' বলল রানা।

হতভম্ব দেখাল মলিকে। 'ওহ্, গড! আপনি আমার পুরো নাম জানেন? কিন্তু কিভাবে?'

রানা শুধু ম্লান একটু হাসল, জবাব দিল না।

নুমার হেলিকপ্টারে, পাইলটের সীটে বসে রয়েছে ববি মুরল্যান্ড; একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। লম্বা ও চওড়ায় দু'পায়ে খাড়া একটা ভল্লুকের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাবে তার, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, রানাকে দেখতে না পেয়ে চোখ বুলাচ্ছে রিস্টওয়াচে, তারপর আবার মন দিচ্ছে খেলায়। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ সামান্য একটু বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্ব-পুরুষরা রোমান ছিলেন। তার একমাত্র বন্ধু মাসুদ রানা, আর বন্ধুর জন্যে পারে না এমন কোন কাজ তার অভিধানে নেই। শেষবার খেলা থেকে মুখ তুলে সে বলল, 'রানার তো এত দেরি হবার কথা নয়।'

'কতক্ষণ হলো গেছেন তিনি?' জানতে চাইল নুমার মেরিন বায়োলজিস্ট থমাস কীল।

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'ওই আসছেন,' উইন্ডশীল্ডের দিকে চোখ পড়তে বলল কীল। 'কি সাংঘাতিক!'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মুরল্যান্ডও বাইরে তাকাল। এক মুহূর্ত পর সে-ও সবিস্ময়ে বলল, 'সত্যি সাংঘাতিক! আমরা জানতাম রুরালির এদিকে কোন মানুষজন নেই, অথচ রানা···মেয়েটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দরী, তাই না? আল্লাই জানে কে ও।'

নুমার রিসার্চ শিপ সী লায়ন-এ পৌছুল রুরালিতে আটকা পড়া ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটা। ঘটনা ও পরিস্থিতি জানিয়ে এক ঘণ্টা আগে রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে রানা, সী লায়নের ক্যাপটেন জেমস হেনডারসন আর ডাক্তার পিটার উড ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। হেলিকপ্টার থেকে নামা মাত্র সবাইকে গরম কম্বলে জড়ানো হলো, স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সিক-বেতে। দ্বিতীয় দলটাকে আনার জন্যে হেলিকপ্টার ফিরে যাবে, তার আগে পাইলট মুরল্যান্ডের সঙ্গে কথা হলো ক্যাপটেনের। মুরল্যান্ড জানাল, কীলকে নিয়ে রানা এখনও রুরালিতে রয়েছে, ওদের সঙ্গে মলি বুমার নামে গাইড মেয়েটাও আছে–হঠাৎ মারা যাওয়া পেঙ্গুইনগুলোকে পরীক্ষা করছে ওরা। মলির বক্তব্যও ব্যাখ্যা করল সে। কথা ছিল, ট্যুরিস্টদের ছোট একটা দলকে রুরালির তীরে নামিয়ে দিয়ে ওদের ক্রুজার শিপ বিশ কিলোমিটার দূরে আরেক দল ট্যুরিস্টকে নামাবে, দু'ঘণ্টা পর ফিরে এসে জাহাজে তুলে নেবে প্রথম দলটাকে। কিন্তু আজ চারদিন পরও জাহাজটা ফেরেনি। মেসেজ পাঠিয়েও কোন সাড়া পায়নি মলি।

ক্যাপটেন হেনডারসন উদ্বিগ্ন হলেন। গত চারদিনে তাঁর জাহাজের রাডারে অন্য কোন জলযানের অস্তিত্বই ধরা পড়েনি। তারপর মুরল্যান্ডের মুখে রহস্যময় অসুস্থতা সম্পর্কে শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। ডলফিন আর সীল মারা পড়ছে, এ-খবর আগেই পেয়েছেন। এলাকায় সেজন্যেই জাহাজ নিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। এখন মানুষও মারা পড়ছে, অর্থাৎ বিপদ বা সমস্যাটায় নতুন মাত্রা যোগ হলো। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছে রিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

ওদিকে, রুরালিতে, হাজার হাজার পেঙ্গুইনের লাশ দেখে বোবা হয়ে গেছে রানা। ছোট একটা জায়গায় একই সময়ে এতগুলো পাখি অকস্মাৎ মারা গেল, অথচ কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না।

'কারণ যা-ই হোক,' বলল মলি, 'এই একই অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে আমার দু'জন ট্যুরিস্ট আর ক্রুজার শিপের একজন ক্রুও মারা গেছে।'

কয়েকটা পেঙ্গুইনের লাশ পরীক্ষা করল বায়োলজিস্ট কীল। 'জখমের কোন চিহ্ন নেই। বিষক্রিয়ারও কোন লক্ষণ দেখছি না।'

'শুধু চোখগুলো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে,' বলল মলি।

'গুহার ভেতর আপনারাও আক্রান্ত হয়েছিলেন,' বলল রানা। 'ঠিক কি রকম লাগছিল, ব্যাখ্যা করতে পারবেন?'

মলি বলল, 'মনে হলো অদৃশ্য একটা শক্তি আমাদের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। জিনিসটা কি আমার কোন ধারণা নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, মনে হচ্ছিল আমার ব্রেন বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। ব্যথাটা অসহ্য। অন্তত মিনিট পাঁচেক এই অবস্থায় ছিলাম।'

'তিনজন মানুষ, পঞ্চাশ হাজারের মত পেঙ্গুইন আর পঞ্চাশটার মত লেপার্ড সীল একসঙ্গে মারা গেল হার্ট বন্ধ হয়ে? এ কি সম্ভব?'

'কোন ধরনের প্লেগ নয় তো?' জানতে চাইল মলি।

'ওয়েডেল সী-তে এর চেয়ে বেশি সীল আর ডলফিন মারা গেছে,' বলল কীল। 'ওই মড়কের সঙ্গে এটারও নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। গোটা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে এই রহস্যময় মৃত্যু ছোবল মারছে। এভাবে চলতে থাকলে এদিকে সামুদ্রিক প্রাণী বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকবে না।'

'রিসার্চ শিপের ল্যাবে আপনি সীল আর ডলফিনের লাশ পরীক্ষা করেননি?' জিজ্ঞেস করল রানা

'পরীক্ষা করে তেমন কিছু পাইনি,' জবাব দিল কীল। 'শুধু এটুকু বলা যায়, ইন্টারনাল হেমোরেজ-এ মারা গেছে ওগুলো।'

'কোন রোগ জীবাণু পাওয়া যায়নি?'

'না।'

'আপনাদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, রোগটা নতুন নয়,' বলল মলি 'আমি তো ভাবছিলাম আমরাই প্রথম আক্রান্ত হয়েছি।'

'এর আগে কোন মানুষ মারা যাবার খবর পাইনি আমরা,' বলল কীল।

'এখন দেখতে হবে এটা কি প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়, নাকি এর পিছনে

মানুষের কোন হাত আছে।' কথাটা বলে মলির দিকে তাকাল রানা, চোখের দৃষ্টি একটু যেন তীক্ষ্ণ হলো।

'কি বললেন? মানুষের হাত আছে?' চোখ বড় বড় করল মলি। 'এরকম একটা আশঙ্কার কথা কেন আপনি ভাববেন? সামুদ্রিক প্রাণী মেরে কার কি লাভ?'

'শুধু সামুদ্রিক প্রাণী নয়,' মনে করিয়ে দিল কীল। 'মানুষও মারা পড়ছে।'

'কেন কেউ অকারণে সামুদ্রিক প্রাণী বা মানুষ মারতে চাইবে?' আবার প্রশ্ন করল মলি, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'সেটাই তো জানতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'এখন চলুন, সী লায়নে ফিরি। মনে আছে তো, আপনাদের ক্রুজার শিপটাকে খুঁজে বের করতে হবে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বলল মলি। 'এ-ও ভুলছি না যে আপনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। আমাকে আপনি চেনেন, আমার পুরো নাম জানেন–কিভাবে, মি. রানা?'

'আমাকে শুধু রানা বললে খুশি হব।' রানার মুখে গম্ভীর হাসি। 'ব্যস্ত হবেন না, সময়মত সবই জানতে পারবেন। এখন চলুন, কপ্টারে উঠি।'

'বেশ, চলুন।' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রানাকে অনুসরণ করল মলি।

দুই

যানজট এড়াবার জন্যে বায়তুল মোকাররমের ওদিকে না গিয়ে বঙ্গভবনের ভেতরের রাস্তা ধরে, টয়েনবি সার্কুলার রোড হয়ে মতিঝিলে ঢোকার চেষ্টা করছে মাসুদ রানা। বেশ কয়েক মাস পর দু'দিন হলো দেশে ফিরেছে, ফিরেই ছুটির একটা দরখাস্ত জমা দিয়েছে অফিসে। কোথায় বেড়াতে যাবে তা এখনও ঠিক না হলেও উড়ু উড়ু মন আনন্দ-ফুর্তির প্রত্যাশায় উন্মুখ। নিজের অজান্তেই মাঝে মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠছে প্রিয় বান্ধবীদের শুচি-স্নিগ্ধ মুখ, নির্জন সবুজ দ্বীপ, উত্তাল সাগরের কিনারায় ধু-ধু সৈকত। পুলক জাগানো এ-সব কল্পনার সঙ্গে যানজটহীন টয়েনবি সার্কুলার রোডে ছুটন্ত মেটালিক ব্লু টয়োটা স্টারলেট মানিয়ে যায়, সামঞ্জস্য রক্ষা করে এসি-র শীতল পরশ আর রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভাল আর সুন্দর থাকার একটা প্রেরণা জাগে মনে।

কিন্তু ছন্দপতন ঘটল ইত্তেফাক ভবনের সামনে হাটখোলার মোড়টায় এসে। বাস-মিনিবাস, ট্রাক-হাফট্রাক, সাইকেল-রিকশা, তিন চাকার ভ্যান, চার চাকার প্রাইভেট গাড়ি বাতিল লোহা-লক্কড়ের মত স্থির হয়ে আছে যতদূর দৃষ্টি চলে। দু'চার মিনিট পর যদি বা গতি সঞ্চার হলো, তা এত মন্থর যে অলস কচ্ছপও লজ্জা পাবে। মান্ধাতা আমলের এঞ্জিনগুলো থেকে হু-হু করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে, খকখক করে কাশছে পথচারীরা। দশ মিনিট লাগল একশো গজ পেরুতে, গোপীবাগের মোড়ে পৌঁছে মতিঝিলের দিকে ঘুরতেই দেখা গেল শেয়ার মার্কেটের জটলা রাস্তার প্রায় পুরোটাই দখল করে রেখেছে। এখানে আক্ষরিক অর্থেই দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে রিকশাঅলারা, তাদের খিস্তি শুনলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করবে। এরইমধ্যে চলছে মোটরসাইকেল আরোহী

বখাটে তরুণদের বেলেল্লাপনা, রিকশায় বসা মেয়েদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য। রানা শুনেছে, যানজট একটু হালকা হলে এই তরুণরাই মেয়েদের গলার চেইন বা ওড়না ধরে টান দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত শেয়ার বাজার ছড়িয়ে পড়েছে, ওখানে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টার মত লেগে গেল। জট এখনও ছোটেনি, বন্ধ হয়নি কালো ধোঁয়া আর খিস্তির উদ্গীরণ। 'মাফ করবেন, রবি ঠাকুর,' বিড়বিড় করে রেকর্ড প্লেয়ার থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেটটা বের করে নিল রানা। এই পরিবেশে ওঁর গান বাজালে ওঁকে অপমান করা হয়। পাশেই বাংলাদেশ ব্যাংক, ভবনটার দিকে তাকিয়ে অলস মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন জাগল, এই মুহূর্তে গভর্নর ভদ্রলোক কি করছেন? তাঁকে ঋণ খেলাপী কোন ব্যবসায়ীর আস্ফালন আর গালমন্দ সহ্য করতে হচ্ছে না তো? সত্যি, বড় বিচিত্র এ দেশ! যে যত বেশি চুরি করে তার তত বড় গলা। ক্লান্ত ও বিরক্ত রানা স্থির যানবাহনের দিকে তাকিয়ে কাল্পনিক নরকের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হলো, এ আমরা আসলে কি করছি? যেন মনে হচ্ছে সবাই আমরা আত্মহননের প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করেছি। এভাবে কি একটা জাতি কোথাও পৌঁছুতে পারে? তোমার কথাকে সালাম, কবি, বাঙালী যদি হতে পেরেও থাকি, মানুষ আমরা সত্যি হতে পারিনি।

আমরা মানে আমিও—মাসুদ রানাও। কারণ গোটা জাতির উত্তরণ না ঘটায় ব্যক্তিগত মেধা, গুণ বা যশ যার যতই থাকুক, তা নিয়ে গর্ববোধ করা যায় না। সবার ব্যর্থতা ব্যক্তিগত সাফল্যকে ম্লান করে দেয়। আমি ভাল থাকব, বাকি সবাই জাহান্নামে যাক, একজন দেশপ্রেমিক এভাবে কখনও চিন্তা করতে পারে না।

মাসুদ রানা কে? তার সবচেয়ে বড় পরিচয় সে একজন দেশপ্রেমিক। এই মাটিকে ভালবাসে বলেই না সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল ও। তারপর উপলব্ধি করল রক্তে আছে বিপদ, রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা; ডাক পেয়ে যোগ দিল মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে সেই থেকে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে ও। দেশের বিরুদ্ধে কোথাও কেউ কিছু করছে শুনলেই ছুটে যায়, ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আসে ষড়যন্ত্রের জাল ওর সাফল্যের কথাই লোকের মুখে মুখে ফেরে, যদিও তার মানে এই নয় যে ওর ব্যর্থতার সংখ্যা একেবারে নগণ্য। তবে যখনই কোন অ্যাসাইনমেন্টে ব্যর্থ হয় রানা, ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করে, শুধরে নেয় নিজেকে। রক্তমাংসের মানুষ, ভুল তো হতেই পারে। আর রক্তমাংসের মানুষ বলেই ওর মধ্যে লোভ আছে, আছে ঈর্ষা আর ক্রোধ। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে শিখেছে রানা, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা থেকে সুন্দর হবার প্রেরণা পায়, মনীষীদের জীবনাচরণ অনুকরণ করার প্রবণতা ওকে বিশুদ্ধ হতে সাহায্য করে, আর আছে অমর একটা আদর্শ—দেশকে ভালবাসতে হবে; সব মিলিয়ে লোভ, ঈর্ষা আর ক্রোধকে প্রতিরোধ করার একটা শক্তিশালী অস্ত্র চলে আসে চেতনায়, সেই অস্ত্রই ওকে দুর্নীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, মুক্ত রাখে সব রকম কলুষ থেকে। একা শুধু রানা নয়, ওর মত আরও বেশ কিছু এজেন্ট আছে, যাদের ন্যায়নীতি আর সততা পরীক্ষিত। ওরা আছে বলেই বিসিআই-এর কার্যক্রমের পরিধি আগের

চেয়ে অনেক গুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে—এই মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার বিনিময়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও রোজগার করে। কোন কোন বছর তার পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। লাভটা বিসিআই-এর খাতায় জমা হলেও, নগদপ্রাপ্তি যোগ আছে এমন কাজগুলো সাধারণত রানা এজেন্সি করে থাকে। রানাই ওটার ডিরেক্টর, কাগজে-কলমে ওই ওটার স্বত্বাধিকারী, তবে আসলে বিসিআই-এরই একটা কাভার মাত্র।

যানজট থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এসে সাততলা অফিসে বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছুল রানা। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে গাড়ি রেখে এলিভেটরে চড়ল। ছয় আর সাত, দুটো ফ্লোর নিয়ে ওদের অফিস; সাইনবোর্ড বলে দেবে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা হয় এখানে। সাদা পোশাক পরা সশস্ত্র লোকজন আছে বিল্ডিঙের ভেতরে ও বাইরে, এলিভেটর আর করিডরে আছে টিভি ক্যামেরা, প্রত্যেকের আসা-যাওয়া মনিটর করা হয়। লোক দেখানো ইনডেন্টিং ব্যবসা চলে সামনের দুটো কামরায়, তারপর একটা করিডর, সেখানে সম্পন্ন হয় সিকিউরিটি চেক আপ।

বিসিআই কাল্পনিক কোন প্রতিষ্ঠান নয়, দেশী-বিদেশী শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে মুক্ত রাখার বাস্তব প্রয়োজনেই ওটা অস্তিত্ব লাভ করে; সেরকম মাসুদ রানা বা ওর মত অন্যান্য এজেন্টরাও কাল্পনিক কোন চরিত্র নয়। প্রত্যেক এজেন্টকে সারা বছর বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, ফিল্ডে পাঁচ-সাত বছর একটানা কাজ করলে তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা পড়ে অসংখ্য ঘটনা। সব ঘটনা বা অ্যাসাইনমেন্টের কথা একবারে বলা সম্ভব নয়। সামঞ্জস্য আর বৈচিত্র্য রক্ষার তাগিদে কাহিনীগুলো যখন সাজানো হয় তখন স্থান আর কাল যথাযথ রাখা সম্ভব হয় না, অনেকটাই এদিক ওদিক করতে হয়, আর তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই সময়ের সঙ্গে আনুপাতিক হারে চরিত্রগুলোর বয়েস বাড়ে না। পাঁচ-সাত বছরের কাহিনী ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর সময় নিয়ে বলা হচ্ছে, মাসুদ রানার প্রতিটি চরিত্রকে চিরতরুণ মনে করতে বলার সেটাও একটা কারণ।

টিভিতে রানাকে দেখে নিজের অফিস কামরা ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে এসেছে সোহেল আহমেদ। বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নিচের পদটাই তার, একাধারে চীফ অভ অপারেশনস এবং চীফ অভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তবে পরস্পরের পরম বন্ধু ওরা, তুই-তোকারির সম্পর্ক। কোটটা সোহেল চেয়ারে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে, ফুলহাতা সাদা পপলিনের শার্ট পরে থাকায় বোঝার উপায় নেই যে তার একটা হাত নকল। দেখা হলে ওরা কখনও হ্যান্ডশেক করে না, তার বদলে কাঁধে ঘুসি বা পায়ে ল্যাঙ মারে। আজ অবশ্য ওসবের ধার দিয়েও গেল না সোহেল, মুখটাকে গাম্ভীর্যের মুখোশ বানিয়ে বলল, 'খুব বড় কোন অন্যায় না করলে বস্ এরকম হম্বিতম্বি করার মানুষ না।'

যদিও রানা আন্দাজ করল সোহেল ওর সঙ্গে কৌতুক করছে, তবু বস্ রেগে আছেন শুনে কেন যেন শুকিয়ে গেল বুকটা। 'কি বলছিস? হম্বিতম্বি করছেন মানে?'

'যা না, পিঠের ছাল তুলবেন,' হিস হিস করে বলল সোহেল। হাতঘড়ি দেখল সে। 'এক ঘণ্টা তিন মিনিট লেট করেছিস। পনেরো মিনিট পরপর খোঁজ নিচ্ছেন তুই এলি কিনা।'

'কেন?'

'আমি কি করে বলব কেন। তাড়াতাড়ি যা। বলেছেন এলেই যেন পাঠিয়ে দিই।'

নিজে না খেলেও, পকেটে দু'এক প্যাকেট সিগারেট রাখতে হয় রানাকে, মাঝে মধ্যেই ঘুষ দেয়ার প্রয়োজন পরে। এই যেমন এখন। 'রাখ এটা,' বলে পকেট থেকে বেনসন অ্যান্ড হেজেসের প্যাকেটটা বের করে বাড়িয়ে ধরল ও। 'তুই তো অপারেশনস চীফ, কোনও ইমার্জেন্সী দেখা দিলে তোর জানার কথা,' এমন হালকা সুরে কথাগুলো বলল, বিশ্বাস করা কঠিন যে দুশ্চিন্তা ও কৌতূহলে মরে যাচ্ছে।

প্যাকেটটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সোহেল, কিন্তু রানা সেটা ঝট করে তার নাগালের বাইরে সরিয়ে নিল। 'আগে বল কেন বারবার খোঁজ নিচ্ছেন বস্।'

প্যাকেটটা হাতে পেয়েও পাচ্ছে না, চেহারা লালচে হয়ে উঠল সোহেলের। 'খানিক আগে গত সাতদিনের সবগুলো দৈনিক পত্রিকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই যা, আমার মুখে তালা লেগে গেল!'

তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা আবার বাড়িয়ে ধরল রানা। 'খোল তোর তালা।'

হাত বাড়িয়ে সেটা নিল সোহেল, যত্ন করে পকেটে ভরল, তারপর হাত কচলে অমায়িক হাসি হাসল। 'ওইটুকুই, দোস্ত। সত্যি আর কিছু জানি না আমি।'

'দেখ সোহেল...' খেপে গিয়ে এগিয়ে এল রানা।

'খোদার কসম বলছি...' কামরার ভেতর থেকে ইন্টারকমের আওয়াজ ভেসে এল। '...ওই, আবার উনি খোঁজ নিচ্ছেন। কি ঘটল ফিরে এসে বলবি, কেমন?' লাফ দিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল সোহেল। 'আমি একজন সুন্দরী নার্সকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছি।' দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

টাইয়ের নটটা একটু ঢিলে করে করিডর ধরে এগোল রানা, নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলল, বিড়বিড় করে গাল দিল, 'শালা!'

একটা বাঁক ঘুরল রানা। করিডরের শেষ মাথায় বসের চেম্বার। নক করতে ভেতর থেকে মেঘ ডাকার মত ভারী গলা ভেসে এল, 'কাম ইন।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা, ছেড়ে দিতে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল কবাট। এক মুহূর্ত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকল রানা, দ্রুত চোখ বুলিয়ে সব কিছু দেখে নিচ্ছে। ডেস্কের ওপর একটা মাত্র দৈনিক পত্রিকা, ভারি ফ্রেমের বাই ফোকাল চশমা চোখে সেটা পড়ছেন রাহাত খান। ইদানীং কপালটা একটু বেশি চওড়া লাগে, তারমানে টাকের বিস্তৃতি ঘটছে। তবে জুলফি আর কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া অবিকল আগের মতই আছে। বসের কপাল, তাঁর ডেস্ক, হাতের টোবাকো পাইপ, টিভি মনিটর, সবই খুব ঝকঝকে আর পরিচ্ছন্ন। কার্পেটের রঙ কোথাও এতটুকু ম্লান হয়নি। জানালার পর্দাগুলো দেখে মনে হবে আজই নতুন টাঙানো হয়েছে। রানা জানে, ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে থাকা মানুষটাও পরিচ্ছন্ন আর বিশুদ্ধ।

'এসো, বসো,' দৈনিকটা থেকে মুখ না তুলেই বললেন রাহাত খান।

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাতলবিহীন একটা চেয়ারে বসল রানা। বসার পর

অনেকক্ষণ হলো নড়াচড়া করছে না। বস্ একমনে কাগজ পড়ছেন, রানার উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন নন। সোহেল কি তাহলে মিথ্যে কথা বলল? বসের আচরণ দেখে তো মনে হচ্ছে না যে বারবার ওর খোঁজ করেছেন তিনি। চেহারায় কোন টেনশন নেই, কপালের পাশে রগটা লাফাচ্ছে না, কুঁচকে নেই ভুরু জোড়া। তারমানে কোন ইমার্জেন্সীও দেখা দেয়নি। আরও পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পর নড়েচড়ে বসল রানা, তবু মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে না। খুক করে কাশল একবার। বস্ শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। অবশেষে মুখ খুলতে গেল রানা, 'স্যার, আমার ছুটির দরখাস্তটা...'

রানার কথা শেষ হলো না, রাহাত খান বললেন, 'ওটায় তো আমি সই করে দিয়েছি। তুমি সাতদিনের ছুটি চেয়েছিলে। কিন্তু এ বছর তোমার ওপর দিয়ে যেরকম ধকল গেছে তাতে সাতদিনের ছুটি যথেষ্ট নয়, তাই পনেরো দিন করে দিয়েছি।'

শুনেই সন্দেহ জাগল রানার মনে। সাধারণত ছুটি চাইলে খেপে যান বস্। সাতদিনের ছুটি চাইলে তিন দিন বরাদ্দ করেন। অথচ এবার উল্টোটা ঘটছে। কি ব্যাপার? আর কোন কথাবার্তা হচ্ছে না, কাজেই বসে থাকতে অস্বস্তিবোধ করছে রানা। দু'তিন মিনিট পর আবার মুখ খুলল ও। 'স্যার, আমাকে আপনি খুঁজছিলেন?'

'হ্যাঁ,' কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন রাহাত খান। 'চা খাও।' হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন। 'দু'কাপ।'

একটু পরই ট্রে-তে করে দু'কাপ চা নিয়ে এল ইলোরা, রাহাত খানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। রানার চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে উজ্জ্বল হাসি হাসল মেয়েটা, বস্ তাকিয়ে নেই বুঝতে পেরে একটা ভুরু সামান্য নাচাল; কিন্তু রানা কোন সাড়া না দিয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল। ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে, মনে অজানা আশঙ্কা। বস্ আজ যে আচরণ করছেন, তার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই।

ইলোরা চলে যেতে ট্রে থেকে নিজের কাপটা তুলে চুমুক দিলেন রাহাত খান। চেয়ারের পাশের নিচু একটা টেবিল থেকে আরেকটা দৈনিক পত্রিকা তুলে ডেস্কের ওপর খুললেন। 'কিছু ঠিক করেছ, ছুটি কাটাতে কোথায় যাবে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জ্বী-না, এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

নিভে যাওয়া পাইপ ধরালেন বস্। 'অনেক দিন পর ফিরলে, তাই না? দেশের খবর কিছু রাখো?'

'জ্বী—মানে, খবরের কাগজ পড়ে যতটুকু জানা যায় আর কি।'

হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠলেন রাহাত খান। 'নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ছ তাহলে? ভেরি গুড। গুরুত্বপূর্ণ দু'একটা খবর শোনাও দেখি আমাকে।'

রানা মনে মনে ভাবছে, এ তো দেখছি ভাল ফ্যাসাদে পড়া গেল। পত্রিকা পড়ার সময় কেউ কি হিসেব করে কোন খবরের কি গুরুত্ব? কত খবরই তো রোজ ছাপা হচ্ছে, আজ যেটা গুরুত্বপূর্ণ কাল সেটার হয়তো কোন গুরুত্বই থাকছে না।

তবে বসের নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়, গৎ বাঁধা বুলির মত শুরু করল, 'যানজটের খবর রোজই লেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি সত্যি খুব জটিল। শেয়ার ধসও ঠেকানো যাচ্ছে না। আরেকটা সমস্যা কালো ধোঁয়া। আর নারী নির্যাতনের ঘটনা তো প্রতিদিনই বাড়ছে। ইদানীং ঋণ খেলাপীরা...' হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেই থামতে যাচ্ছিল রানা, এক সেকেন্ড দেরি করে ফেলায় বসের ধমক খেতে হলো।

'তুমি দেখছি লে-ম্যানের মত কথা বলছ। সমস্যার পাহাড় একদিনে জমেনি, একদিনে সমাধানও হবে না–নতুন সরকারকে আরও সময় দিতে হবে। তাছাড়া, রাজনীতিকরা কতটা সফল বা ব্যর্থ তা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলে। ওদের ওপর নজর রাখার জন্যে বিরোধী দল আছে। আমি জানতে চাইছি, এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, এমন কোন খবর পড়েছ কিনা।'

নিজের ওপর রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো রানার। বস্ যেটাকে গুরুত্বপূর্ণ খবর বলতে চাইছেন সে-ধরনের একটা রিপোর্ট গত কয়েকদিন ধরেই পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। জবাব দেয়ার সময় সেটার কথা মনেই পড়েনি ওর। প্রসঙ্গটা এবার তুলল ও।

অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি দেয়ার নাম করে ঢাকার একটা ম্যান পাওয়ার এজেন্সি প্রচুর মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, জিওলজিস্ট আর সাধারণ শ্রমিক রিক্রুট করে। সব মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার লোক। প্রথমে তাদেরকে অস্ট্রেলিয়াতেই নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখান থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয় অজ্ঞাত কোন জায়গায়। তারপর প্রায় এক বছর হতে চলল দেড় হাজার লোকের কোন খবর নেই তাদের আত্মীয়-স্বজনরা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে। রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মকর্তারা অবস্থা বেগতিক দেখে ব্যবসা গুটিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনরা প্রেস ক্লাবের সামনে অনশন ধর্মঘট শুরু করায় সরকারের টনক নড়ে। অস্ট্রেলিয়ার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সেখান থেকে জবাব আসে, বছর খানেক আগে হাজার দেড়েক লোক একটা জাহাজে চড়ে অবৈধভাবে তাদের দেশে এসেছিল বটে, অবাঞ্ছিত ঘোষণা করায় ওই জাহাজ নিয়েই তারা কোথায় যেন চলে গেছে। বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ করে জানিয়েছেন, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সবশেষে রানা মন্তব্য করল, বিষয়টা ওকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তবে হাতে যথেষ্ট তথ্য না থাকায় ঠিক কি ঘটেছে ধারণা করতে পারছে না।

'আমার হাতে কিছু তথ্য আছে,' রানাকে থামতে বললেন রাহাত খান। 'এ-সব তথ্য পত্রিকায় তুমি পাবে না। আমাদের সিকিউরিটি গার্ড মুজিবকে তো চেনো। সে তার ছেলেটাকে অনেক কষ্টে বুয়েটে পড়িয়েছে। তার লেখাপড়ার খরচ তোলার জন্যে তোমরা একবার কিছু চাঁদাও তুলেছিলে, মনে পড়ে?'

'জ্বী, আপনি সজীবের কথা বলছেন।'

'দেশের জমি-জমা বিক্রি করে মুজিবও তার ছেলেকে অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করতে পাঠায়। রিক্রুটিং এজেন্সিকে তিন লাখ টাকা দিতে হয়েছে। দেড় হাজার

নিখোঁজ লোকের মধ্যে সজীবও একজন। আমাদের পরিচিত আরও দু'জন গেছে–ইলোরার চাচাতো ভাই আর শফিউল্লাহর আপন ভাই।' শফিউল্লাহ্ এই বিল্ডিঙেই পিয়নের কাজ করে। 'ইলোরার চাচাতো ভাই জিওলজিস্ট, নাম শিপলু আহমেদ। আর শফিউল্লাহর ভাইয়ের নাম সানাউল্লাহ। সে সাধারণ শ্রমিক হিসেবে গেছে, এক লাখ বিশ হাজার টাকা দিয়ে।'

এবার শুধু চিন্তিত নয়, রীতিমত বিচলিত দেখাল রানাকে। 'এতগুলো মানুষ, গেল কোথায়, স্যার?'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' বললেন রাহাত খান, সামান্য অসন্তুষ্ট দেখল তাঁকে। 'তোমাকে আরও একটা তথ্য দিই।'

রাহাত খান এবার যে তথ্যটা দিলেন, সেটা পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল। অস্ট্রেলিয়া থেকে হংকঙ আসার পথে ভারতীয় একটা জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে, দিকভ্রান্ত হয়ে নোঙর ফেলে ছোট এক দ্বীপে। দ্বীপটা তাসমান সাগরে, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের মাঝখানে কোথাও। নানা বিচারে খুবই রহস্যময় বলতে হবে দ্বীপটাকে। পাহাড়-প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে চারদিকে, নোঙর ফেলতে হলে প্রথমে একটা লেগুনে ঢুকতে হবে। দ্বীপটার নাম নিমবাস, মালিক রডনি বুমার নামে ধনকুবের এক হীরক ব্যবসায়ী। লেগুনে ঢোকার পর ভারতীয় জাহাজের ক্যাপটেন দেখলেন, গোটা দ্বীপে সতর্ক পাহারায় রয়েছে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র একদল প্রহরী। জাহাজ থেকে তীরে কাউকে নামতে দেয়া হয়নি। প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে দ্বীপের এক লোক জাহাজে ওঠার চেষ্টা করেছিল। লোকটা হাড্ডিসার, দেখে মনে হয়েছে বন্দী ক্রীতদাস। সে একটা চিরকুট নিয়ে এসেছিল। প্রহরীরা তাকে ধাওয়া করে, জোর করে নামিয়ে নিয়ে যায় জাহাজ থেকে। তবে চিরকুটটা গোপনে একজন নাবিকের হাতে গুঁজে দিয়ে যায় সে।

সেই চিরকুটে লেখা আছে, 'আমরা পাঁচশো বাংলাদেশী এখানে বন্দী, মানবেতর জীবন যাপন করছি। আল্লাহর দোহাই লাগে আমাদেরকে উদ্ধার করুন।' তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখা, নিচে কোন নাম নেই। ধারণা করা হচ্ছে নিখোঁজ দেড় হাজার বাংলাদেশীদের একজন সে। তবে চিরকুটে মাত্র পাঁচশো লোকের কথা কেন লেখা হয়েছে সেটা একটা রহস্য। ভারতীয় জাহাজের ক্যাপটেন দেশে ফিরে কোলকাতার বাংলাদেশে হাই কমিশনে ফ্যাক্স যোগে চিরকুটটা পাঠিয়ে দেন।

ঘটনার বর্ণনা দেয়ার পর রাহাত খান মন্তব্য করলেন, দেড় হাজার বাংলাদেশীকে খুঁজে বের করা বা উদ্ধার করা বিসিআই-এর বিধিবদ্ধ দায়িত্বের মধ্য পড়ে না। সমস্যাটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয় এ-ব্যাপারে বিসিআইকে কোন অনুরোধ করেনি। তবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে পারে বিসিআই। কাজেই, রানাকে কোন অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হচ্ছে না। অন্তত এখুনি নয়। রানাকে শুধু বলা হচ্ছে, ছুটির মধ্যে ওদিকে যেন একবার যায় ও। যাবার পর কি দেখল তা যেন ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট করে অফিসে।

কথা প্রসঙ্গে বস্ আরও জানালেন, রডনি বুমার মানুষ হিসেবে বিশেষ

সুবিধের নন। সাউথ প্যাসিফিকে মোট ছ'টা হীরক খনি আছে তাঁর, সবগুলোই দ্বীপ। একটা হলো নিমবাস। নিমবাস থেকে দশ-বারো মাইল দূরে আরও এক জোড়া দ্বীপ আছে–গুডউইল আর রেড স্যান্ড। রাহাত খানের ধারণা, বাকি এক হাজার নিখোঁজ বাংলাদেশী ওই দ্বীপ দুটোয় থাকতে পারে। বাকি তিনটে দ্বীপ–কোর আইল্যান্ড, ক্যান্ডি আইল্যান্ড আর রডগার আইল্যান্ড–পরস্পরের কাছ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে। বলা যায় না, বাকি এক হাজার বাংলাদেশী ওই তিনটে দ্বীপেও থাকতে পারে।

কথাবার্তা যা হবার হয়ে গেছে মনে করে বিদায় নিয়ে উঠে আসার কথা ভাবছে রানা, এই সময় রাহাত খান হঠাৎ আরেকটা প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলে দিলেন ওকে। 'এবার আন্তর্জাতিক খবর সম্পর্কে বলো। সন্দেহ জাগে বা মন খুঁত খুঁত করে এমন কোন খবর তোমার চোখে পড়েছে?'

জবাব দেয়ার আগে দ্রুত চিন্তা করছে রানা, আবার যাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে না করে। পাঁচ সেকেন্ড ভাবতেই অবচেতন মন থেকে একটা খবর উঠে এল। 'কাগজে এক ধরনের প্লেগের কথা লিখছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দু'এক জায়গায় রহস্যময় মড়ক শুরু হয়েছে।'

'ভেরি গুড!' প্রশংসা করলেন রাহাত খান। 'এই প্লেগ বা মড়ক আমাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।' পাইপে আবার আগুন ধরাতে প্রচুর সময় নিলেন তিনি। 'এ-ব্যাপারে নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলেছি আমি।'

নুমা, ন্যাশন্যাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করাই ওদের কাজ। খুব কম লোকই জানে যে গভীর সাগরে সিআইএ যে কাজ করতে পারে না নুমাকে সেই কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নুমার ডিরেক্টরকে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে সরাসরি জবাবদিহি করতে হয়, সিনেট বা কংগ্রেস নুমার কাজে নাক গলাতে পারে না। ঘটনাচক্রে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন রাহাত খানের পুরানো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

'এই মড়ক বা মহামারী সম্পর্কে আমার আর কিছু জানার আছে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুধু এইটুকু যে বিসিআই অনুরোধ করায় সাউথ প্যাসিফিকে একটা রিসার্চ শিপ পাঠিয়েছে নুমা,' বললেন রাহাত খান। 'সমুদ্রে মড়ক লাগার খবর আমরাই প্রথম জানাই ওদেরকে। তুমি তো নুমার অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ইচ্ছে করলে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো, জিজ্ঞেস করতে পারো প্লেগটা সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেল কিনা। ঠিক আছে, এবার তুমি যেতে পারো।'

চেয়ার ছেড়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, ওকে দাঁড় করিয়ে বস্ বললেন, 'সোহেলের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো। ও হয়তো তোমাকে আরও কিছু তথ্য দিতে পারবে।'

করিডরে বেরিয়ে এসে সোজা সিঁড়ির দিকে হাঁটছে রানা, সাততলার

কমিউনিকেশন ও কমপিউটর রূমে যাবে। সোহেলের কামরাটাকে পাশ কাটিয়ে এল, দরজা খোলা দেখেও ভেতরে তাকাল না। ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে পাশে চলে এল সোহেল, দু'জন একসঙ্গে হাঁটছে, যদিও বন্ধুর দিকে তাকাচ্ছে না ও।

'কেন রে, তোকে ওভাবে খুঁজছিলেন কেন?' নিরীহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

জবাব না দিয়ে রানা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুই তখন বললি না কেন সাতদিনের জায়গায় পনেরো দিন ছুটি দেয়া হয়েছে আমাকে?'

'হাহ্, একে তুই ছুটি বলিস?' হাসল সোহেল, মাথা নাড়ছে। 'দিস ইজ অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট, মাই ডিয়ার বয়। আর সব এজেন্টরা দেশের বাইরে ব্যস্ত, নাগালের মধ্যে একা শুধু তোকে পাওয়া গেল। ছুটি না পেলে খেপে যাবি, তাই অ্যাসাইনমেন্টটা গছিয়ে দেয়া হলো কৌশলে।'

রানাও ব্যাপারটা তাই ধরে নিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় মুখটা গম্ভীর করে রাখল ও।

'তুই হয়তো চাইছিস আমি তোকে ব্রিফ করি,' আবার বলল সোহেল, এখনও রানার পাশে সে।

রানা তবু কিছু বলছে না।

'এত মন খারাপ করার কি আছে,' রানার কাঁধে সান্ত্বনাসূচক চাপড় মারল সোহেল। 'রথ দেখতে যাচ্ছিস, নাহয় কলাও বেচবি। তাছাড়া, শুনতে ভাল লাগবে এমন একটা জবর খবরও তোকে আমি দিতে পারি।'

কমিউনিকেশন রূমে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। এই কামরা থেকে স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে দুনিয়ার যে-কোন প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এক পাশে রয়েছে কয়েকটা কমপিউটর, মেমোরিতে ধারণ করছে প্রয়োজন হতে পারে এমন বিপুল তথ্য। যদি কোন তথ্য না পাওয়া যায়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কোথাও থেকে সঙ্গে সঙ্গে তা সংগ্রহ করা সম্ভব। ফোম লাগানো টুলে বসে একটা কমপিউটর অন করল রানা।

আরেকটা টুল টেনে এনে রানার পাশে বসল সোহেল। 'আমি জানি, তুই রডনি বুমার সম্পর্কে তথ্য পেতে চাইছিস।'

বসের সঙ্গে আগেই কথা বলে সবজান্তা সেজে বসে আছে শালা, ভাবল রানা। কথা না বলে কী বোর্ডের কয়েকটা বোতামে চাপ দিল। মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো ও। কমপিউটর বলছে তার মেমোরিতে রডনি বুমার সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

'জানতাম কিছু পাবি না,' বলল সোহেল। 'এরপর ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কোথাও থেকে পাস কিনা দেখবি, তাই না?'

'তা-ও পাব না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সেক্ষেত্রে আমি ওয়াশিংটনের মেইনফ্রেম-এর সাহায্য চাইব।'

'মেইনফ্রেমে আছে,' মুচকি হেসে বলল সোহেল। তারপর দুই হাতের বুড়ো আঙুল দেখাল রানাকে। 'কোন লাভ হবে না, কারণ অ্যাকসেস কোড তোর জানা নেই।'

'চেষ্টা করলে অ্যাকসেস কোড...'

'চেষ্টা করলে জেনে নিতে পারবি, কিন্তু তাতে সময় লাগবে। ব্যাপারটা তো আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া লটারির মত, এক হপ্তাও লেগে যেতে পারে।'

দু'সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর সোহেলের মুখের ওপর হাসল। 'নিজে কেন আমি অ্যাকসেস কোড খুঁজতে যাব? যার কাছে আছে তাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।'

'যার কাছে আছে...কার কথা বলছিস?' বিস্মিত হবার ভান করল সোহেল।

'আমার বন্ধু, ওয়াশিংটনের বিউ মরটন,' জবাব দিল রানা। 'ডোবা জাহাজ, রহস্যময় দ্বীপ, বিচিত্র বা উদ্ভট ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে একটা লাইব্রেরী আছে তার। রডনি বুমার সম্পর্কে কেউ যদি কিছু না-ও জানে, মরটন অবশ্যই জানবে।' টুল ছেড়ে কমিউনিকেশন সেকশনের দিকে এগোল রানা।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মরটনকে ফোন করে দেখি পাওয়া যায় কিনা,' বলল রানা।

'শুধু শুধু পয়সা খরচ,' বলল সোহেল। 'তোর কাজ আগেই আমি সেরে রেখেছি। তুই অফিসে আসার আগে মরটনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওর কাছ থেকে অ্যাকসেস কোড জেনে নিয়েছি আমি।'

'তাহলে আমাকে দিচ্ছিস না কেন?' মারমুখো হয়ে সোহেলের দিকে এক পা এগোল রানা।

'কি দিচ্ছি না? অ্যাকসেস কোড? কি করবি নিয়ে?' সোহেলের মুখে অমায়িক হাসি। 'ওটা ব্যবহার করে যা জানার সব আমি জেনে নিয়েছি।'

'তাহলে আমাকে বলছিস না কেন?'

'তারমানে আমাকে তুই অনুরোধ করছিস আমি যাতে তোকে ব্রিফ করি?' ভুরু কপালে তুলে জানতে চাইল সোহেল। রানাকে খেপিয়ে মজা পাচ্ছে সে।

সোহেলকে হতভম্ব করে দিয়ে হাসল রানা। 'এটা কোন অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট নয়। আজ থেকে আমি ছুটিতে। আমাকে যদি তোর কিছু জানাবার থাকে, নিজের গরজেই জানাবি।'

'আমার কোন গরজ নেই।'

'আছে।' আবার হাসল রানা। 'বস্ যদি জানেন যে প্রয়োজনীয় তথ্য না পেয়েই অফিস থেকে বেরিয়ে গেছি আমি, কান ধরে ওঠ-বোস করাবেন।'

'না, না-না, না,' সুর করে বলল সোহেল, মাথা নাড়ছে। 'মুখে যতই চোটপাট দেখান, তোকে আসলে খুবই ভালবাসেন বস্। তাছাড়া, তোর বয়েস হয়েছে না, অন্তত কান ধরতে বলতে পারবেন না...'

'আমি তোর কথা বলছি।' দরজার দিকে এগোল রানা। 'বুঝেও না বোঝার ভান করছিস।'

সিঁড়ি বেয়ে ছ'তলায় নেমে এসে নিজের অফিস কামরায় ঢুকল রানা, প্রভুভক্ত কুকুরের মত পিছনে লেগে রয়েছে সোহেল। 'আরে ভাই, রাগ করিস কেন? আমিও জানি এটা অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট নয়। তবে কেঁচো খুঁড়তে সাপও বেরিয়ে পড়তে পারে। আমরা তোর ভাল চাই, সেজন্যেই তথ্য আর পরামর্শ দিয়ে

সাহায্য করতে চাওয়া…'

রিভলভিং চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপর জুতো সহ পা তুলে দিল রানা, সোহেলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বিদায় হ, তোকে আমার অসহ্য লাগছে।'

'কি? রডনি বুমার সম্পর্কে তথ্যগুলো…'

'আমার জানার দরকার নেই,' বলল রানা। 'তোদের কৌশল ব্যর্থ। ছুটি কাটাতে আমেরিকায় যাচ্ছি আমি, তাসমান সাগরে নয়।'

হাঁ হয়ে গেল সোহেল। 'কিন্তু বস্…'

আবার তাকে বাধা দিল রানা। 'বস্ আমাকে খোঁজ নিয়ে দেখতে অনুরোধ করেছেন, কোন নির্দেশ দেননি। কাজেই নিমবাস দ্বীপে আমি যাচ্ছি না।'

'মানবিক দিকটা ভেবে দেখবি না?' নরম সুরে মিনতি করছে সোহেল। 'দেড় হাজার আদম সন্তান মানবেতর জীবনযাপন করছে, তোর খারাপ লাগছে না? এই তোর দেশপ্রেম?'

চোখ ইশারায় ডেস্কের ওপর তোলা জুতো জোড়া দেখাল রানা। 'নিমবাস দ্বীপে যেতে আমাকে রাজি করাতে হলে তোদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। একটা হলো, তুই আমার জুতো খুলে দে, পা দুটো চুলকাই; তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা ফিরিয়ে দে। আর তা না হলে, বুড়োকে বল আমার সঙ্গে কৌশল করায় ক্ষমা চাইতে হবে।'

'খোদা! শালা পাগল হয়ে গেছে!'

'আমিও জানি,' বলল রানা, 'বুড়োকে ক্ষমা চাওয়ার কথা তুই বলতে পারবি না। কাজেই তোকে আমার জুতো খুলতে হবে। সময়সীমা পাঁচ সেকেন্ড।' কলিং বেলটা বাজাল ও। 'পারভিনকে ডাকছি, ও আসার আগেই কাজটা সেরে ফেল। একটা মেয়ের সামনে…'

পারভিন ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি। কিন্তু পাশের কামরা থেকে পারভিন নয়, সম্পূর্ণ অচেনা একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। আর কিভাবে বেরিয়ে এল! কোন মেয়ের নড়াচড়ায় ছন্দে বাঁধা এরকম চাঞ্চল্য আগে কখনও দেখেনি রানা, হাঁটা দেখে মনে হবে নাচছে; ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সালাম করার ভঙ্গিতে মোঘল রাজকুমারীর সৌষ্ঠব আর কেতা। এমন ঘর আলো করা উজ্জ্বল হাসিও আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না রানা। হলুদ মাখনের মত গায়ের রঙ, বেগুনির ওপর কালো প্রিন্টের সিল্ক শাড়ি এমন কায়দা করে পরেছে, মনে হবে পাথরে খোদাই করা কোন গ্রীক দেবী তার যৌবন গোপন রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। 'আমি নীলা।' হতভম্ব রানার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা। 'আপনার নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

এতটাই হকচকিয়ে গেছে রানা যে খেয়াল নেই একটা মেয়ের সামনে ডেস্কের ওপর পা তুলে রেখেছে। নীলার অবিশ্বাস্য রূপ শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে ওর মধ্যে। চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছে, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ভয় লাগছে, স্বপ্ন দেখছে না তো?

'মাসুদ রানা আমার আদর্শপুরুষ,' বলল নীলা, সে-ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। 'সেই কলেজ লাইফ থেকে আমি আপনার ফ্যান। আপনার সম্পর্কে

এত কিছু জানি আমি, একটা বিশাল বই লিখে ফেলতে পারি।'

খেয়াল হতেই পা দুটো ডেস্ক থেকে নামিয়ে ফেলল রানা।

'আমি শুধু ভক্তি দিয়ে আপনাকে বশ করতে চাই না, মেয়েলি সেবা দিয়ে আপনাকে সন্তুষ্টও করতে চাই,' বলল নীলা। 'বলুন কি করতে হবে আমাকে।'

'দু'দু'দু'কাপ কফি,' বলে সোহেলের দিকে সাহায্যের প্রত্যাশায় তাকাল রানা, 'কি বলিস?' নীলা ওকে সন্তুষ্ট করতে চায় শুনে ভয় পেয়ে গেছে।

'তি-তি-তি-তিন কাপ,' ব্যঙ্গ করল সোহেল। কি কারণে যেন হাসছে না সে।

'এখুনি আনছি!' আবার পাশের কামরায় অদৃশ্য হয়ে গেল নীলা।

'কে ও? আমার সম্পর্কে কোত্থেকে জানল?' ব্যগ্র দেখাচ্ছে রানাকে, ফিসফিস করছে।

'ও আমার চাচাতো বোন,' তিক্ত সুরে বলল সোহেল। 'আমার গোপন ভালবাসা। তোর সম্পর্কে আমার কাছে শুনেছে। কিন্তু তখন কি জানতাম যে শুনতে শুনতে তোর প্রেমে পড়ে যাবে ছুঁড়িটা! এমন জেদ ধরল, বসের অনুমতি নিয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে না বসিয়ে পারা গেল না। প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে পেয়ে গেল চাকরিটা, বসকে বলে পারভিনের জায়গায় ডিউটি দিতে এসেছে। আমাকে এখন প্রায় চিনতেই চাইছে না!'

'কিন্তু এ তো টিনএজার, বাচ্চা মেয়ে,' বলল রানা। 'তোর বা আমার সঙ্গে একদম মানায় না।'

'তোকে বলেছে! ওর বয়েস ছাব্বিশ, দেখে যতই কচি মনে হোক। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে চাকরির দরখাস্ত করেছিল।'

'ফ্যানরা ফ্যানাটিক হয়ে ওঠে, সেজন্যেই ওদেরকে ভয় পাই আমি,' একটা ঢোক গিলে বলল রানা। 'তুই ভাই ওর হাত থেকে রক্ষা কর আমাকে।' নীলা সোহেলের গোপন ভালবাসা, শোনার পর সাবধান হয়ে গেছে ও।

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোহেলের চেহারা। 'রক্ষা করতে পারি, তবে শর্ত আছে।'

'বল, তাড়াতাড়ি বল!' ভাব দেখে মনে হলো সাংঘাতিক কোন শারীরিক কষ্টের মধ্যে আছে রানা।

'আরও এক প্যাকেট সিগারেট ছাড়।'

বিনাবাক্যব্যয়ে পকেট থেকে আরও এক প্যাকেট সিগারেট বের করে সোহেলের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'একটু খুলে বল দেখি আমার ঘাড় থেকে ওকে তুই নামাবি কিভাবে?'

রানার এই নির্লোভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা সংযম সম্পর্কে জানে সোহেল। স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চায় এমন অনেক সুন্দরী মেয়েকে এড়িয়ে গেছে শুধু মন সায় না দেয়ায়। 'আমরা কাজের কথায় এমন ডুবে যাব, ওকে দেখতে বা চিনতে পারব না,' বলল সোহেল। 'আজকের দিনটা এভাবেই কাটুক। আর কাল তো তুই ঢাকা ছেড়ে চলেই যাচ্ছিস। যাবার আগে আমার সম্পর্কে ওকে দু'একটা ভাল কথা শুনিয়ে যাস। আমি আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই...'

'তাহলে কাজের কথা শুরু কর,' তাগাদা দিল রানা।

ট্রাউজারের পকেট থেকে লম্বা একটা নোটবুক বের করল সোহেল। 'বুমার পরিবার সম্পর্কে রীতিমত রিসার্চ করেছে মরটন। ওদের ইতিহাস যেন কোন এপিক উপন্যাস থেকে নেয়া বিশাল এক সাম্রাজ্যের উত্থান পর্ব।'

'রডনি বুমার সম্পর্কে কি জানা গেছে? পরিবার প্রধান এখন তিনিই তো?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোককে নিভৃতচারী বলতে পারিস, সহজে কারও চোখে ধরা দেন না। ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে, অহঙ্কারী আর বিবেকহীন মানুষ। ব্যবসায়িক বা অন্য যে-কোন সূত্রে যার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, কেউ তাঁকে পছন্দ করতে পারেনি।'

'কিন্তু প্রচণ্ড ধনী,' বলল রানা।

'মাত্রাটা শুধু আপত্তিকর নয়, প্রায় ঘৃণার উদ্রেক করে,' কথাটা বলার সময় চেহারা এমন বিকৃত করল সোহেল, যেন এইমাত্র একটা মাকড়সা খেয়ে ফেলেছে। 'ধনকুবেরদের তালিকায় ছ'নম্বরে আছেন। বুমার কনসোলিডেটেড মাইনিং লিমিটেড-এর একক মালিক—কোন স্টকহোল্ডার, শেয়ারহোল্ডার বা পার্টনার নেই। প্যাসিফিক নিমবাস নামে একটা সিসটার কোম্পানীও আছে, হীরে ছাড়াও আরও অন্যান্য রত্ন তোলে খনি থেকে।'

'কিভাবে শুরু করলেন ভদ্রলোক?'

'না, তাঁর নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। যা কিছু পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে পরিবারের আর কেউ যাতে কোন ভাগ না পায় সেজন্যে প্রচুর খুন-খারাবি করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর পরিবার সম্পর্কে জানতে হবে। আর তা জানতে হলে আঠারোশো ছাপান্ন সালে ফিরে যেতে হবে...'

'সংক্ষেপে, কেমন?'

ঘর আলো করে ফিরে এল নীলা, হাতে একটা ট্রে, লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে মন বা ভুবন ভোলানো হাসি; হাইহিল পরা পা থেকে ওঠা খট-খট আওয়াজ শ্রোতৃমণ্ডলীর পালস রেট বাড়িয়ে দিচ্ছে। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই নীলার ঠোঁট থেকে মুছে গেল হাসি। আরে, কি আশ্চর্য, ওরা তার দিকে একবার তাকাচ্ছেও না! হাইহিলের আওয়াজ থেমে গেল। ডেস্কের এক ধারে দাঁড়িয়ে রানা আর সোহেলের মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছে বেচারি। 'কফি,' বলল সে। কোন সাড়া না পেয়ে অভিমানে ঠোঁট ফোলাতে গিয়েও ফোলাল না। ট্রে-টা ডেস্কে আগেই নামিয়ে রেখেছে, এবার দু'জনের সামনে একটা করে কফির কাপ রাখল, রাখার সময় জোরাল শব্দ করতে ভুলল না। রানা বা সোহেলের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সোহেল কথা বলছে, রানা তার সম্মোহিত শ্রোতা।

আরও কিছুক্ষণ ওদেরকে নিঃশব্দে দেখল নীলা, সোহেলের কথাগুলো কান পেতে শুনল, শান্ত একটা গাম্ভীর্যের ভাব ফুটল তার চেহারায়। হাতে ট্রে নিয়ে এক পা পিছাল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে এগোল। দরজার কাছে পৌঁছে আরেকবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অসহায় আর বিষণ্ন লাগছে তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

বুমার পরিবারের ইতিহাস প্রায় মুখস্থ বলে যাচ্ছে সোহেল, হাঁটুর ওপর খোলা নোটবুকের ওপর চোখ বুলাচ্ছে মাঝে মধ্যে। ব্রিফিং শুরু হবার পর অন্য দিকে খেয়াল নেই রানার, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে।

আজ থেকে একশো চল্লিশ বছর আগের কথা। দুশো কয়েদীকে নিয়ে নিমবাস নামে একটা ক্লিপার শিপ ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিল। প্রথমে শুরু হলো শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম ঝড়, তারপর কয়েদীরা বিদ্রোহ করল। জাহাজ ভেঙে গেল, বহু সৈনিক আর কয়েদী মারা গেল; অবশেষে একটা ভেলায় চড়ে মাত্র আটজন মানুষ তাসমান সাগরের অচেনা এক দ্বীপে পৌছুতে পারল। কয়েদীদের মধ্যে দুটো মেয়ে ছিল, তাদের একজনের নাম ক্যান্ডি ফ্লেচার। কম্বল চুরির অপরাধে ত্রিশ বছরের জন্যে নির্বাসনে পাঠানো হয় তাকে। ওই দ্বীপে দ্বিতীয় পুরুষ কয়েদী জিম বুমারের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। জিম ছিল ডাকাত। ওদের বিয়ে পড়ালেন ক্লিপার শিপ নিমবাসের ক্যাপটেন মাইলস রডগার। তাঁর যুগে খুব নামকরা ক্যাপটেন ছিলেন রডগার।

সোহেল এ পর্যন্ত বলার পর রানা মন্তব্য করল, 'তখনকার দিনে লঘু পাপে গুরুদণ্ডের প্রচলন ছিল। আমরা তাহলে জানলাম, রডনি বুমারের গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার ছিলেন ডাকাত, আর গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডমাদার ছিলেন কম্বল চোর। ঝড়, বিদ্রোহ, দ্বীপ খুঁজে পাওয়া, বিয়ে, এ-সব তথ্য প্রকাশ পেল কিভাবে?'

'সে কথায় পরে আসছি। বেঁচে যাওয়া আটজনের মধ্যে চারজন ছিল কয়েদী–দুই মেয়ে, দুই ছেলে। সৈনিক ছিল দু'জন। আর ছিল ক্যাপটেন ও একজন কার্পেন্টার। জিম আর ক্যান্ডির মত বাকি দু'জন কয়েদীও বিয়ে করে। দ্বীপে আশ্রয় নেয়ার দু'বছর পর আবার একটা বড় ঝড় হলো, সেই ঝড়ে লেগুনে ভেসে এল একটা ফ্রেঞ্চ জাহাজ। ঝড় থামার পর দেখা গেল জাহাজটা ভেঙে গেছে, নাবিকরা কেউ বেঁচে নেই। এই ভাঙা জাহাজ মেরামত করে ক্যাপটেন রডগার আর কার্পেন্টার তাসমান সাগর পাড়ি দিলেন, পৌছুলেন অস্ট্রেলিয়ায়।'

এখানে ক্যাপটেন রডগারের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই কয়েদী দম্পতি জানত সভ্যজগতে ফিরলে তাদেরকে বাকি জীবন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাই সিদ্ধান্ত নেয় সুন্দর দ্বীপটা ছেড়ে কোথাও তারা যাবে না। জাহাজে যখন কয়েদীরা বিদ্রোহ করে তখন ক্যাপটেনকে সাহায্য করেছিল জিম বুমার, তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি, ফলে তাদের থেকে যাবার সিদ্ধান্ত বিনা তর্কে মেনে নেন। অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে পেনাল কলোনি অথরিটিকে রিপোর্ট করেন, কয়েদীরা সবাই মারা গেছে।

জিম বুমার দ্বীপটার নাম রাখেন নিমবাস। ক্যান্ডির গর্ভে তার দুই ছেলে হয়। অপর দম্পতি একটা কন্যাসন্তান জন্ম দেয়। বাকি দু'জন সৈনিকের বয়েস হয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় মারা যায় তারা। দুই ছোট্ট পরিবার তাদের তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে থাকে নিমবাসে। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছেন ক্যাপটেন রডগার, নাবিকদের নিমবাস দ্বীপের কথা বলেছেন তিনি। তিমি শিকারী নাবিকরা তাদের জাহাজ নিয়ে ওই দ্বীপে নোঙর ফেলতে শুরু করল। জিম বুমারের সঙ্গে তারা পণ্য বিনিময় করে। মিষ্টি পানি, নারকেল, তাজা শাক-সবজির বিনিময়ে জিম পায় কাপড়চোপড়, ওষুধ, তেল, সিগারেট ইত্যাদি।

ক্যাপটেন রডগার আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে মারা যান। তিনি একটা ডায়রী

রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে সেটা দৈনিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দেয়। ওই ডায়রী থেকেই এত সব কথা জানার সুযোগ হয় তখনকার দিনে।

'তোর গল্পের মধ্যে এখনও হীরে আসছে না কেন?' সোহেলকে প্রশ্ন করল রানা।

'একটু ধৈর্য ধরো, বৎস,' জবাব দিল সোহেল। 'পুরো ছবিটা পেতে হলে পিছনটা ভাল করে দেখে নিতে হবে। হীরের কথা বলছিস, হীরে সম্পর্কে আমরা কি জানি?'

ডায়মন্ড বা হীরে এক অর্থে অভিশপ্তও বটে। অন্তত অন্য কোন দামী রত্ন হীরের মত এত অপরাধ, দুর্নীতি আর বেদনাদায়ক রোমান্সের জন্ম দেয়নি। বলা হয়, ডায়মন্ড ইজ ফরএভার। কিন্তু হীরে আসলে কি? স্রেফ জমাট বাঁধা কার্বন ছাড়া কিছুই নয়, রাসায়নিক ব্যাখ্যায় গ্রাফাইট আর কয়লার সহোদরা। ধারণা করা হয় তিন বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর একশো বিশ থেকে দুশো কিলোমিটার গভীরে প্রথম তৈরি হয় হীরে। অবিশ্বাস্য তাপ আর চাপে, গ্যাস ও তরল পাথরের সঙ্গে নির্ভেজাল কার্বন ভলকানিক শাফটের মধ্যে দিয়ে সারফেসের দিকে উঠে আসতে শুরু করে। এই শাফটকে সাধারণত পাইপ বলা হয়। এই মিশ্র পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে যখন ওপরে উঠছে, ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধে কার্বন, অতি মাত্রায় কঠিন আর স্বচ্ছ পাথরে পরিণত হয়। অতটা গভীর তলদেশ থেকে অল্প যে-ক'টা মেটিরিয়েল পৃথিবীর সারফেসে পৌঁছায় তার মধ্যে হীরে একটা।

যে শাফট ধরে ওপরে উঠে আসে হীরে সেটার আকৃতি প্রায় গোল হয়, যতই সারফেসের দিকে ওঠে ততই চওড়া হতে থাকে, অথবা সরু–কখনও জাহাজের চিমনির মত, আবার কখনও গাজরের মত। লাভা যখন আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তখন তরল থাকে, কিন্তু তরল পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হীরে ওপরে ওঠার সময় দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, জমাট বেঁধে শক্ত ঢিবি বা স্তূপে পরিণত হয়। এই ঢিবি বা স্তূপ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয়ে যায়, হীরেগুলো ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেগুলোকে বলা হয় পাললিক তলানি। ক্ষয়ে যাওয়া শাফট বা পাইপ অনেক সময় লেকে পরিণত হয়। তবে স্ফটিকে পরিণত পাথরের বড় টুকরোগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ বা শূট-এ থেকে যায়।

নিমবাস দ্বীপের কয়েদীদের ভাগ্য ঈর্ষার উদ্রেক না করে পারে না। দ্বীপটার দুই মাথায় দুটো আগ্নেয়গিরি আছে। ওই ঢিবি দুটোয় ছিল বিপুল হীরেসমৃদ্ধ দুটো পাইপ। প্রথমে তারা দেখেও চিনতে পারেনি যে ওগুলো হীরে। শত-সহস্র বছরের বৃষ্টি আর বাতাস পাথর থেকে ওগুলোকে আলাদা করে ফেলে। ক্যাপটেন রডগারকে লেখা চিঠিতে ক্যান্ডি ওগুলোর বর্ণনা দেয়, 'বাচ্চাদের খেলার জন্যে সুন্দর সুন্দর পাথর আছে এখানে।' আসলে কাটা ও পালিশ করা না হলে হীরেকে নিষ্প্রভ সাধারণ পাথর বলে মনে হবে, কোন আলো বিকিরণ করবে না। সাধারণত অদ্ভুত আকৃতির সাবানের মত দেখতে হয়।

ওগুলো যে আসলে হীরে, সেটা প্রথম জানা গেল আঠারোশো ছেষট্টি সালে। আমেরিকান সিভিল ওঅর তখন থেমে গেছে, গভীর সমুদ্রে জাহাজ বহরের নোঙর ফেলার সুযোগ-সুবিধে পাবার আশায় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অনুসন্ধানী

অভিযানে বেরিয়েছে ইউ. এস. নেভীর একটা জাহাজ; খাবার পানিতে টান পড়ায় নিমবাস দ্বীপে ভিড়ল তারা। জাহাজে একজন জিওলজিস্ট ছিলেন। জিম বুমারের বাচ্চা ছেলেরা সৈকতে পাথর নিয়ে খেলছে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন তিনি। একটা পাথর চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, ওটা হীরে, ওজন হবে কম করেও বিশ ক্যারাট। হতভম্ব হয়ে জিম বুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, এই পাথর কোত্থেকে এল? তাঁর কৌতূহল লক্ষ করে সাবধান হয়ে যায় জিম বুমার, উত্তর দেয়, ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

জিম বুমার মারা যাবার পর ক্যান্ডি তার দুই ছেলে, জেস জুনিয়ার আর মাইকেল বুমারকে ইংল্যান্ডে ক্যাপটেন মাইলস রডগারের কাছে পাঠিয়ে দেয় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করানোর জন্যে। দুই ছেলের সঙ্গে অপর দম্পতির মেয়ে সুজান নেলসনকেও পাঠানো হয়। বাচ্চা তিনটের সঙ্গে একটা কাপড়ের ছোট থলেতে ভরে কিছু আন কাট ডায়মন্ডও পাঠায় ক্যান্ডি, বাচ্চাদের লেখাপড়া আর থাকা-খাওয়ার খরচ মেটানোর জন্যে। রডগার তার বিশ্বস্ত এমপ্লয়ার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্টকে ওই হীরে বিক্রি করতে দেন। স্টুয়ার্ট হীরেগুলো কাটার পর পালিশ করান, তারপর ইংল্যান্ডের বাজারে এক মিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি করেন। তখনকার দিনে এক মিলিয়ন পাউন্ড মানে সাত মিলিয়ন ডলার।

ছেলে দুটো কেমব্রিজে লেখাপড়া শুরু করে। সুজান ভর্তি হয় লন্ডনের বাইরে এক বোর্ডিং স্কুলে। ডিগ্রী পাবার পর মাইকেল বুমার সুজানকে বিয়ে করে, তারপর ফিরে আসে নিমবাস দ্বীপে। ফিরেই আগ্নেয়গিরি থেকে হীরে উদ্ধারের জন্যে মাইনিং অপারেশন শুরু করে সে। জেস জুনিয়র ইংল্যান্ডেই থেকে যায়, অ্যাবেল ময়নিহান নামে এক ইহুদি ডায়মন্ড মার্চেন্টের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করে। পরে লন্ডনেই বিলাসবহুল শো রুম খোলে তারা, নিমবাস থেকে আনা হীরে কেটে পালিশ করার জন্যে কারখানাও গড়ে তোলে। শুরু হলো বিশাল এক সাম্রাজ্যের উত্থান পর্ব। নিমবাস দ্বীপের জোড়া পাইপে পাওয়া হীরেগুলো ছিল অতি দুর্লভ ভায়োলেট-রোজ কালারের, বাজারে এগুলো অন্যান্য হীরের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিকোয়।

'এত বছর ধরে পাইপ থেকে হীরে তোলা হচ্ছে, তবু খালি হয়নি?' এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এতদিন হয়নি, তবে এবার বোধহয় হবে,' বলল সোহেল। 'হীরের বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় কার্টেল প্রথায়। দাম চড়া রাখার জন্যে কার্টেলের সঙ্গে আলোচনা করে উৎপাদন সীমিত রাখতে হয় বুমার কনসোলিডেটেড মাইনিং কোম্পানীকে।'

'ওদের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে বল।'

'মাইকেল আর সুজানের একটা ছেলে হয়, নাম টস বুমার। জেস জুনিয়র বিয়ে করেনি।'

'টস্ বুমার তাহলে রডনি বুমারের গ্র্যান্ডফাদার?'

'হ্যাঁ।'

টস বুমার চল্লিশ বছর কোম্পানীর হাল ধরে রাখেন। পরিবারের একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলতে হবে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে অসংখ্য লাইব্রেরী আর

হাসপাতাল গড়েছেন। একমাত্র ছেলে ডার্ক আর একমাত্র মেয়ে মেরিকে রেখে উনিশশো দশ সালে মারা যান। মেরি মারা যায় অল্প বয়েসে, বোট অ্যাক্সিডেন্টে। পারিবারিক ইয়টে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল, কিভাবে যেন সাগরে পড়ে যায়। লাশ পাওয়া যায়নি, হাঙরে খেয়ে ফেলে। তবে গুজব ছড়াল, ডার্ক তাকে খুন করেছে। প্রচুর টাকা খরচ করায় কোন তদন্ত হয়নি। ডার্কের হাতে পড়ে পারিবারিক ব্যবসাটা আরও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। পরিবারের মধ্যে লোভ, ঈর্ষা আর নিষ্ঠুরতারও বিস্ফোরণ ঘটে।

রানা বলল, 'কোন একটা মার্কিন পত্রিকায় আমি একবার একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম, তাতে স্যার ডার্ক বুমারকে ডি বিয়ার-এর স্যার আর্নেস্ট ওপেনহেইমার-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল।'

'দু'জনের কাউকেই তুই সাধু বলতে পারবি না। ডি বিয়ারের ওপেন-হেইমারের উত্থান কিংবদন্তীকেও হার মানায়। কোন বাধাকেই তিনি বাধা মনে করতেন না।'

ওপেনহেইমারের সাম্রাজ্য সবগুলো মহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ডি বিয়ার শুধু হীরের ব্যবসায় আবদ্ধ থাকেনি। যানবাহন, কাগজ, বিস্ফোরক, সোনা, ইউরেনিয়াম, তামা ইত্যাদি উৎপাদন শুরু করে তারা। তবে বুমার মাইনিং হীরে ছাড়া অন্য ব্যবসা খুব কমই করেছে। ইদানীং, এই বছর তিনেক হলো, বার্মায় রুবি, কলম্বিয়ায় এমারেল্ড আর শ্রীলংকায় স্যাফায়ারের ব্যবসায় হাত দিয়েছে।

রানা জানতে চাইল, 'ডি বিয়ার নামটা কোত্থেকে এল?'

'ডি বিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকার একজন কৃষকের নাম, না বুঝে সে তাঁর হীরে বোঝাই জমিটা মাত্র কয়েক ডলারে সিসিল রোডস-এর কাছে বিক্রি করে দেয়। ওই হীরে পাবার পর কার্টেল প্রথা চালু করেন রোডস। ওই কার্টেলে ডার্ক বুমারও যোগ দিতে বাধ্য হন।

যত হীরে উৎপাদন হয় তার পঁচাশি ভাগই নিয়ন্ত্রণ করে ডি বিয়ার। কার্টেলের সঙ্গে থেকেও ডি বিয়ার বা কার্টেলকে এড়িয়ে বুমার মাইনিং তার উৎপাদিত হীরে নিজস্ব চেইন অব স্টোর থেকে বিক্রি করে। সারা পৃথিবীতে পাঁচশোর মত দোকান আছে ওদের।'

'স্যার ডার্ক বুমার সত্তর দশকের শেষ দিকে মারা যান, তাই না?'

সোহেল হাসল। 'এখানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবি। মোনাকার কাছাকাছি ইয়ট থেকে পড়ে যান তিনি, পানিতে ডুবে মারা যান, আটষট্টি বছর বয়েসে। গুজব শোনা যায়, রডনি বুমার তাকে মদ খাইয়ে মাতাল বানান, তারপর ধাক্কা দিয়ে সাগরে ফেলে দেন।'

'রডনি বুমারের গল্পটা বল এবার।'

'রডনির নোংরা কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যদি জানে, তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত কেউ আর কোন হীরে কিনবে না। গত ত্রিশ বছর ধরে একের পর এক খুন করে যাচ্ছেন তিনি। সবগুলো হত্যাকাণ্ডই এমন নিখুঁতভাবে সাজানো, অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।'

উনিশশো একচল্লিশ সালে নিমবাস দ্বীপে রডনি বুমারের জন্ম। ডার্ক বুমারের

চার ছেলে আর এক মেয়ের মধ্যে তিনি মেজো। ফুটবল খেলা দেখে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার বড় ভাই দর্শকদের ভিড়ের চাপে পড়ে দম আটকে মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে বলেছে, দর্শকদের মধ্যে কুখ্যাত কয়েকজন খুনী ছিল, সেই খুনীরা নাকি এক সময় নিমবাস দ্বীপে প্রহরী হিসেবে কাজ করত। বোনটা মারা যায় ড্রাগস খেয়ে, সাপ্লাই পেত রডনির পরিচিত একজন ডিলারের কাছ থেকে। ছোট ভাই নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন এভিনিউয়ে নিজের ফ্ল্যাটে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। কোন চিরকুট রেখে যায়নি, তবে পুলিস স্টেশনে ফোন করে জানায়, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই পথ বেছে নিচ্ছে সে। তার নাম নিয়ে অন্য কেউ ফোন করেছিল কিনা জানা যায়নি। ফ্ল্যাটে তখন কেউ ছিল না। রডনি ছিলেন সিডনিতে। তবে বিল্ডিঙের অন্য বাসিন্দারা পুলিসকে জানায়, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে ফ্ল্যাট থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ পেয়েছে তারা। পুলিস দু'জনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট উদ্ধার করে, তার মধ্যে একটা ছিল কুখ্যাত এক ভাড়াটে খুনীর। দু'মাস পর লোকটার লাশ পাওয়া যায় মেলবোর্ন-এর রাস্তায়, পিছন থেকে কেউ মাথায় গুলি করে পালিয়েছে। রডনি বুমারের শেষ ভাই মারা যায় এইডস-এ আক্রান্ত হয়ে। এক্ষেত্রে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, রডনিই কৌশলে তার রক্তে এইডস-এর ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

'পরিবারের সবাই মারা গেল, একা শুধু রডনি বেঁচে থাকলেন?'

'থাকলেন। আইন বা বিচার ব্যবস্থা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি,' বলল সোহেল। 'প্রমাণ কোথায়?'

'মৃত্যুগুলোর জন্যে তিনিই দায়ী, এ না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'তিনি দায়ী হলে কোন না কোন প্রমাণ থাকতই।'

'হয়তো ছিল,' বলল সোহেল। 'টাকা দিয়ে সব মুছে ফেলার ব্যবস্থা করেন রডনি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'ভাল লোকের সঙ্গেই লাগতে বলছিস আমাকে তোরা। আরও শোনা।'

আমেরিকার কলোরাডোয়, কলোরাডো স্কুল অব মাইনিং-এ, লেখাপড়া করেছেন রডনি বুমার। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ঘাড়, অথচ খেলাধুলোয় তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না বা এখনও নেই। ছাত্র জীবনে রকি মাউন্টেনে ছড়িয়ে থাকা পরিত্যক্ত খনিগুলোয় ঢুঁ মারার বিশেষ শখ ছিল। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডিগ্রী নেয়ার পর ডি বিয়ারের খনন কর্মসূচীতে যোগ দেয়ার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা যান। ওখান থেকে পাঁচ বছর পর পারিবারিক দ্বীপ নিমবাসে ফিরে আসেন, নিজেদের খনিতে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। বুমার মাইনিং-এর হেডকোয়ার্টার সিডনিতে, ওখানে আসা-যাওয়া করার সময় লিজা ভার্গি নামে সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়। বায়োলজির এক প্রফেসরের মেয়ে লিজা, রডনি তাকে বিয়ে করেন। একটাই মাত্র সন্তান ওঁদের, মলি বুমার। বাপের সঙ্গে মেয়ের বনিবনা হয়নি।

'মলির মা সম্পর্কে বল।'

'তেমন কিছু বলার নেই। লিজার মৃত্যুও রহস্যজনক।'

লিজা বুমার মারা গেছেন পনেরো বছর আগে। মৃত্যুর এক বছর পর সিডনির একটা খবরের কাগজে প্রথম খবরটা ছাপা হয়। পত্রিকার সম্পাদক লিজা বুমারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর কথা স্মরণ করেন। রডনি আসলে সময় মত ঘুষ দিতে পারেননি, তাই খবরটা ছাপা হয়ে যায়। তা না হলে লিজার মৃত্যুর কথা কেউ জানতেই পারত না।

রডনি বুমারের নাগাল পাওয়া এক কথায় প্রায় অসম্ভব। প্রকাশ্যে কোথাও তাঁকে দেখা যায় না, সামাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলেন, তাঁর কোন বন্ধু নেই। সিডনির হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙে আসা-যাওয়া করেন গোপন একটা টানেলের ভেতর দিয়ে। বাইরের দুনিয়া থেকে নিমবাস দ্বীপটাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।

নিজে যেমন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন রডনি, তেমনি বুমার মাইনিং-এর বিশাল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডও গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যক্তি মালিকাধীন করপোরেশন হত্যা থেকে শুরু করে সব ধরনের ক্রাইম করেও আইনের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো ট্যাক্স ধরার জন্যে কোম্পানীর প্রকৃত সম্পদ আর লাভের পরিমাণ জানার কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু কোথাও তারা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। সরকারী কর্মকর্তাদের আনুগত্য কেনার জন্যে বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন রডনি। তিনি যে পরিমাণ ট্যাক্স দিতে চান, তাই ধরা হয়।

'এবার মেয়েটা সম্পর্কে কি জানিস বল।'

মলি বুমার সম্পর্কে সোহেল জানাল; বাপের সঙ্গে তার বনিবনা হয় না, এর বেশি তেমন কিছু জানা যায়নি। পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। নিজে রোজগার করে লেখাপড়া শিখেছে। মেরিন জুলজিস্ট।

'রডনি বুমার খুন-খারাবি ভালবাসেন, তাহলে নিশ্চয়ই গুণ্ডা-পাণ্ডা পোষেন তিনি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। দু'জন দুর্ধর্ষ মাসলম্যান আছে তাঁর, তাদেরকে সুপারভাইজার বলা হয়। মাইকেল শেলফিন আর রবার্ট হল্ট।'

এরপর রানা জানতে চাইল, প্যাসিফিকে যে মড়ক লেগেছে তার সঙ্গে রডনি বুমারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা।

'ওটাই তো তোকে জানতে হবে,' এর বেশি কিছু বলতে রাজি হলো না সোহেল। 'নুমা কি বলে দেখ।'

রানার সর্বশেষ প্রশ্ন, 'হীরের মধ্যে কি এমন আছে যা মানুষকে উন্মাদ করে তোলে? হীরেকে নিয়ে কেন এত রহস্য, কেন এত খুন-খারাবি? হীরের জন্যে অনেক জাতি ও সরকারের পতন ঘটেছে, কারণটা কি?'

'কেটে পালিশ করার পর যে সৌন্দর্য ফোটে, তা তো আছেই,' বলল সোহেল, 'তাছাড়াও, হীরের রয়েছে অন্যান্য ইউনিক কোয়ালিটি। হীরে হলো দুনিয়ার সরচেয়ে কঠিন বস্তু। সিল্কের সঙ্গে ঘষ, ওটা পজিটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ উৎপাদন করবে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় বের কর, পরে অন্ধকারের ভেতর অপার্থিব আলো ছড়াবে। না, দোস্ত, হীরে শুধুই মিথ নয়, তারচেয়েও বড় কিছু।

মায়া বা ভ্রম সৃষ্টিতে হীরের কোন জুড়ি নেই।'

'আমি কিন্তু মায়া বা ভ্রম নই!' আবার ভেতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল নীলা, হাতে একটা কালো ব্রীফকেস। 'আমাকে শুধু নিছক মজার খেলাও বলা যাবে না। মাসুদ রানার জন্যে আমি বাস্তব প্রয়োজন।' ঠোঁটে মন ভোলানো হাসি আর পায়ে নৃত্যের ছন্দ তুলে এগিয়ে এল, ডেস্কের ওপর রেখে ব্রীফকেসটা খুলল। 'এই নিন আপনার নতুন পাসপোর্ট আর অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় যাবার ভিসা।' কাগজগুলো বের করে রানার সামনে রাখল। 'এখানে এটা আপনার পরিচয়-পত্র–বিশেষ দূত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আর এই নিন আপনার প্লেনের টিকিট ও ট্রাভেলার্স চেক। সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিন, তারপর বলুন আজ সন্ধের দিকে আপনার মনোরঞ্জনের জন্যে কি করতে হবে আমাকে।'

কাগজগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে সোহেলের দিকে তাকাল রানা, সে দৃষ্টিতে করুণ আবেদন ফুটে উঠল, যেন বলতে চাইছে, আমাকে বাঁচা, ভাই।

সোহেল কাশতে গিয়ে বিষম খেলো, তারপর বলল, 'কিন্তু নীলা, সন্ধের আগেই তো তোমার ছুটি হয়ে যাবে। তাছাড়া, রানার মনোরঞ্জন করা তোমার চাকরি নয়...'

সোহেলকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নীলা বলল, 'সোহেল ভাই, তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ? নতুন হতে পারি, তাই বলে ভেবো না নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন নই। মাসুদ ভাইয়ের মনোরঞ্জন করা আমার চাকরি নয় বলছ? কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেয়ার সময় বস্ আমাকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ওঁর সব রকম সুযোগ-সুবিধে আমাকেই দেখতে হবে। বিশেষ করে কোন অ্যাসাইনমেন্টে যাবার আগে আমার কাজ হবে ওঁকে উৎসাহ দেয়া, ওঁকে রিল্যাক্স হতে সাহায্য করা, দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখা, ওঁর আরাম-আয়েশের দিকে খেয়াল রাখা। শুধু তাই নয়, আরও বলেছেন, ইট'স আ হোল টাইম জব।'

'বস্ বলেছেন? এ-সব কথা বস্ তোমাকে বলেছেন?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা।

'বিশ্বাস না হলে বসকে জিজ্ঞেস করে দেখেন,' বলে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল নীলা। রিসিভার তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'নিন, আমি সত্যি কথা বলছি কিনা জেনে নিন।'

'সর্বনাশ, করো কি!' নীলার হাত থেকে ইন্টারকমের রিসিভারটা নিয়ে জায়গামত রেখে দিল সোহেল। 'ঠিক আছে, তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আজ সন্ধের দিকে পারভিনের সঙ্গে ডেটিং আছে রানার। পরে একদিন তুমি তোমার দায়িত্ব পালন কোরো, কেমন?'

'অবশ্য সোহেল আজ অফিসের পর একদম ফ্রী থাকবে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'তুমি বরং এক কাজ করো, নীলা। গুলশানে সোহেল নতুন যে বাড়িটা বানিয়েছে, ওর সঙ্গে গিয়ে দেখে এসো ওটা। আমার ধারণা, বাড়িটা তোমার পছন্দ হবে।'

নীলার চেহারায় কঠিন একটা ভাব ফুটে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, 'না, মাসুদ

ভাইকে আমি পারভিন আপার সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারি না।'

'সেকি! কেন?'

'পারভিন আপার সর্দি হয়েছে। সর্দি ছোঁয়াচে। অ্যাসাইনমেন্টে যাবার আগে মাসুদ ভাই সর্দিতে আক্রান্ত হলে আমার চাকরি নট হয়ে যাবে।'

'তাহলে?' আবার সাহায্যের আশায় সোহেলের দিকে তাকাল রানা।

'আজ অফিস ছুটির পর থেকে যতক্ষণ না ঘুমান আপনি ততক্ষণ আপনার ছায়া হয়ে থাকব আমি,' বলল নীলা, ঠোঁট টিপে হাসল, দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল পালা করে। 'আমাকে লক্ষ রাখতে হবে আপনি যেন কোন টেনশনে না ভোগেন।'

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করল রানা। ও বুঝে ফেলেছে, সোহেল কোন সাহায্যে আসবে না। 'আমি তোমার ইমিডিয়েট বস্, তাই না, নীলা? আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, অফিস ছুটির পর সোহেলের সঙ্গে ওর বাড়িটা দেখতে যাবে তুমি।'

'নির্দেশটা একটু অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে,' ম্লান হেসে বলল নীলা, 'তবু আপনার নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে। ঠিক আছে, যাব আমি। তবে নিজেকেও আপনি একই নির্দেশ দিন, প্লীজ।'

'তারমানে?'

'বলুন আপনিও আমার সঙ্গে সোহেল ভাইয়ের বাড়িটা দেখতে যাচ্ছেন,' ভুরু নাচিয়ে বলল নীলা। 'আগেই বলেছি, ঘুমাতে যাবার আগে পর্যন্ত আপনার ছায়া হয়ে থাকতে হবে আমাকে। এটা আমার দায়িত্ব।'

চেহারায় গাম্ভীর্য ধরে রেখে তিক্ত একটা ঢোক গিলল রানা। 'হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি।'

'তাহলে আমরা তিনজনই যাচ্ছি,' বলল সোহেল, বেসুরো গলায়।

'ধ্যেত্, এ আবার তুমি কি বলছ!' সোহেলকে তিরস্কার করল নীলা। 'নিজের বাড়ি তুমি কোন দুঃখে দেখতে যাবে। চাবিটা দিয়ে রাখো, আমরা সময় মত দেখে আসব।' সোহেলের সামনে হাত পাতল সে।

'এই যা!' চেহারায় হতাশা ফুটিয়ে সোহেল বলল। 'চাবিটা ভুলে ফেলে এসেছি। সঙ্গে আমি না থাকলে দারোয়ান তোমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।'

রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'তাহলে ঠিক হলো, তিনজনই যাব আমরা।'

'অগত্যা রাজি হচ্ছি আমি,' বলল নীলা। 'তবে বাড়িটা দেখার পর মাসুদ ভাই যখন নিজের ফ্ল্যাটে ফিরবেন, ওঁর সঙ্গে একা শুধু আমি থাকব। ও না ঘুমানো পর্যন্ত তো ছুটি নেই আমার।'

'কিন্তু সোহেলের বাড়িতেই যদি আমার ঘুম এসে যায়?' নীলাকে কোণঠাসা করা গেছে ভেবে রানার চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

'হ্যাঁ, রানা যদি আমার বাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ে?' জিজ্ঞেস করল সোহেলও। 'সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে তোমাকে, নীলা। আমি তোমাকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

'জী-না। অ্যাসাইনমেন্টে যাবার আগের রাতে তোমার বাড়ি মাসুদ ভাইয়ের

জন্যে নিরাপদ বলে মনে করি না আমি। সেক্ষেত্রে আমাকেও ওই বাড়িতে থেকে যেতে হবে। বিসিআই-এর দু'জন অফিসার এক বাড়িতে থাকতে পারবে না, ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। শুধু আমরা দু'জন থাকব।'

'তাহলে আমি কোথায় থাকব?' সোহেল হতবাক।

'হোটেলে উঠবে,' বলল নীলা। 'আর তো কোন উপায় দেখছি না।'

সোহেলের কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো, তা-ই দেখে রানা বলল, 'অত চিন্তা করিস কেন। আজ রাতে আমার হয়তো ঘুমই আসবে না। আমার হয়তো ইচ্ছে হবে তোর নতুন বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখি, তাতে ভোর পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। আর আমি যতক্ষণ জেগে থাকব, আমাদের সঙ্গে তুই থাকলে নিশ্চয়ই নীলা আপত্তি করবে না।'

'তোর এই সাহায্যের কথা চিরকাল মনে রাখব আমি,' বলে দ্রুত চেয়ার ছাড়ল সোহেল। 'এখন আমি যাই রে।'

সোহেল চলে যাবার পর নীলা বলল, 'সরি, মাসুদ ভাই।'

'কেন, সরি কেন?' রানা বিস্মিত।

'যা বলেছি সব ভুলে যান,' ম্লান হেসে বলল নীলা। 'সত্যি সত্যি আমি খেলার বস্তু নই, স্যার। অন্তত আপনার জন্যে নই। এতক্ষণ যা বলেছি, সবই ছিল অভিনয়। আপনি নমস্য ব্যক্তি, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালবাসি আরেকজনকে।'

'তাহলে যে-সব কথা বলে ভয় দেখাচ্ছিলে, ওগুলোর অর্থ কি?'

'জিজ্ঞেস করবেন না, কাকে আমি ভালবাসি?'

'কাকে?'

'সেই কলেজ লাইফ থেকে একজনকেই আমি স্বপ্ন দেখে আসছি,' বলল নীলা। 'আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করেছি তাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু সে এত লাজুক, মুখ ফুটে কিছুই বলে না–না হ্যাঁ, না না। সেজন্যেই আপনার সঙ্গে এই অভিনয়টুকু করতে হলো, আপনার প্রতি আমি ঝুঁকে পড়েছি ধরে নিয়ে ওর যাতে হুঁশ হয়, যাতে ঈর্ষা বোধ করে...'

আকাশ থেকে পড়ছে রানা। 'তুমি কার কথা বলছ?'

'এখনও বুঝতে পারছেন না?' জিজ্ঞেস করল নীলা। 'আমি সোহেল ভাইকে ভালবাসি।'

'ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

'কি হলো?' নীলা হতভম্ব।

'কি হলো মানে? সোহেলও তো তোমাকে ভালবাসে! ও নিজে আমাকে বলেছে। অভিযোগ করেছে, তুমিই নাকি ওকে পাত্তা দাও না!'

হঠাৎ নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল নীলা। 'আপনি ঠিক শুনেছেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে। 'শুনতে আপনার ভুল হয়নি?'

'প্রশ্নই ওঠে না। দাঁড়াও, এখুনি আবার ডাকছি ওকে...'

'না, থাক,' শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল নীলা। 'আপনার বন্ধু শুধু লাজুক নয়, বোকাও। একটা মেয়ে প্রেম নিবেদন করলে যে লোক বুঝতে পারে না তাকে

লজ্জা দিয়েও কোন লাভ নেই। তারচেয়ে আমাকে আপনি আধ ঘণ্টা ছুটি দিন, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এখুনি যাও তুমি…,' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'তবে খালি হাতে যেয়ো না।' ফুলদানি থেকে রজনীগন্ধার দুটো স্টিক তুলে বাড়িয়ে ধরল ও। 'এগুলো আমার তরফ থেকে নিয়ে যাও।'

স্টিক দুটো নিল নীলা। 'ধন্যবাদ, মাসুদ ভাই। আপনার প্রতি আমরা দু'জনেই চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।'

'না, আরে, এর মধ্যে আমার কোন ক্রেডিট…' কিন্তু রানার কথা শোনার জন্যে নীলা অপেক্ষা করেনি, অফিস কামরা ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে গেছে সে।

তিন

দেড় হাজার বাংলাদেশী এক বছর ধরে নিখোঁজ, স্বভাবতই প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে ঢাকা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এল রানা। সিডনিতে পৌঁছে সরাসরি বুমার মাইনিং কোম্পানীর ছাব্বিশতলা হেড অফিসে হাজির হলো ও, দেখা করতে চাইল হীরক রাজা রডনি বুমারের সঙ্গে।

বিল্ডিংটায় দেড়শো ইগজেকিউটিভ-অফিসার আছেন, রানার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর তাঁদেরই একজন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন রানাকে। ভদ্রলোক প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানালেন, 'মি. রডনি বুমার সাধারণত কারও সঙ্গে দেখা করেন না, আর তাছাড়া এই মুহূর্তে তিনি সিডনিতে নেইও।' রানার উদ্বেগের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডেকে ফাইল চাইলেন কয়েকটা। সেগুলোয় চোখ বুলাবার পর, 'কিছুই গোপন করার নেই,' বলে রানাকেও দেখতে দিলেন।

দেড় হাজার বাংলাদেশীর মধ্যে বেশিরভাগই সাধারণ শ্রমিক, মাত্র পঞ্চাশজন মাইনিং এঞ্জিনিয়ার আর পঞ্চাশজন জিওলজিস্ট, তাদের সবাইকে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে চাকরি দিয়েছে বুমার মাইনিং কোম্পানী, বেতন-ভাতা-বোনাস ইত্যাদি সবই উল্লেখ করা আছে ফাইলে, কাকে কোন দ্বীপ বা খনিতে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ সহ। নিমবাস দ্বীপে আছে পাঁচশো জন, বাকি এক হাজার আছে গুডউইল আর রেড স্যান্ড-এ। তিনটে দ্বীপই পরস্পরের খুব কাছাকাছি, দশ থেকে বারো মাইলের মধ্যে।

ফাইলে চোখ বুলাবার সময় রানা খেয়াল করল, প্রত্যেকেই অবিশ্বাস্য হারে বোনাস পাচ্ছে। ও জানতে চাইল, এরা কেউই দেশে কোন চিঠি বা টাকা পাঠাচ্ছে না, কারণটা কি?

ভদ্রলোক একটু ঘুরিয়ে জবাব দিলেন। এমন কি একজন সাধারণ শ্রমিকও বোনাস সহ প্রতি মাসে বাংলাদেশী মুদ্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা কামাচ্ছে। আর বিশেষজ্ঞরা গড়ে মাথাপিছু আয় করছেন আট থেকে দশ লাখ টাকা। না, বুমার মাইনিং দানছত্র খুলে বসেনি। প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিয়ে প্রত্যেককে

ন্যায্য মজুরিই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কি কাজ কতটা করানো হচ্ছে সেটা প্রতিদ্বন্দ্বী মাইনিং কোম্পানী বা কার্টেলকে জানতে দেয়া চলে না। সেজন্যেই প্রতিটি এমপ্লয়ির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে, চাকরির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খনির বাইরে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না তারা। তথ্য ফাঁস হবার ঝুঁকি বুমার মাইনিং নিতে পারে না। বেতন আর বোনাসের টাকা সিডনি সিটি ব্যাংকে যার যার নিজস্ব অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে, ইচ্ছে করলে ব্যাংকে গিয়ে চেক করে দেখতে পারে রানা। তবে চাকরির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তার টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে পারবে না বা দেশেও পাঠাতে পারবে না।

রানা জানতে চাইল, বেতনের টাকা দেশে পাঠানোর সঙ্গে তথ্য ফাঁস হবার কি সম্পর্ক?

ভদ্রলোকের জবাব: বেতন আর বোনাসের অঙ্কটা অবিশ্বাস্য, তাই সন্দেহজনক। বুমার মাইনিং তার স্টাফকে এত বেশি বোনাস দিচ্ছে জানতে পারলে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলো আসলে কি ঘটছে জানার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে।

'আসলে কি ঘটছে?' জানতে চাইল রানা। 'আপনারা ওদেরকে দিয়ে কি করাচ্ছেন?'

হেসে উঠে ভদ্রলোক বললেন, 'তা যদি বলেই দিই, তাহলে আর বিজনেস সিক্রেট বলে কিছু থাকে কি? তবে আপনাকে আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ করানো হচ্ছে না।'

রানা এরপর সেই চিরকুট প্রসঙ্গটা তুলল, নিমবাস দ্বীপ থেকে একজন বাংলাদেশী ভারতীয় এক নাবিকের হাতে গুঁজে দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, নিমবাস দ্বীপে পাঁচশো বাংলাদেশী বন্দী মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ প্রসঙ্গে ভদ্রলোক মুখস্থ বুলির মত একটা ব্যাখ্যা দিলেন। কোম্পানীর আইন-কানুন বা নীতি যতই উদার হোক, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে কিছু লোক সব সময় থাকে। বুমার মাইনিং কোম্পানীতে ইউনিয়ন করার কোন অনুমতি নেই, সেজন্যে নিমবাসের কিছু শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেছিল, এই লোকটা সম্ভবত তাদেরই একজন। সে সম্ভবত চাকরির মেয়াদ শেষ না করেই দেশে ফিরতে চায়। কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুসারে তা সে পারে না। চিরকুটে সে যা-ই লিখে থাকুক না কেন, সবই ভিত্তিহীন অভিযোগ।

রানা প্রস্তাব দিল, অভিযোগ সত্যি না মিথ্যে সেটা জানার জন্যে নিমবাস দ্বীপে যেতে চায় ও, পরিস্থিতিটা নিজের চোখে দেখে আসবে।

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। 'সম্ভব নয়। ব্যবসা সংক্রান্ত গুমর ফাঁস হবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। নিমবাস বা বুমার মাইনিং কোম্পানীর অন্যান্য দ্বীপ রডনি বুমারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সরকারের কাছ থেকে লীজ নেয়া হয়েছে, কোম্পানীর নিজস্ব লোক ছাড়া কাউকেই দ্বীপগুলোয় যেতে দেয়া হয় না।' একটু থেমে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'কেউ যদি বিনা অনুমতিতে আমাদের কোন দ্বীপে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, বোকার মত প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে সেটা। আমাদের প্রতিটি দ্বীপ সুরক্ষিত।'

'বিনা অনুমতিতে নয়, আমি অনুমতি নিয়েই নিমবাস দ্বীপে যেতে চাই,' বলল রানা। 'আপনি রডনি বুমারকে আমার কথা জানান।'

'দুঃখিত, স্যার,' ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, 'এ-ধরনের ছোটখাট ব্যাপারে মি. বুমার মাথা ঘামান না। আপনি বরং আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।'

'সেটা কি?'

'আর তো মাত্র একটা বছর। এই এক বছর অপেক্ষা করুন, তারপর দেখবেন আমাদের বাংলাদেশী স্টাফ তাদের চাকরির মেয়াদ শেষ করে লাখ লাখ···না, কোটি কোটি টাকা নিয়ে দেশে ফিরে গেছে।'

আধ ঘণ্টা ধরে তর্ক-বিতর্ক চলল, তবে কোন লাভ হলো না। রানাকে ওরা নিমবাস দ্বীপে যাবার অনুমতি দেবে না। স্বভাবতই রেগে গেল ও। 'আমাকে অনুমতি দেবেন না, কিন্তু ইন্টারপোল যেতে চাইলে বাধা দেবেন কিভাবে?' প্রশ্ন করল ও, উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল অফিস বিল্ডিং থেকে।

অস্ট্রেলিয়ার সরকারী মহলে রানার বন্ধু-বান্ধব কম নয়, তারাও ওকে সাবধান করে দিয়ে বলল, নিমবাস এমনিতেই দুর্গম একটা দ্বীপ, তার ওপর রডনি বুমারের সিকিউরিটি সিস্টেম দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রেখেছে ওটাকে, অনুপ্রবেশ করতে গেলে সত্যি সত্যি পৈত্রিক প্রাণটা অকালে হারাতে হতে পারে। তবু রানা হাল ছাড়ল না, দু'দিন পর ইন্টারপোলের একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সিডনি থেকে নুমার রিসার্চ শিপ সী লায়নে পৌঁছুল, তারপর নুমার একটা 'কপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিমবাস দ্বীপের খোঁজে, পাইলট হিসেবে থাকল বন্ধুবর ববি মুরল্যান্ড।

নিমবাস যে সত্যি একটা দুর্গম দুর্গ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আকাশ ছোঁয়া খাড়া পাহাড়-প্রাচীর চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে দ্বীপটাকে। জলপথে তীরে পৌঁছুনোর একটাই উপায়, লেগুন হয়ে। বিপজ্জনক ঝুঁকি না নিয়ে লেগুনটায় ঢোকা সম্ভব নয়, কারণ সেটাকে ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো জলমগ্ন পাহাড়, মাত্র কয়েকটা চূড়া পানির ওপর দেখা যায়। দ্বীপটাকে ঘিরে ওদের 'কপ্টার বার কয়েক চক্কর দিল। নিমবাস শুধু হীরের ভাণ্ডার নয়, রডনি বুমারের বিলাসবহুল আস্তানাও বটে, কাজেই টাকা দিয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধে যা কিছু পাওয়া যায় তার সবই আছে এখানে। লেগুনে একটা বিশাল ইয়ট, হেলিপ্যাডে ঝকঝকে 'কপ্টার, দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পাকা রাস্তা, সুইমিং পুল, প্রাসাদতুল্য বাড়ি, লেবার ক্যাম্প, সিকিউরিটি হাউজিং ইত্যাদি আছে। আর আছে টহলরত সশস্ত্র প্রহরী, বালির বস্তার পিছনে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান।

দ্বীপটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ওরা, রেডিও যোগে হুমকি দেয়া হলো, এলাকা ছেড়ে চলে যান, তা না হলে গুলি করে ফেলে দেয়া হবে। 'কপ্টার থেকে রানা জানাল, ওরা একটা অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করতে এসেছে, সঙ্গে ইন্টারপোলের একজন অফিসারও আছেন, কাজেই দ্বীপে নামার অনুমতি দেয়া হোক। এরপর ইয়ট থেকে ওর সঙ্গে কথা বললেন রডনি বুমার নিজেই। অভিযোগটা কি জানতে চাইলেন তিনি। শোনার পর বললেন, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে দ্বীপে নামতে দেয়া সম্ভব নয়, তবে ইচ্ছে করলে ওরা তাঁর ইয়টে নামতে পারে।

হেলিপ্যাড থেকে রডনি বুমারের 'কপ্টার আকাশে উঠল, তার জায়গায় ল্যান্ড করল নুমার 'কপ্টার। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন রডনি বুমার। পঞ্চাশের মত বয়েস, অথচ এখনও কাঠামোটা লাইটপোস্টের মত ঋজু। চেহারাতেই লেখা আছে অত্যন্ত দাম্ভিক মানুষ। তুচ্ছ জ্ঞান করেন না এমন প্রাণী বা বস্তু তাঁর অভিধানে আছে কিনা সন্দেহ। অভ্যর্থনা বলতে শুধুই করমর্দন, ওদেরকে তিনি কেবিনে ডাকলেন না বা আপ্যায়নও করলেন না। করমর্দনের পরপরই উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়ে গেল। রডনি বললেন, তিনি তাঁর দ্বীপে কি কবছেন না করছেন সে-ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার কারও নেই। এ-ও বললেন যে তিনি কোন বেআইনী বা অন্যায় কাজ করছেন না।

রানার অভিযোগ শুনলেন তিনি। জবারে তিনজন বাংলাদেশী মাইনিং এঞ্জিনিয়ারকে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন। তারা রানার প্রশ্নের উত্তরে পালা করে জানালো, হীরের খনিতে কাজের পরিবেশ অত্যন্ত ভাল, তাদের ওপর কোন রকম অত্যাচার করা হচ্ছে না।

রানা বুঝতে পারল, রডনি আগেই খবর পেয়েছেন যে ওরা আসবে। খবর পেয়ে খনি থেকে ইয়টে আনিয়ে রেখেছেন এই তিনজনকে। রডনির শেখানো বুলিই আওড়াচ্ছে তারা, হয় ভয়ে নয়তো ঘুষ খেয়ে। রডনি বুমারকে ও বলল, 'আপনার বাছাই করা লোক কি বলল তার কোন গুরুত্ব নেই। আমি কয়েকজনের একটা তালিকা দিই, তাদেরকে ডাকুন।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রডনি রাজি হলেন। 'দিন।'

তিনজনের তালিকা দিল রানা, 'শেখ সজীব হায়দার, মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। শিপলু আহমেদ, জিওলজিস্ট। সানাউল্লাহ, সাধারণ শ্রমিক।'

রডনি বুমার কাঁধ ঝাঁকালেন। 'দুঃখিত। কেউই তারা নিমবাসে নেই। যেখানে আছে সেখান থেকে তাদেরকে নিমবাসে আনতে হলে অন্তত দু'হপ্তা সময় দিতে হবে। অবশ্য কাজ ফেলে তারা যদি আসতে রাজি হয়, তবেই আর কি। প্রতি ঘণ্টায় বাংলাদেশী মুদ্রায় পাঁচশো থেকে দেড় হাজার টাকা রোজগার করে ওরা, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে হলে আসা-যাওয়ায় কম করেও আটচল্লিশটা কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে ওদের। আমার তো মনে হয় কেউই ওরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হবে না।'

'ওরা যেখানে কাজ করছে সেখানে আমাদেরকে যেতে দিলে ক্ষতি কি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন রডনি। 'সম্ভব নয়। আমরা বিজনেস সিক্রেট ফাঁস হবার ঝুঁকি কেন নেব? আপনাদের অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে, এবার আপনারা বিদায় হোন।'

কোন রকম সুবিধে করতে না পেরে নুমার রিসার্চ শিপে ফিরে এসে ঢাকায়, বিসিআই হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করল রানা। রাহাত খান ওকে টেলিফোনে জানালেন, ও যেন সর্বক্ষণ নুমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, লক্ষ রাখতে হবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সামুদ্রিক প্রাণীর যে মড়ক লেগেছে সেটা ভারত মহাসাগরেও ছড়িয়ে পড়ে কিনা। রানাকে তিনি আরও একটা দায়িত্ব দিলেন, এটাই সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ—রডনি বুমারের সব ক'টা অর্থাৎ ছ'টা দ্বীপের ওপরই কড়া নজর রাখতে হবে ওকে।

নুমার কপ্টার নিয়ে সেই কাজই করছিল রানা। অস্ট্রেলিয়ান দ্বীপ নরফোক-এর কাছাকাছি নিমবাস, ওই নিমবাস দ্বীপটাকে দূর থেকে আরেকবার চক্কর দিয়ে কোর দ্বীপটা আকাশ থেকে দেখতে যাচ্ছিল ও। কোর-ও রডনি বুমারের দ্বীপ, ওখানেও তাঁর হীরের খনি আছে। দ্বীপটা ইস্টার আইল্যান্ডের পাশে। ইস্টার আইল্যান্ডের মালিক চিলি সরকার। কোরও তাই, তবে রডনি ওটা চিলি সরকারের কাছ থেকে নব্বুই বছরের জন্যে লীজ নিয়েছেন।

কোর-এ যাবার পথেই রুরালিতে রাবার বোট দেখতে পেয়ে নিচে নামে রানা, উদ্ধার করে মলি বুমার আর উনিশজন বয়ঃবৃদ্ধ ট্যুরিস্টকে।

নুমার রিসার্চ শিপ সী লায়নের নেভিগেশন ব্রিজে বসে অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলার স্যাটেলাইট ইমেজ পরীক্ষা করছে রানা। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে ও, ক্লান্তি বোধ করায় হেলান দিল চেয়ারটায়। টিনটেড গ্লাস ভেদ করে বাইরে চলে গেল দৃষ্টি, বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করা মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মধ্যে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। রাত এখন এগারোটা হলেও, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো পাওয়া যাচ্ছে।

রুরালি থেকে উদ্ধার করে আনা ট্যুরিস্টদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই তারা ঘুমাচ্ছে। জাহাজের হসপিটাল থেকে দুই ডেক ওপরে বায়োল্যাবরেটরিতে রুরালি থেকে আনা পেঙ্গুইন আর সীলের পোস্ট মর্টেম করা হচ্ছে, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মলিও আছে সেখানে। দু'জন ট্যুরিস্ট আর মর্নিং রোজ-এর ক্রুর লাশ বরফে মুড়ে রাখা হয়েছে, সময়মত প্রফেশনাল প্যাথলজিস্টের হাতে তুলে দেয়া হবে।

সী লায়নের জোড়া বো-র দিকে তাকাল রানা। এটাই প্রথম একটা সায়েন্টেফিক ভেসেল, ওশেনোগ্রাফারদের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে মেরিন এঞ্জিনিয়াররা কমপিউটরকে দিয়ে ডিজাইন করিয়েছেন। পানি থেকে অনেক উঁচুতে ভেসে রয়েছে জাহাজটা, সমান্তরাল একজোড়া খোল-এর ওপর, ওই খোল দুটোয় রয়েছে বড় আকৃতির এঞ্জিন আর অক্সিলারি মেশিনগুলো। ক্রু আর সমুদ্রবিজ্ঞানীদের কোয়ার্টার দেখলে মনে হবে ক্রুজ শিপের বিলাসবহুল সেলুন। চেহারায় মসৃণ, পিচ্ছিল আর ভঙ্গুর একটা ভাব থাকলেও, সী লায়নকে সবাই ওঅর্কহর্স বলে জানে; তৈরি করা হয়েছে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে বৈরি ও উত্তাল ঢেউ ভেঙে সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে যাবার উপযোগী কোরে। সী লায়ন চার মিটার পুরু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে।

এলিভেটর থেকে নেভিগেশনাল ব্রিজে বেরিয়ে এল ববি মুরল্যান্ড, সঙ্গে ক্যাপটেন হেনডারসন। নেভিগেশন ব্রিজের ওপরে অবজারভেশন উইং, সেখান থেকে পনেরো ডেক নিচে এঞ্জিন রূম পর্যন্ত ওঠা-নামা করে এই এলিভেটর। 'স্যাটেলাইট ক্যামেরায় মর্নিং রোজের কোন ছবি পেলে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'বরফ সমস্ত ইমেজ ঝাপসা করে রেখেছে,' বলল রানা।

'রেডিও কনট্যাক্ট?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোন সাড়া নেই। আর্জেন্টিনিয়ান রেডিও চুপ করে আছে।'

ক্যাপটেন হেনডারসন বললেন, 'সত্তুর জন ট্যুরিস্ট নিয়ে একটা ক্রুজ শিপ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। এক হতে পারে, রহস্যময় অসুস্থতা এত দ্রুত আঘাত হানে, রেডিওতে সাহায্য চাওয়ার সময়ই তারা পায়নি—হয়তো সবাই মারা গেছে।'

'মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিছু জানতে পেরেছেন?' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'মলির সঙ্গে তুমি কথা বলেছ?'

'প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে প্রাণীগুলোর খুলির গোড়ায় শিরা ছিঁড়ে গেছে, ফলে রক্তক্ষরণ হয়েছে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'খুবই রহস্যময় বলতে হবে। জীবাণু দায়ী হলে কি এভাবে শিরা ছিঁড়ে যাবে?' চিন্তিত দেখাল রানাকে।

'জাহাজটাকে কেউ হাইজ্যাক করে নিয়ে যায়নি তো?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

রানা বলল, 'ধরা যাক প্লেগ যখন আঘাত হানল তখন জাহাজটা খোলা সাগর দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছিল। সবাই মারা যাওয়ায় জাহাজের হাল ধরার যদি কেউ না থাকে, ওটা এতক্ষণে কোথায় পৌঁচেছে ভাবা যায়? সম্ভবত ডেঞ্জার আইল্যান্ডগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে।' ক্যাপটেনের দিকে তাকাল ও। 'না, হাইজ্যাক করা হয়ে থাকলে এতক্ষণ মুক্তিপণ চাওয়া হত।'

'তাহলে তো,' হেনডারসন বললেন, 'বিশাল একটা এলাকা জুড়ে তল্লাশী চালাতে হয়।'

'ববিকে নিয়ে সেই কাজেই যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'রুরালিতে আর্জেন্টিনার স্টেশনটাও দেখে আসব।'

'কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা করছেনটা কি?' জানতে চাইল হেনডারসন। 'মহামারী বা দুর্দৈবের কারণটা ব্যাখা করতে পারছেন না কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হঠাৎ সাগরের টেমপারেচার বাড়লে সামুদ্রিক প্রাণী মারা যেতে পারে। পরিবেশ দূষণেও মারা যেতে পারে। কিন্তু এখানে ও-সবের কোন লক্ষণ নেই।'

'তাহলে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার ধারণা, এ-ধরনের সমস্যায় আগে কখনও পড়িনি আমরা। এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে টক্সিক পলিউশনের কোন উৎস নেই। তাছাড়া, কোন রেডিওঅ্যাকটিভ বা কেমিক্যাল ওয়েস্ট এত অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যায় এত বেশি পেঙ্গুইন মেরে ফেলতে পারে না। ভুলে গেলে চলবে না, পাখিগুলো পানি থেকে যথেষ্ট দূরে ছিল।'

'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো দেখছি কপালে খারাবি আছে,' বললেন ক্যাপটেন। 'মড়কের কারণই যেখানে অজ্ঞাত, কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব?'

'প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আপনার নয়, বিজ্ঞানীদের,' হেসে উঠে বলল রানা। 'তবে তাদেরকে তথ্য এনে দিতে হবে। আমি আর ববি সেই কাজেই যাচ্ছি। আপনি বরং ট্যুরিস্টদের দলটাকে সিডনিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

ভোর চারটের সময় রওনা হলো ওরা। তাপমাত্রা আগের চেয়ে একটু কম, সাগর শান্ত, আকাশ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ নীল। কন্ট্রোলে রয়েছে রানা, রুরালির হোয়েলিং স্টেশনের দিকে যাচ্ছে ওরা। ওদিকটা হয়ে মর্নিং রোজকে খোঁজার জন্যে উত্তর দিকে যাবে।

উঁচু পাথুরে সৈকতে পেঙ্গুইনদের লাশ দেখে রানার মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল। লাশগুলো পিছনে ফেলে এল 'কপ্টার, নিচে পানির রেখা অনুসরণ করছে, উইন্ডস্ক্রীনের বাইরে তাকিয়ে মর্নিং রোজের ল্যান্ডিং সাইট খুঁজছে ও। মুরল্যান্ড তার পাশের জানালা দিয়ে খোলা সাগরে চোখ বুলাচ্ছে, মাঝে মধ্যে কোলের ওপর ফেলা চার্টে দাগ কাটছে। খোলা সাগরে হাজার হাজার হিমশৈল–আকারে কোনটা ছোটখাট শহর, বেশিরভাগই তিনশো মিটার পুরু, পানির ওপর তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, রঙ কোথাও নীল বা সবুজ, অথবা একই রঙ বিভিন্ন মাত্রায় হালকা বা গাঢ়।

'এই বার্গগুলোর কোন একটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মর্নিং রোজ ডুবে গিয়ে থাকতে পারে,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল মুরল্যান্ড। 'তোমার দিকটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'নাহ্।'

'হোয়েলিং স্টেশন থেকে বিশ কিলোমিটার চলে এসেছি, এখনও ক্রুজ শিপের দেখা নেই। অথচ মলি বলছেন, ট্যুরিস্টদের দ্বিতীয় দলটাকে সীল কলোনি দেখানোর জন্যে রওনা হয়েছিল মর্নিং রোজ।'

'সীল আছে,' ইঙ্গিতে নিচেটা দেখাল রানা। 'সব মিলিয়ে প্রায় আটশোর মত হবে। একটাও বেঁচে নেই।'

সীটের ওপর উঁচু হয়ে পোর্ট উইন্ডো দিয়ে নিচে তাকাল মুরল্যান্ড। তটরেখা ধরে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত পড়ে আছে এলিফেন্ট সীলের মৃতদেহ। যতদূর দৃষ্টি যায়, মানুষজনের কোন চিহ্ন নেই। 'পরবর্তী গন্তব্য আর্জেন্টিনিয়ান রিসার্চ স্টেশন।'

পাহাড়ের একটা কাঁধ পেরিয়ে আসতেই স্টেশনটাকে দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছ'টা বিল্ডিং, গম্বুজ আকৃতির ছাদ নিরেট ইস্পাতের কাঠামোর ওপর ঝুলে আছে। ছাদের ওপর সারি সারি অ্যান্টেনা, গাছপালার শাখা-প্রশাখার মত দেখতে। স্টেশনের কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। এক জোড়া স্নোমোবাইল দেখা গেল, ওগুলোর কাছাকাছি 'কপ্টার নামাল রানা। কোন বিল্ডিঙের ভেন্টিলেটর থেকে এতটুকু ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। নির্জন, ভৌতিক পরিবেশ। স্টেশনে যদি কোন মানুষজন থাকেও, কেউ তারা বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। 'কপ্টার থেকে নেমে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে মাঝখানের বিল্ডিংটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার সামনে বরফ জমে আছে, পরিষ্কার করতে বিশ মিনিট লাগল। কবাট খোলার পর ভেতরে ঢুকল রানা, পিছনে মুরল্যান্ড। ছোট একটা টানেল পেরিয়ে

এসে একটা ঘরে ঢুকল দু'জন। পাশাপাশি দুটো কামরা, রিক্রিয়েশন ও ডাইনিং রুম। দেয়ালে ফিট করা থার্মোমিটারের দিকে এগোল মুরল্যান্ড। 'তাপমাত্রা এখানে ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে,' বিড়বিড় করল সে। তারমানে এখানে কেউ হিটিং সিস্টেম চালু করেনি।

প্রথম লাশটা পাওয়া গেল ডাইনিং রুমে। দেখে মনে হবে না যে মারা গেছে। মেঝের দিকে ঝুঁকে আছে, এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে টেবিলের একটা কোণ, হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ড আর রানার দিকে, যেন জানত ওরা তাকে দেখতে আসবে। প্রচুর বমি করেছে, নোংরা হয়ে আছে দাড়ি। চেহারায় শুধু ব্যথা নয়, নগ্ন আতঙ্ক এত স্পষ্ট যে ওদের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। ত্রিশ সেকেন্ড পর পাশের কামরা থেকে মুরল্যান্ড বলল, 'এখানে আরও দু'জন।'

শুধু মাঝখানের বিল্ডিঙে নয়, বাকি সবগুলো বিল্ডিঙে আর্জেন্টিনিয়ান বিজ্ঞানীদের লাশ পাওয়া গেল। চেহারা দেখে বোঝা যায় তীব্র ব্যথা পেয়ে মারা গেছে সবাই, মারা যাবার আগে বমি করেছে। লাশগুলোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল, নাগালের মধ্যে যা পেয়েছে তা-ই ধরে সিধে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। রানা নিশ্চিত, কোন প্লেগ বা ফুড পয়জনিং এত দ্রুত মানুষকে মেরে ফেলতে পারে না।

সব মিলিয়ে লাশ পাওয়া গেল সতেরোটা। সী লায়নের ক্যাপটেন হেনডারসনের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল রানা। রিপোর্ট পাবার পর রানাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মৃত্যুর কারণ কিছু বুঝতে পারছেন?'

'না, প্যাথোলজিস্টের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'আপনি আর্জেন্টিনিয়ান কর্তৃপক্ষকে জানান, স্টেশনের একজনও বেঁচে নেই। মলি বুমার আর থমাস কীলকে বলুন যে সবাই ওরা বমি করেছে।'

'ওরা বলছেন, মৃত্যুর কারণ ভাইরাল ইনফেকশন বা কেমিক্যাল কনটামিনেশন হতে পারে না,' বললেন হেনডারসন, তারপর জানতে চাইলেন, 'ট্যুরিস্টদের দ্বিতীয় পার্টির কোন সন্ধান পেলেন?'

'না।'

'অদ্ভুত।'

রানা বলল, 'এখানে আসার পথে আমরা একটা সীল কলোনি দেখে এসেছি, সবগুলো মারা গেছে। আপনার কোন ধারণা আছে এই দুর্বিপাক কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে?'

'আপনাদের দক্ষিণে দুশো কিলোমিটার দূরে জেশন পেনিনসুলায় একটা মার্কিন ক্রুজ শিপ রয়েছে,' বললেন হেনডারসন। 'ওদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছি। ওদিকে কিছুই ঘটেনি। তবে ওয়েডেল সী-তে ডলফিনের লাশ দেখেছি আমরা। এভাবে হিসাব করলে, ডেথ সার্কেল ধরতে পারি ডায়ামিটারে নব্বুই কিলোমিটার, সেন্ট্রাল পয়েন্ট রুরালি আইল্যান্ডকে ধরে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আমরা এখন মর্নিং রোজের খোঁজে আবার আকাশে উঠছি।'

আকাশে ওঠার পর রানা বলল, 'ববি, এসো একটা আনুমানিক হিসাব করি।'

'করি।'

'কুরালির উত্তর দিকে যাচ্ছিল মর্নিং রোজ, গন্তব্য-সীল কলোনি,' বলল রানা। 'সৈকতের সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে এগোচ্ছে, এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ল সবাই। কেউ বাঁচল না। এখন জাহাজটার কি গতি হবে?'

'এঞ্জিন বন্ধ করার নেই কেউ, কাজেই ওটা যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটবে, যতক্ষণ না কোন আইসবার্গে বা কোন দ্বীপে ধাক্কা খায়।'

'কোর্সটা ছিল উত্তরমুখী,' বলল রানা। 'আইসবার্গে ধাক্কা না খেলে কোথায় গিয়ে বাধা পাবে ওটা?'

চার্টের ওপর চোখ বুলাল মুরল্যান্ড। 'বাধা না পেলে...বাধা না পেলে...অনেকটা দূরে ছোট তিনটে দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি...'

'কি নাম?'

'ডেঞ্জার আইল্যান্ডস।'

'আমার হিসেবও তাই বলে।' হাসছে রানা। 'কাজেই প্রথমে ওদিকটাই আমাদের দেখা উচিত।'

'উচিত।'

ড্যান্ডি আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। ওদের সরাসরি সামনে মুডি পয়েন্ট কাস্তের মত বাঁকা হয়ে ডেঞ্জার আইল্যান্ডস-এর দিকে এগিয়েছে। এদিকের পানিতে অসংখ্য জমাট বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, কোন কোনটা এত বড় যে স্রোতের টানেও নড়ছে না।

খানিক পর ডেঞ্জার আইল্যান্ডস-এর তিনটে চূড়া দেখা গেল দিগন্তে। দ্বীপ না বলে পাহাড় বলাই উচিত। প্রথম দুটোকে ঘিরে চক্কর দিল ওরা, মর্নিং রোজের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। শেষ দ্বীপটাও দুর্গম, তীর এত খাড়া যে সেখানে কোন জাহাজ ভিড়তে পারবে না। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, কাজেই রানার গম্ভীর নির্দেশে বার দুয়েক চক্কর দেয়ার পর মুরল্যান্ড 'কপ্টার ছোটাল উত্তর দিকে।

বন্ধুকে খোঁচা মারতে ছাড়ল না সে। 'তাহলে তোমার অনুমানও ভুল হয়, কি বলো?'

রানা কথা না বলে আরও গম্ভীর হয়ে থাকল।

'কুরালি থেকে এত দূরে এসেও যখন মর্নিং রোজকে পাচ্ছি না,' আবার বলল মুরল্যান্ড, 'তাহলে আমরা ফিরে যাচ্ছি না কেন?'

'এলামই যখন, আরও একটু দেখে যাই,' বলল রানা।

তিন মিনিট চুপচাপ 'কপ্টার চালাল মুরল্যান্ড। নিচে আর চারপাশে ছোটবড় বরফের স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। সামনে একটা বড় হিমশৈল, সেটার ভাঁজে রঙিন কি যেন একটা আটকে আছে, লক্ষ করে ভুরু কোঁচকাল সে।

হিমশৈলর একটা দিক ক্রমশ খাড়া হয়ে ওপরে উঠেছে। ঢালের নিচে, পানিতে ভাসছে একটা জলযান। হিমশৈলটা আকারে বিশাল, মফস্বল শহরের মত, দূর থেকে জলযানটাকে পরিষ্কার চেনা গেল না। কাছাকাছি আসার পর আড়চোখে রানার দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। দু'জনেই এখন জাহাজটাকে চিনতে

পারছে। মর্নিং রোজই, তবে পানিতে ভাসছে না–ঢালু আইসবার্গের ওপর উঠে পড়েছে।

'আমারই ভুল, নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়ো,' রানাকে বলল মুরল্যান্ড। 'তোমার অনুমান হানড্রেড পার্সেন্ট না হলেও, নাইনটি-নাইন পার্সেন্ট কারেক্ট।'

কপ্টার নিয়ে মর্নিং রোজের খুব কাছে চলে এল ওরা। 'ডেকে লাশ,' বিড়বিড় করল রানা।

ব্রিজ ডেকে কয়েকজন লোক পড়ে রয়েছে। স্টার্ন-এর কাছে সানডেকেও কয়েকজনকে দেখা গেল। গ্যাঙওয়ের সঙ্গে আটকানো জোডিয়াক রাবার বোটে দেখা গেল দু'জনকে। 'সমস্যা,' বলল রানা। 'ডেক খানিকটা কাত হয়ে রয়েছে, ওখানে তুমি ল্যান্ড করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, তোমাকে মই বেয়ে নামতে হবে, দোস্ত।'

কপ্টার থেকে মই বেয়েও সরাসরি মর্নিং রোজে নামা সম্ভব হলো না, মইটার শেষ প্রান্ত থেকে লাফ দিয়ে জাহাজটার সানডেকের খোলা সুইমিং পুলে পড়ল রানা। পুলটা মাত্র দু'মিটার গভীর। থারমাল আন্ডারঅয়্যার পরে আছে ও, তার ওপর ডাইভারের ড্রাই সুট, পোলার এলাকার পানিতে পরার জন্যে বিশেষভাবে ইনসুলেটেড। মাথায় হেলমেট, তাতে রেডিওর হেডসেট ফিট করা। পুল থেকে উঠে মুরল্যান্ডকে ও জানাল, 'নিরাপদেই আছি।'

ডেক ধরে কম্প্যানিয়নওয়েতে চলে এল রানা। ব্রিজ মাত্র এক ডেক ওপরে। দরজা খুলে হুইলহাউসে ঢুকল ও। জাহাজের একজন অফিসার ডেকের ওপর পড়ে আছে, বেঁচে নেই; চার্ট টেবিলের একটা পায়া এখনও আঁকড়ে ধরে আছে। স্টারবোর্ড উইং-এ কেউ নেই। তবে পোর্ট উইং-এ জাহাজের আরও দু'জন অফিসারের লাশ পাওয়া গেল–ব্যথা আর আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। বরফ মোড়া আরেকটা লাশ পেল রানা জাহাজের এক্সটেরিয়র কন্ট্রোল প্যানেলে, ক্যাপ দেখে বোঝা গেল ইনিই ক্যাপটেন ছিলেন।

হঠাৎ জাহাজটা দুলে উঠল বলে মনে হতেই ছুটল রানা, কম্প্যানিয়নওয়েতে বেরিয়ে এল। খোলের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে বরফ, ফলে আওয়াজ আর কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে। রেডিওর সুইচ অন করে আকাশে তাকাল ও। মুরল্যান্ডকে বলল, 'বরফ গলতে শুরু করায় পানিতে নামছে মর্নিং রোজ। আকাশ থেকে দেখে কি মনে হচ্ছে বলো দেখি। আমি কি এখানে নিরাপদ?'

কপ্টার নিয়ে খানিকটা দূর সরে গিয়েছিল মুরল্যান্ড, আবার কাছাকাছি ফিরে এসে হিমশৈলটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার। 'ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে জাহাজটা কোথাও ভাঙেনি। যে গতিতে হড়কে নামছে, তাতে বিপদ হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। তবে যতক্ষণ মা পুরোপুরি পানিতে নামে, তুমি ভাই খোলা ডেকেই থাকো। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রিয় বন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর একটা সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।'

বরফ থেকে জাহাজটার হড়কে নামার প্রয়োজন হলো না, জাহাজের নিচে নিরেট স্তরটা ক্ষয়ে পাতলা হয়ে যাওয়ায় ভেঙে গেল, দু'পাশে সরে গিয়ে পানিতে

ভাসার সুযোগ করে দিল মর্নিং রোজকে।

'প্রকৃতি যেন এই অবমুক্তির সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিল, শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু বাকি রেখেছিল তোমার অপেক্ষায়,' বলল মুরল্যান্ড।

রানা জানতে চাইল, 'তোমার ফুয়েলের কি অবস্থা হে?'

'সী লায়নে ফিরে যেতে পারব।'

'তাহলে রওনা হয়ে যাও।'

'কিন্তু তুমি? তুমি কি করবে?'

'ক্যাপটেন হেনডারসনকে আমার পজিশন দিয়ে বলবে উনি যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন,' বলল রানা। 'ওঁর দেয়া পজিশনে দেখা করব আমি।'

'মর্নিং রোজকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'রানা, তোমার মাথায় সত্যি আইডিয়াটা খেলেনি, বলতে চাও?' মুরল্যান্ড যেন সাংঘাতিক বিস্মিত।

'আইডিয়া?'

'পরিত্যক্ত একটা জাহাজকে কাছাকাছি বন্দরে পৌছে দিতে পারলে ইন্সুরেন্স আন্ডাররাইটারের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার হাতিয়ে নিতে পারো।'

হেসে উঠল রানা। 'জানতে পারলে বস্ আমার পিঠের ছাল তুলবেন।'

'আর আমার বস্ আমার চাকরিই নট করে দেবেন। গেলাম তাহলে।'

হেলমেট খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নুমার 'কপ্টারটাকে চলে যেতে দেখল রানা। খালি জাহাজে হঠাৎ খুব একা লাগল নিজেকে ওর। কম্প্যানিয়নওয়েতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল নেই, হঠাৎ ছম ছম করে উঠল গা। কান পাতল, যেন কোন আওয়াজ হবে বলে আশা করছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভয় ভয় ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল, দরজা দিয়ে আবার ঢুকল হুইলহাউসে। এঞ্জিন চালু করার পর সী লায়নের এগোনোর পথটা চিহ্নিত করল চার্টে, সেই পথের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে কোর্স সেট করল। নেভিগেশন কমপিউটরে কোঅর্ডিনেটস প্রোগ্রাম করল, চালু করে দিল জাহাজের অটো কন্ট্রোল সিস্টেম। জাহাজ এখন নিজে নিজেই চলবে, সম্ভাব্য বিপদ এড়িয়ে। হুইলহাউস থেকে আবার বেরিয়ে পড়ল রানা।

আউটার ডেকগুলোয় বেশ কয়েকটা লাশ ক্রুদের, কাজ করার সময় মারা গেছে। দু'জন বাল্কহেডে রঙ করছিল, বাকিরা কাজ করছিল লাইফবোটে। আটজন আরোহীর লাশ দেখে বোঝা গেল ডেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে সাগর বা সৈকত দেখার সময় রহস্যময় অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। প্যাসেজওয়ে হয়ে জাহাজের হসপিটালে চলে এল রানা। ভেতরটা খালি, খালি হেলথ ক্লাবও। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেয়ে বোট ডেকে নামল ও, ছ'টা স্যুইট রয়েছে এখানে। একটা ছাড়া বাকি সবগুলো খালি। বয়স্কা এক মহিলা পড়ে আছেন, দেখে মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছেন। আঙুল দিয়ে তাঁর ঘাড় স্পর্শ করল ও। বরফের মত ঠাণ্ডা।

সেলুন ডেকে যাচ্ছে রানা, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল। ওর কি শুনতে ভুল হয়েছে? কিন্তু শব্দটা আবার হলো না? জাহাজে কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে!

গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল, ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নামল শিরদাঁড়া বেয়ে। তারপর হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই আবার থেমে গেল আওয়াজটা।

ড্রাই সুটের ভেতর ঘামছে রানা। দু'মিনিট নড়ল না ও। তারপর সুটটা খুলে ফেলল গা থেকে। গম্ভীর একটু হেসে ভাবল, এখানে এমন কেউ নেই যে শুধু থারমাল আন্ডারওয়্যার পরে থাকায় মাইন্ড করবে।

কিচেনে ঢুকল রানা। আভন আর টেবিলের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে শেফ আর ওয়েটারদের লাশ, একটার ওপর একটা পড়ায় স্তূপ তৈরি হয়েছে। জায়গাটাকে রক্তবিহীন কসাইখানার মত দেখতে লাগছে। অসুস্থ বোধ করল ঘুরে কিচেন এলিভেটরে চড়ল, ডাইনিং সেলুনে উঠবে।

ডাইনিং সেলুনে টেবিল সাজানো হয়েছে, তবে খাবার পরিবেশন করা হয়নি। সিলভারওয়্যার সবই জাহাজের দোলায় বা ঝাঁকি খাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে নিচে, তবে পরিচ্ছন্ন টেবিলক্লথ জায়গামতই আছে। মৃত্যু সম্ভবত এখানে হানা দিয়েছিল লাঞ্চ পরিবেশিত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে। মেন্যুটা তুলে পরীক্ষা করল রানা–সী বাস, অ্যান্টার্কটিক আইস ফিশ, টুথফিশ আর ভীল স্টেক। মেন্যুটা টেবিলে রেখে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে, বেমানান কিছু একটা চোখের কোণে ধরা পড়ল। একজন ওয়েটারের লাশ টপকে পিকচার উইন্ডোর পাশে ফেলা টেবিলটার কাছে চলে এল।

এখানে কেউ একজন খাওয়াদাওয়া করেছে। ডিশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, ওগুলোয় এখনও অবশিষ্ট কিছু খাবার পড়ে রয়েছে। মাখন লাগানো এক পাইস পাউরুটি, সেদ্ধ করা আধখানা ডিম, কাপের তলায় পড়ে থাকা খানিকটা আইস টী। দেখে মনে হচ্ছে এখুনি কেউ লাঞ্চ শেষ করে ডেকে হাঁটতে বেরিয়েছে। মৃত্যু আঘাত হানার পর কেউ এখানে খেয়েছে, এই চিন্তাটা মাথায় এলেও সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল রানা।

না, তা কি করে হয়।

কিন্তু যতই যুক্তি দিয়ে সম্ভব নয় বলে ভাবুক, টেবিলে পড়ে থাকা খাবারগুলো দেখে মনের ভেতর ভয়ের শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে। হাঁটার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে বারবার তাকাল রানা। ডাইনিং সেলুন থেকে বেরিয়ে গিফট শপকে পাশ কাটাল, ঢুকে পড়ল জাহাজের লাউঞ্জে।

ছোট একটা কাঠের ড্যান্স ফ্লোরের পাশে দেখা গেল পিয়ানোটাকে। প্রতি সেট চেয়ার-টেবিলের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব। ককটেল ওয়েট্রেস ট্রে ভর্তি ড্রিঙ্কস নিয়ে যাচ্ছিল, এই সময় পড়ে গেছে; তার পাশেই পড়েছে আটজন নারী-পুরুষের একটা গ্রুপ, প্রত্যেকেরই বয়েস ষাটের ওপর–সবাই তাঁরা বড় একটা টেবিলে বসেছিলেন, এখন এলোমেলো ভঙ্গিতে কার্পেটে পড়ে আছেন। কেউ কেউ সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে আলিঙ্গন করে আছেন, ওদেরকে স্বামী-স্ত্রী বলে ধরে নেয়া চলে। সেদিকে তাকিয়ে কাতর হলো রানা। সেই সঙ্গে অসহায় বোধ করল, এই মর্মান্তিক পরিণতির কারণ জানা না থাকায়।

তারপর আরেকটা লাশ দেখতে পেল। একটা মেয়ে, লাউঞ্জের এক কোণে কার্পেটের ওপর বসে আছে। মেয়েটার চিবুক ভাঁজ করা জোড়া হাঁটুর ওপর,

মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে। লেদার জ্যাকেট আর উল প্যাকস পরে আছে। চেহারায় কোন বিকৃতি নেই, বমিও করেনি।

হার্টবিট বেড়ে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ; ভয়ে ভয়ে সামনে এগোল রানা। কাছে এসে একটা আঙুল ছোঁয়াল মেয়েটার ঘাড়ে। গা গরম দেখে ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিতে কেঁপে উঠল চোখের পাতা, তারপর খুলে গেল।

প্রথমে ঘোর লাগা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা, যেন পরিবেশ সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। তারপরই বিস্ফারিত হলো চোখ, ঝট করে জড়িয়ে ধরল রানাকে, হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করে বলল, 'আপনিও বেঁচে আছেন!'

'ওহ্ গড! আই য়্যাম গ্রেটফুল!' হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

ঝট করে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। 'না, না, এ সত্যি হতে পারে না। আপনারা সবাই মারা গেছেন।'

'আমাকে ভয় পাবেন না, প্লীজ,' নরম সুরে বলল রানা।

অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। দৃষ্টিতে চকচকে একটা ভাব, বেঘোর বা মাতালের মত লাগছে। চেহারায় কোন খুঁত নেই, তবে চোয়াল আর কপাল একটু বেশি চওড়া, নাকটাও একটু বড়, ফলে হঠাৎ তাকালে পুরুষ বলে সন্দেহ হতে পারে। তারপর রানা খেয়াল করল, মেয়েটার দৈহিক গঠনও পুরুষালি–দাঁড়ালে সম্ভবত পাঁচ ফুট দশ বা এগারো ইঞ্চি লম্বা হবে, হাতের হাড়গুলো চওড়া। মাথায় লালচে তামার মত চুল; এত ছোট করে কাটা যে ঠিক মত কাঁধও ছোঁয়নি। জ্যাকেটের হাতা নেই, নগ্ন বাহুগুলোর পেশী খানিকটা ফুলে আছে।

হঠাৎ মেয়েটা জানতে চাইল, 'আপনার এই অবস্থা কেন? পুরোপুরি কাপড় পরেননি।'

'ক্ষমা করবেন,' বলল রানা। 'তবে আমার প্রসঙ্গ থাক। আপনার কথা বলুন। কে আপনি? সবাই মারা গেল, আপনি কিভাবে বেঁচে আছেন?'

কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল মেয়েটা, তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল রানা। তারপর কোমরটা জড়িয়ে ধরে দাঁড় করাল তাকে, একটা লেদার চেয়ারে বসিয়ে দিল। বার-এর দিকে এগোল রানা, জানে বারটেন্ডারের লাশ দেখতে পাবে। ঠিকই দেখতে পেল। লাশটা টপকে আয়না লাগানো শেলফ থেকে হুইস্কির একটা বোতল নামাল ও, গ্লাসে খানিকটা ঢেলে ফিরে এল আবার মেয়েটার কাছে। 'এটুকু খেয়ে নিন।'

'আমি ড্রিঙ্ক করি না,' অস্পষ্ট সুরে আপত্তি জানাল মেয়েটা।

'ওষুধ বলে মনে করুন। মাত্র দু'একটা ঢোক।'

খানিক পর ঠোঁট মুছে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি পাউলা, পাউলা পার্কার।'

'মর্নিং রোজের একজন প্যাসেঞ্জার?'

মাথা নাড়ল পাউলা। 'আমি একজন এন্টারটেইনার। লাউঞ্জে পিয়ানো বাজাই আর গান করি।'

'পিয়ানোর শব্দ শুনেই তো এদিকে এলাম আমি···'

'শক···রিয়্যাকশন···কি করছিলাম খেয়াল ছিল না। কেউ বেঁচে নেই দেখে ভাবছিলাম এরপর আমার পালা। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি বেঁচে আছি।'

'ঘটনাটা যখন ঘটল, কোথায় ছিলেন আপনি?'

কাছাকাছি পড়ে থাকা চার জোড়া দম্পতির দিকে তাকাল পাউলা। 'লাল স্কার্ট পরা ভদ্রমহিলা আর টি-শার্ট পরা ভদ্রলোক বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পঞ্চাশতম বিবাহ বার্ষিকী পালন করছিলেন। আগের রাতে একটা কেক বানানো হয়। বারটেন্ডার জনসন আর ওয়েট্রেস মারিয়া কিচেন থেকে ক্রিস্টাল বোল নিয়ে আসতে যায়, আর আমি যাই স্টোরেজ ফ্রিজার থেকে আইসক্রীম কেক আনার জন্যে···'

'আপনি ফ্রিজারের ভেতর ছিলেন?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল পাউলা।

'দরজাটা বন্ধ করে ছিলেন কিনা মনে আছে?'

'ওটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।'

'তারপর আপনি কি করলেন?'

চোখ বুজে চোখের পাতা কুঁচকে রাখল পাউলা, তারপর আঙুল দিয়ে কপালের পাশটা টিপে ধরল। 'ওখানে মাত্র কয়েক মিনিট ছিলাম। বেরিয়ে এসে দেখি জাহাজের সবাই মারা গেছে।'

'ঠিক কতক্ষণ ফ্রিজারে ছিলেন আপনি?' নরম সুরে প্রশ্ন করল রানা।

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর পাউলা জানতে চাইল, 'আপনি কে? আমাকে এভাবে জেরা করছেন কেন?'

'আমি এখানকার ঘটনা তদন্ত করছি,' বলল রানা। তারপর নিজের পরিচয় দিল ও। 'নুমায় আছি, প্রজেক্ট ডিরেক্টর। আমি যে-সব প্রশ্ন করছি সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'ফ্রিজারে কতক্ষণ ছিলাম? ঠিক বলতে পারব না। কেকটা একটা ট্রেতে ছিল, ট্রের চারপাশে বরফ জমে যাওয়ায় ছাড়াতে পারছিলাম না।'

'আপনার ভাগ্য নেহাতই ভাল,' বলল রানা। 'ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকার একটা ক্লাসিক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। আর মাত্র দু'মিনিট আগে যদি ফ্রিজার থেকে বেরুতেন, বাকি সবার মত আপনিও মারা পড়তেন। এ-ও আপনার ভাগ্য যে এত তাড়াতাড়ি মর্নিং রোজকে খুঁজে পেয়েছি আমি। ভাল কথা, জাহাজের এঞ্জিন কি বন্ধ ছিল, না আপনি বন্ধ করেছেন?'

'আমি বন্ধ করেছি,' বলল পাউলা। 'দু'দিন আগে ক্যাপটেন আমাকে দেখিয়েছিলেন কমপিউটর কিভাবে জাহাজটা চালায়। লাশগুলো দেখার পর প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। শেষবার হুঁশ ফিরতে লক্ষ করলাম এঞ্জিন চলছে, কিন্তু জাহাজ এগোচ্ছে না। তারপর দেখি বরফের গায়ে উঠে পড়েছে বো। হুইলহাউসে ঢুকে কমপিউটরের বোতাম টিপে বন্ধ করে দিই এঞ্জিন।'

'আপনি বুদ্ধিমতী,' বলল রানা।

'আপনারা জানলেন কিভাবে যে মর্নিং রোজ এদিকে চলে এসেছে?' জানতে চাইল পাউলা।

'রুরালি থেকে ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটাকে আমরা উদ্ধার করেছি,' বলল রানা। 'তারপর মর্নিং রোজকে খুঁজতে বেরুই।'

'প্রথম দলের ওরা সবাই বেঁচে আছে?' ব্যাকুল সুরে জানতে চাইল পাউলা। 'ওদের গাইড মলি?'

'দু'জন প্যাসেঞ্জার আর একজন ক্রু মারা গেছে। মলি বুমার ভাল আছেন।'

পাউলাকে খুশি দেখাল, তবে এক সেকেন্ড পর। রানার সন্দেহ হলো, মেয়েটা সম্ভবত অভিনয় করছে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মলি বেঁচে আছে!' পরমুহূর্তে উদ্বিগ্ন হলো সে। 'কিন্তু ঘটনাটা কি? কেন এত লোক মারা গেল?'

'এখনও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তবে কারণটা আন্দাজ করতে পারছি।'

চার

সী লায়নে ফেরার পথে নুমার হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করল রানা। রিসার্চ শিপের ক্যাপটেন হেনডারসনের কাছ থেকে ট্যুরিস্ট আর ক্রুজ শিপ মর্নিং রোজ উদ্ধার পর্বের প্রাথমিক রিপোর্ট আগেই পেয়েছেন তিনি, রানার কাছ থেকে বিশদ জানার সুযোগ পেয়ে খুশি হলেন।

মর্নিং রোজের সর্বমোট নব্বুইজন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে উনিশজন বাদে সবাই মারা গেছে। সব মিলিয়ে ক্রু আর স্টাফ ছিল তেইশ জন, দু'জন বাদে কেউ বাঁচেনি। জাহাজের মালিক অস্ট্রেলিয়ান, ট্যুরিস্টরাও বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ান, কাজেই অস্ট্রেলিয়া সরকার এই অপমৃত্যুর কারণ জানার জন্যে একটা তদন্ত টীম গঠন করেছে। স্যাকার অ্যান্ড স্যাকার মর্নিং রোজের মালিক, তারা নুমার জাহাজ সী লায়নের ক্যাপটেনকে অনুরোধ করেছে আপাতত তিনিই যেন তাদের ক্রুজ শিপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিয়ম অনুসারে জাহাজটা উদ্ধার করার জন্যে মাসুদ রানা বা নুমাকে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়ার প্রস্তাবও পাওয়া গেছে। মর্নিং রোজের লাশগুলো অস্ট্রেলিয়ান সামরিক বাহিনীর একটা জাহাজ এসে সিডনিতে নিয়ে যাবে, ওখানে ওগুলোর পোস্টমর্টেম করা হবে।

রানা জানাল, মর্নিং রোজকে উদ্ধার করা বাবদ কোন ফি নিতে রাজি নয় ও। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন জানালেন, 'আর নুমার তো নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে ওরা যদি আপত্তি না করে, প্রাপ্য টাকাটা সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধে জাতিসংঘ যে গবেষণা সেল গঠন করেছে, তাদেরকে চাঁদা হিসেবে দান করতে পারে।'

তারপর রানা জানতে চাইল, 'নুমার ল্যাব জিনিয়াসরা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে কিনা?'

'ওয়াশিংটনে এরা এখনও দিশেহারা বোধ করছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমি আশা করছি সী লায়নের বায়োলজিস্টরা ভাল কিছু শোনাবে।'

'ওঁরা যদি কিছু জেনেও থাকেন, আমাকে কিছু বলছেন না,' অভিযোগ করল রানা।

'তোমার নিজের কি ধারণা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'পত্রিকাগুলো খুব হৈ-চৈ করছে। ওদেরকে একটা কিছু বলে চুপ করানো দরকার।'

নিজের ধারণা সম্পর্কে একটু আভাস দিল রানা। শুনে বিব্রত বোধ করলেন অ্যাডমিরাল।

'তুমি বোধহয় খুব ক্লান্ত, রানা,' বললেন তিনি। 'ব্রেন ঠিকমত কাজ করছে না। লম্বা একটা ঘুম দাও, তারপর ওয়াশিংটনে মীটিঙে বসব আমরা।'

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাবার পর ক্লান্তি দূর হলো ঠিকই, কিন্তু ঘুমে চোখ দুটো এমন বুজে এল যে কাপড় পরাটাকে উটকো ঝামেলা মনে হলো, কোমরে তোয়ালে জড়ানো অবস্থায় বসে পড়ল বিছানায়, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও বলতে পারবে না রানা।

নক হলো দরজায়। রানার কোন সাড়া নেই। সাড়া না পেয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল মলি, উঁকি দিয়ে অ্যান্টিরুমে তাকাল। 'মি. রানা?' ডাকল সে। 'ভেতরে আছেন আপনি?'

সাড়া না পেয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল ওর, কিন্তু কৌতূহল বাধা দিচ্ছে। হাতে কনিয়্যাকের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস, সবই ববি মুরল্যান্ডের কাছ থেকে ধার করা। এভাবে রানার কেবিনে অনুপ্রবেশ করতে চাওয়ার পিছনে সঙ্গত কারণ আছে, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রানাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চায় মলি।

অ্যান্টিরুমে ঢুকে একটা আয়নার মুখোমুখি হলো ও। নিজেকে তিরস্কার করল, বিনা অনুমতিতে একজন পুরুষমানুষের কামরায় ঢোকা তোমার মত আত্মসচেতন মেয়ের সাজে না।

ভেবে দেখো তুমি কে। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী লোকদের একজন তোমার বাবা। সেই বাবার নৈতিক চরিত্র ভাল নয়, তিনি অন্যায়ভাবে আরও টাকার পাহাড় গড়ার চেষ্টা করেন, এই সব অভিযোগ তুলে সেই জ্ঞান হবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে রেখেছ। আঠারো বছর বয়েসে ফুটবলে এত জোরে কিক করতে পারতে, কলেজে তোমার ক্লাসের আর কোন ছেলের বল অত দূরে যেত না। ক্যানবেরা থেকে পার্থ, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের পুব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত গেছ পায়ে হেঁটে, সঙ্গ দেয়ার জন্যে ছিল শুধু পোষা একটা কুকুর। কাউকে ভয় কর না তুমি, কারও পরোয়া কর না। বাবা তোমাকে কাজ শেখানোর জন্যে স্কুল থেকে একবার ছাড়িয়ে এনেছিল, ঢুকিয়ে দিয়েছিল পারিবারিক খনিতে, সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে পাথর ভাঙার কাজ করতে হয়েছে তোমাকে। কাজটা তুমি শেষ কর, কিন্তু তারপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠ। নিজের জীবনটা কিভাবে কাটাবে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল তোমার, বাবার নির্দেশিত পথে তুমি চলতে চাওনি।

মেলবোর্নে পালিয়ে যায় মলি। পার্ট টাইম চাকরি নেয়, ভর্তি হয় ইউনিভার্সিটিতে। জুলজিতে মাস্টার্স করে ও। পারিবারিক আশ্রয়ে বাবা ওকে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টা করেননি, কারণ জানতেন একমাত্র মেয়ের সঙ্গে

জেদাজেদিতে তিনি পারবেন না। তবে লোকজন লাগিয়েছিলেন, তারা কড়া নজর রাখত মলির ওপর। লোক মারফতই খবর পাঠাতেন মেয়ের কাছে, তাঁর কথা না শোনায় মেয়েকে তিনি পারিবারিক সম্পত্তি থেকে অবশ্যই বঞ্চিত করবেন। ভার্সিটিতে পড়ার সময় একটা ছেলেকে মলির ভাল লেগে যায়। একসঙ্গে ছ'মাস ছিল ওরা। বিয়ে হয়নি, পেটে বাচ্চা এল। পরস্পরকে ভালবাসত ওরা, আর সারাক্ষণ শুধু ঝগড়া করত। স্বভাবতই বিচ্ছেদ ঘটল, কিন্তু সম্পর্ক নষ্ট করার সময় ছেলেটাকে মলি জানতেই দিল না যে সে প্রেগন্যান্ট।

ঘটনা জানতে পেরে রডনি বুমার খবর পাঠান, ওই ছেলেকে বিয়ে করতে হবে, তা নাহলে মলিকে তিনি নিজের মেয়ে বলে স্বীকারই করবেন না। বাপের কথায় কান দেয়নি মলি। সময় মত যমজ বাচ্চা প্রসব করল সে। রডনি বুমার খবর পাঠালেন, বাচ্চা দুটোকে নিয়ে মলি যেন তাঁর কাছে ফিরে আসে। কিন্তু গেল না মলি। যায়নি, কোন দিন যাবেও না। তবে বাপের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে ধারণা থাকায় খুব ভয় পায় মলি, বাচ্চা দুটোকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে ভেবে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে। ওদেরকে এক দম্পতির কাছে লুকিয়ে রেখেছে মলি, ভুলেও তাদের ঠিকানা কাউকে জানায় না। সেই পুরানো ভয়টা মাত্রা ছাড়াচ্ছে পাউলাকে দেখে। পাউলা শুধু ওর বাবার রক্ষিতা নয়, সমস্ত কুকর্মের সঙ্গিনীও বটে।

ডেস্কের ওপর বোতল আর গ্লাস রেখে কাগজ-পত্রের স্তূপ আর নটিকাল চার্টের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রের ওপর চোখ বুলাল মলি—ক্রেডিট কার্ড, বিজনেস আর মেম্বারশিপ কার্ড, ওয়ালেট, কার কী, ডোক্সা ডাইভ ওয়াচ। ভদ্রলোক সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না, ভাবল মলি; কোথাও তার কোন ফটোগ্রাফ নেই। ওর জীবনে বেশ ক'জন পুরুষ এসেছে, আবার চলেও গেছে—কেউ গেছে ওর অনুরোধে, কেউ স্বেচ্ছায়। তবে সবাই তারা নিজেদের কিছু ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোক যেন নির্জন একটা পথে একা চলেন, পিছনে কিছুই ফেলে যান না।

দোরগোড়া টপকে রানার পিপিং কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল মলি। বাথরুমে, সিঙ্ক-এর ওপর আয়না ঝাপসা হয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই, খানিক আগে গোসল করেছে কেউ। আফটারসেভের গন্ধ ভাসছে বাতাসে, তলপেটে শিরশিরে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলল। 'মি. রানা? আপনি কি এখানে আছেন?'

তারপরই রানাকে দেখতে পেল মলি, বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। হাত দুটো বুকের ওপর এমন ভঙ্গিতে ভাঁজ করা, যেন একটা কফিনে শুয়ে আছে। নাভির নিচেটা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা দেখে স্বস্তির সঙ্গে কৌতুক বোধ করল ও। তারপরই অবশ্য বিব্রত হলো, বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত। এভাবে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা করবেন।'

রানা কিন্তু ঘুমাচ্ছেই।

ওর সারা শরীরে দৃষ্টি বুলাচ্ছে মলি। চোখ ফেরাতে পারছে না বলে মনে মনে ভারি লজ্জা পেল। এমন সুঠাম স্বাস্থ্য খুব কমই দেখা যায়। চোখের চার ধারে আর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম কিছু রেখা বা ভাঁজ থাকায় না হাসলেও মনে হয় হাসছে। চেহারায় কি কোন আভা বা জ্যোতি আছে? চোখ, নাক, ভুরু, কপাল সব মিলিয়ে

যেন একটা মিরাকল। এভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মলির মনে হলো, এই মানুষটা যদি কোন দিন ওকে ছোঁয়, মোমের মত গলে যাবে ও।

সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। ফেরার জন্যে ঘুরল মলি। পরমুহূর্তে পাথর হয়ে গেল।

দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাউলা।

'এখানে কি করছ তুমি?' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল মলি।

'অধিক ভোজনে বাধা দিতে চাই, তোমার যাতে বদহজম না হয়,' বলে হেসে উঠল পাউলা।

'তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?' জিজ্ঞেস করল মলি। 'বাকি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওনি কেন?'

'একই প্রশ্ন তো আমিও তোমাকে করতে পারি, মলি।'

পাউলাকে পাশ কাটিয়ে অ্যান্টিরুমে চলে এল মলি। 'নুমার বিজ্ঞানীরা ডেথ প্লেগ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, সব লিখে জানাবার জন্যে সী লায়নে ক'টা দিন থাকতে বলেছেন আমাকে।'

'তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ, আমিও একটা রিপোর্ট লিখব।'

'মর্নিং রোজে কয়েক হপ্তা থাকলাম, তোমাকে আমি দেখিনি কেন?'

'অসুস্থ ছিলাম, নিজের কেবিন ছেড়ে বেরুইনি,' জবাব দিল পাউলা। 'মিরাকুলাসলি বেঁচে গেলাম, তুমি অবাক হওনি?'

মলির চোখে সন্দেহ। 'সবাইকে তুমি বলেছ ফ্রিজারে ছিলে।'

'একেবারে ঠিক সময় মত, কি বলো?'

'তোমার ভাগ্য ভাল।'

'ভাগ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই,' বলল পাউলা। 'তোমার নিজের ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেছ? ভেবে দেখেছ ঠিক যখন তুমি হোয়েলিং স্টেশনের গুহায় ঢুকলে তখনই কেন ডেথ প্লেগ আঘাত করল?'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'তুমি আসলে বোঝোনি, মলি। বাপকে অপমান করে সেই যে তুমি তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলে, ভেবেছ সে-কথা কোনদিন ভুলবে সে বা ক্ষমা করবে তোমাকে? রডনি তোমাকে তার এক নম্বর শত্রু বলে মনে করে। তুমি কখন কি করছ না করছ সব খবর তার জানা। তার প্ল্যান-প্রোগ্রাম জানার পর আমিই তাকে অনুরোধ করি তোমাকে যেন প্রাণে বাঁচার একটা সুযোগ অন্তত দেয়া হয়।'

'আমাকে প্রাণে বাঁচার সুযোগ দেয়া হয়? মানে? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'কার কথায় মর্নিং রোজের ক্যাপটেন তোমাকে ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটাকে নিয়ে রুরালিতে নামার আয়োজন করেন?'

'তোমার কথায়?'

'অবশ্যই। লেকচারারদের তালিকায় তুমি ছিলে দু'নম্বরে। রুরালিতে দ্বিতীয় যে গ্রুপটা নামত, কথা ছিল সেটাকে গাইড করবে তমি। তাদের আর নামা হয়নি,

ফলে কেউ তারা বাঁচেওনি।'

'কি কারণ? কারণটা ব্যাখ্যা করো,' ফিসফিস করে বলল মলি। ভয়ে তার হার্টবিট বেড়ে গেছে।

'এখানে সঠিক সময়ের প্রশ্ন এসে পড়ে,' বলল পাউলা। 'রডনির লোকজন হিসেব কষে জানায়, ট্যুরিস্টদের প্রথম গ্রুপটা হোয়েলিং স্টেশনের নিরাপদ গুহায় ঢোকার পর ডেথ প্লেগ আঘাত হানবে।'

মলির মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। মনে হলো পায়ের নিচে ডেক কাত হয়ে যাচ্ছে। 'বাবা কেন, কারও পক্ষেই এ-ধরনের ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার কথা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়।'

'তোমার বাবা একটা প্রতিভা,' চাপা হাসির সঙ্গে বলল পাউলা। 'এবং সাংঘাতিক চতুর। আগে থেকে সব প্ল্যান করা না থাকলে, তুমিই বলো, আমি জানলাম কিভাবে কখন ফ্রিজারের ভেতর ঢুকতে হবে?'

'কিভাবে তিনি জানলেন কখন ডেথ প্লেগ হানা দেবে?' ঢোক গিলল মলি।

'আগেই বলেছি,' সব ক'টা দাঁত দেখিয়ে নিঃশব্দে হাসছে পাউলা, 'তোমার বাবা বোকা নন।'

রাগে ও ঘৃণায় সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল, হিস হিস করে উঠল মলি, 'তিনি যদি কোন আভাস পেয়ে থাকেন, এতগুলো লোককে মরতে দিলেন কেন?'

'বুড়ো হাবড়া একদল ট্যুরিস্টকে নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক রডনি নয়, তার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে।'

'এতগুলো মানুষ মারা গেল, সেজন্যে তোমাদের অবহেলা যদি দায়ী হয়, খোদার কসম বলছি আমি ছাড়ব না...'

'তুমি তোমার বাপের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়বে?' পাউলার বলার সুরে বিদ্রূপ। তারপর নিজেই জবাব দিল, 'তা তুমি পারো, তোমার পক্ষে সবই সম্ভব।'

'সম্ভবই তো।'

'আসলে সম্ভব না,' বলল পাউলা, এখন আর হাসছে না, 'যদি চোখের মণি দুটোকে হারাতে না চাও আর কি।'

মলির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। 'ইকো আর মিরেজ এমন জায়গায় আছে, বাবা কোনদিন ওদেরকে খুঁজে পাবেন না।'

'যমজ বাচ্চা দুটোকে পার্থ-এ ওই শিক্ষক দম্পতির বাড়িতে লুকিয়ে রেখে তুমি খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাওনি, মলি।'

'তুমি ধোঁকা দিচ্ছ...'

'শিক্ষক ভদ্রলোকের নাম জন লাফাটি। কি, ঠিক বলছি না?' এখন আবার হাসছে পাউলা। 'গত হপ্তায় ভদ্রলোককে পটিয়ে-পাটিয়ে তোমার বাচ্চা দুটোকে পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

মলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কথা বলার সময় গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, 'ওরা তোমাদের কাছে?'

'ছেলে দুটো? হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তোমরা যদি জন লাফাটির কোন ক্ষতি করে থাকো...'

'আরে না, তোমার বাবা ভদ্রলোককে বরং উপহার পাঠিয়েছেন।'

'ইকো আর মিরেজ…ওদেরকে নিয়ে কি করেছ তোমরা?' কোন রকমে কান্না চেপে রেখেছে মলি।

'আমাদের প্রাইভেট আইল্যান্ডে ওদেরকে খুব যত্নের সঙ্গে রেখেছে তোমার বাবা। ওদেরকে সে হীরের ব্যবসা শেখাচ্ছে। আরে, হাসো! খুব খারাপ কিছু যদি ঘটে, কোন দুর্ঘটনায় পড়ে কষ্ট পাবে–বড়জোর। বাচ্চারা কি ধরনের ঝুঁকি নেয় তুমি তো জানোই–মাইনিং টানেলে খেলতে ঢোকে। আর ভাল দিকটা হলো, তুমি যদি পরিবারের সঙ্গে থাকো, এক সময় দেখবে তোমার ছেলেরা হাজার কোটি ডলারের মালিক বনে গেছে।'

'বাবার মত?' চাপা গলায় হিস হিস করে উঠল মলি। 'তারচেয়ে আমি মরে যাব।' হঠাৎ ভেঙে পড়ল ও, ফুঁপিয়ে উঠে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

'তোমার বাবাকে তো চেনো,' বলল পাউলা। 'তোমার মৃত্যুটা হয়তো যথেষ্ট বিবেচনা করবে না সে। তোমাকে সে আরও বড় শাস্তি দিতে চাইতে পারে। তারচেয়ে আমি যা বলি শোনো। নুমায় তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দিন কয়েক কাটাও, আমি কি বলেছি ভুলেও তা কাউকে জানিয়ো না। তারপর আমরা বাড়ি ফিরে যাব।' দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে। 'তোমার বাবাকে তুমি যত খারাপ বলেই জানো, তুমি ক্ষমা চাইলে অবশ্যই সে তোমাকে ক্ষমা করবে। অবশ্য শর্ত থাকবে–পরিবারের প্রতি অনুগত হতে হবে তোমাকে।'

ওয়াশিংটন, নুমা হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রূমে মীটিঙে বসেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। তরুণ ল্যারি কিং উপস্থিত, নুমার কমপিউটর নেটওঅর্কের চীফ সে, সেই সঙ্গে মেরিন সায়েন্সের ওপর সবচেয়ে দামী ডাটা লাইব্রেরীর পরিচালক। আর আছেন জর্জ রেডক্লিফ, নুমার ইগজেকিউটিভ ডিরেক্টর ও সেকেন্ড ইন কমান্ড।

মীটিঙের শুরুতেই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সদ্য পাওয়া রিপোর্ট পড়ে শোনালেন অ্যাডমিরাল। সব মিলিয়ে আটটা পয়েন্টে সীল, পেঙ্গুইন, ডলফিন আর মানুষ মারা গেছে। যেখানেই আঘাত হেনেছে ডেথ প্লেগ, নব্বুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাণী বাঁচেনি। রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে দেয়াল জোড়া মানচিত্র আলোকিত করা হলো, পয়েন্টগুলোয় ফুটে উঠল লাল ক্রস।

'আমি হতাশ,' বিরস বদনে স্বীকার করল ল্যারি কিং। 'সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য ভরে অন্তত একশো বার চেষ্টা করেছি, কমপিউটর কোন সমাধান দিতে পারেনি। পরিচিত কোন রোগ বা রাসায়নিক দূষণ হাজার মাইল ছুটে গিয়ে সীমিত একটা এলাকার সমস্ত প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারে না।'

'আমার সঙ্গে ত্রিশজন বিজ্ঞানী সমস্যাটা নিয়ে কাজ করছে,' বললেন রেডক্লিফ। 'এখন পর্যন্ত তারা কোন ক্লু খুঁজে পায়নি।'

'পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কি বলছে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'বিষক্রিয়ায় কোন টিস্যু ড্যামেজ হয়নি। ওয়াল্টার রীড আর্মি মেডিকেল সেন্টারের কর্নেল মিলার অবশ্য এখনও ফুল রিপোর্ট পাঠাননি, পাঠালেই আপনাকে জানাব।'

'কি বিদঘুটে সমস্যা, তাই না? মানুষ বা প্রাণী কোন কারণ ছাড়া তো আর মারা যেতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এভাবে ব্যর্থ হবেন, এ আমি ভাবতেই পারিনি। এখন দেখছি যতই অদ্ভুত শোনাক, মাসুদ রানার আইডিয়াটার ওপর গুরুত্ব দিতে হয়।'

'সেটা কি?' ল্যারি কিং জানতে চাইল।

'প্রথমে তো ভেবেছিলাম রানা বোধহয় প্রলাপ বকছে,' অ্যাডমিরাল স্বীকার করলেন। 'ওর ধারণার সঙ্গে আর কারও ধারণা মেলে না।'

'কি সেটা?' এবার রেডক্লিফ জিজ্ঞেস করলেন।

'রানা এক ধরনের দূষণের কথা বলছে।'

'আমরা চিন্তা করিনি এমন কি দূষণের কথা বলতে পারেন উনি?' রেডক্লিফের ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল।

গম্ভীর একটু হাসি দেখা গেল জর্জ হ্যামিলটনের ঠোঁটে। 'শব্দদূষণ,' বললেন তিনি।

'শব্দদূষণ? মানে?'

'রানার ধারণা, মারাত্মক কোন সাউন্ড ওয়েভ শত শত, বা এমনকি হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পানির ওপর মাথা তুলছে, নির্দিষ্ট একটা এলাকা জুড়ে মেরে ফেলছে সমস্ত প্রাণীকে।'

'রানা জিনিয়াস, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি,' বলল ল্যারি কিং। 'তবে এক্ষেত্রে বোধহয় প্রলাপই বকছে সে।' নুমাতে মুরল্যান্ডের মতই রানার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। 'ওকে বলুন রানা এজেন্সির লোকজনকে নিয়ে নিমবাস দ্বীপে আরেকবার যাক, যুদ্ধ করে বন্দী বাংলাদেশীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসুক–মানাবে।'

কিন্তু রেডক্লিফ বললেন, 'আমার ধারণা, মি. রানা সম্ভবত ঠিক পথেই চিন্তা করছেন।'

'এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। ল্যারির দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমি তোমার লাইব্রেরীতে হানা দাও। আন্ডারওয়াটার অ্যাকুসটিক সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য বের করো। হাই-এনার্জি সাউন্ড ওয়েভ নিয়ে যেখানে যত এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, কমার্শিয়াল বা মিলিটারি, সবগুলোর বিস্তারিত রিপোর্ট চাই আমি। এ-ধরনের সাউন্ড ওয়েভ মানুষ ও সামুদ্রিক প্রাণীর ওপর কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাও জানতে চেষ্টা করো।'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি। 'মীটিং শেষ হলেই কাজে বসব, রানার ধারণা অসার প্রমাণ করার জন্যে।'

'ওয়াল্টার রীড আর্মি মেডিকেল সেন্টার থেকে আর্মি কর্নেল মিলার বলছি।'

'অ্যাডমিলার জর্জ হ্যামিলটন, কর্নেল। আপনার ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি।'

'আচ্ছা, বলুন তো, অ্যাডমিরাল, এই লাশগুলো আপনারা কি একটা ফিশিং বোটে পেয়েছেন, সাগরের মাঝখানে?'

'হ্যাঁ।'

'আর একজোড়া শুশুক ও দু'জোড়া সীল?'

'আপনি জানেন ওগুলো কোথায় পাওয়া যায়।'

'আগে কখনও আমি অ্যাকুয়্যাটিক প্রাণীর পোস্ট মর্টেম করিনি।'

'মানুষ, শুশুক আর সীল, সবই তো স্তন্যপায়ী।'

'অ্যাডমিরাল, আপনার কেসটা রীতিমত হতভম্ব করে তুলেছে আমাকে।'

'ওগুলো মারা গেল কিভাবে?'

'ডাক্তারী ভাষায় বললে কিছুই বুঝবেন না। সোজা করে বললে, কানের ভেতর যন্ত্রপাতি বা পার্টস যা আছে তার কোনটা ছিঁড়ে গেছে, কোনটায় চিড় ধরেছে। এর ফলে মাথা ঘুরতে পারে, কানের ভেতর বিকট আওয়াজ হতে পারে, আর খুলির গোড়ায় রক্তক্ষরণ তো ঘটবেই। এই রক্তক্ষরণেই মারা গেছে।'

'লক্ষণগুলো কি কি হবে?' জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'শুশুক বা সীল সম্পর্কে বলতে পারব না। মানুষের বেলায় কি ঘটবে বলছি। হঠাৎ খুব জোরে মাথা ঘুরবে, দ্রুত ভারসাম্য হারাবে, বমি পাবে, মাথায় তীব্র ব্যথা হবে। সব মিলিয়ে ফলাফল–প্রথমে জ্ঞান হারাবে, তারপর মারা যাবে।'

'আমাকে বলতে পারেন, কি দায়ী? কোন ধরনের প্লেগ?'

অপরপ্রান্তে ইতস্তত করছেন কর্নেল মিলার। 'কি বলব, আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া হয়ে যায়।'

'তাই ছুঁড়ুন।'

'এ স্রেফ আমার ধারণা, অ্যাডমিরাল। আপনার জেলেরা, শুশুক আর সীলগুলো সম্ভবত হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ডে মারা গেছে।'

সী লায়নের বিজ্ঞানী ও অফিসাররা মলি বুমার আর পাউলা পার্কারের বিদায় উপলক্ষে একটা পার্টির আয়োজন করল। হীরক সম্রাট রডনি বুমারের মেয়ে মলি, এ-কথা মলি নিজে কাউকে না বললেও কিভাবে যেন প্রচার হয়ে গেছে। আর পাউলা প্রচার করেছে সে রডনি বুমারের ভাবী স্ত্রী।

বায়োলজিস্ট থমাস কীল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গত তিন দিন আঠারো ঘণ্টা করে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছে মলি; সংগ্রহ করা ডলফিন, পেঙ্গুইন আর সীলের মৃতদেহ পরীক্ষা করেছে, নোট লিখেছে পাতার পর পাতা। তাদের সবার সঙ্গে দারুণ একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওর। তবে এই তিন দিন রানা যতক্ষণ সী লায়নে ছিল, অত্যন্ত কৌশলে মলিকে কড়া পাহারা দিয়ে রেখেছে পাউলা, ও যাতে রানার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে না পারে। রানা অবশ্য জাহাজে ছিল খুব কম সময়, হেলিকপ্টার নিয়ে দূর-দূরান্তের দ্বীপগুলোর ওপর চক্কর দিয়েছে, দেখতে চেয়েছে ডেথ প্লেগ নতুন কোথাও হানা দিল কিনা। পাউলার কৌশল ধরতে পারেনি ও, বরং ভুল বুঝেছে মলিকে। মেয়েটাকে ওর ভাল লাগলেও, মলি ওকে এড়িয়ে থাকতে চায়, এটা ধরে নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ও।

পার্টি চলছে, এই সময় একটা ফোন আসায় কমিউনিকেশন রূমে চলে এল রানা। ফোন করেছেন ওয়াশিংটন থেকে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'জরুরী মীটিং,' রানাকে জানালেন তিনি। 'হেলিকপ্টার নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

আর্জেন্টিনার পুনা অ্যারেনাস-এ চলে এসো, এয়ারপোর্টে তোমাদের জন্যে একটা মিলিটারি জেট ট্র্যান্সপোর্ট রাখার ব্যবস্থা করেছি।'

রানা বলল, 'তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কাল বিকেল নাগাদ। কিন্তু জরুরী মীটিং কেন?'

'ডেথ প্লেগের কারণ সম্পর্কে তুমি যে আশঙ্কার কথা বলেছ, শুনে মুখ বাঁকিয়েছিল ল্যারি কিং,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এখন সে তোমার পা ধুয়ে পানি খেতে চাইছে।'

'তারমানে সাউন্ড ওয়েভই এই মড়কের জন্যে দায়ী?'

'সেই উপসংহারেই পৌঁছুতে হয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'টেকনিক্যাল ব্যাপার, ওর মুখেই শুনো।'

'আমরা এখুনি কপ্টারে চড়ছি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

রানা ও মুরল্যান্ডকে কিছুক্ষণ হলো দেখছে না মলি, থমাস কীলকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'ওরা' কপ্টার নিয়ে মেইনল্যান্ডে যাচ্ছে, মিলিটারি ট্র্যান্সপোর্ট ধরার জন্যে।'

কোত্থেকে পাশে চলে এল পাউলা, ফিসফিস করে বলল, 'বুঝতেই পারছ, তোমার ব্যাপারে ভদ্রলোকের কোন আগ্রহ নেই। গুডবাই বলার গরজটুকুও দেখাননি।'

মলির মনে হলো কে যেন তার হৃৎপিণ্ডটা বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে কিছু না ভেবেই ছুটল ও, দরজা টপকে বেরিয়ে এল ডেকে। এরই মধ্যে প্যাড থেকে তিন মিটার ওপরে তুলে ফেলেছে রানা হেলিকপ্টার। জানালার ভেতর থেকে মলিকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল মুরল্যান্ড। রানার দুই হাতই ব্যস্ত, আন্তরিক হেসে মাথা ঝাঁকাল শুধু।

রানা আশা করেছিল উত্তরে মলিও হাসবে, কিন্তু হাসল তো না-ই, মনে হলো ভয়ে বা হতাশায় ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা। মুখের সামনে হাত দুটোকে চোঙ বানিয়ে চিৎকার করল মলি, যদিও এঞ্জিনের আওয়াজে কি বলছে শুনতে পেল না রানা।

জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে মুরল্যান্ড দেখল, ডেকের ওপর বসে পড়েছে মলি, ওর দিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছেন ক্যাপটেন হেনডারসন। 'ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না,' রানাকে বলল মুরল্যান্ড।

'কোন ব্যাপারটা?'

'মলি…মেয়েটা উদ্ভট আচরণ করছে।'

কপ্টারের কন্ট্রোল নিয়ে খুব ব্যস্ত রানা, মলির অপ্রত্যাশিত কাতর আচরণ দেখার সুযোগ পায়নি। 'তাই?' অন্যমনস্কভাবে জানতে চাইল। দিক বদলে মেইনল্যান্ডের দিকে ছুটল ওদের কপ্টার, দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে সী লায়ন।

'অদ্ভুত,' খানিক পর আবার বলল মুরল্যান্ড।

'মানে?'

'মলি কিছু বলতে চাইছিল। সত্যি বলছি, চিৎকার করছিল।'

'এঞ্জিনের আওয়াজে ওর চিৎকার তুমি শুনতে পেলে?'

'তা পাইনি, তবে উচ্চারণ করার ভঙ্গি দেখে শব্দগুলো ধরতে পেরেছি।'

'তুমি তাহলে লিপ-রিডিং শিখেছ?' হেসে ফেলল রানা।

'ঠাট্টা নয়, দোস্ত,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল মুরল্যান্ড। 'মলি কি বলতে চেয়েছে আমি জানি।'

'তাই? কি বলতে চেয়েছে?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, মলি বলল—হেলপ মি।'

কুশল বিনিময়েরও সময় পাওয়া গেল না। নুমার হেডকোয়ার্টারে ওরা পৌঁছুনোর পরপরই সরাসরি কনফারেন্স রূমে ঢুকে মীটিঙে বসতে হলো। রানা আর মুরল্যান্ড যে যার সীটে বসতেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'তুমি প্রশ্ন করো, মাই বয়; ল্যারি জবাব দেবে।' নুমার সবাই খুব ভালভাবে জানে যে মাসুদ রানাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তিনি, 'মাই বয়' বলে একমাত্র রানাকেই সম্বোধন করেন।

নোটবুক আর পেন্সিল টেনে নিয়ে ল্যারি কিং-এর দিকে তাকাল রানা। 'খুনী এখানে সাউন্ড ওয়েভ, আমার এই ধারণার পিছনে কোন সারবস্তু পেলে, ল্যারি?'

'এক কথায়, অঢেল,' জবাব দিল কিং। 'থিওরিটা বিশদ ব্যাখা করার জন্যে অ্যাকুসটিকস এক্সপার্টরা এখনও কাজ করছেন। আপাতত শুধু এটুকু বলতে পারি, আমরা এমন একটা কিলার বা খুনীকে খুঁজছি যা কিনা পানির ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে পারে। অনেকগুলো দিক পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রথমত, ইনটেন্স এনার্জি জেনারেট করছে এমন একটা উৎস নিশ্চয়ই কোথাও আছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে সেই উৎস থেকে কিভাবে সাগরের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করছে এনার্জি। তৃতীয়ত, কোন টার্গেট বা স্ট্রাকচার অ্যাকুসটিক এনার্জি রিসিভ করছে। এবং চতুর্থত, এই এনার্জি হিউম্যান ও অ্যানিমেল টিস্যুর ওপর কি ধরনের ফিজিওলজিকাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।'

'হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ড ওয়েভ প্রাণী বধে সক্ষম, এটা প্রমাণ করা সম্ভব কিনা?'

'যে সাউন্ড ওয়েভ খুন করার জন্যে যথেষ্ট ইনটেন্স, তা কখনও সাধারণ কোন সাউন্ড সোর্স থেকে আসতে পারে না। এমনকি ইনটেন্স কোন সোর্স দূরে কোথাও খুন করতে পারবে না, যদি সেই সাউন্ড কোন ভাবে ফোকাস করা না হয়।'

'বিশ্বাস করা কঠিন যে হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ড ও মাত্রা ছাড়ানো রেজানান্স এনার্জির একটা কমবিনেশন পানির ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে সারফেসে উঠল, তারপর বিরাট একটা এলাকা জুড়ে সমস্ত প্রাণী মেরে ফেলল।'

'এই সাউন্ড রে কোত্থেকে আসছে, কোন ধারণা করা গেছে?' জানতে চাইলেন নুমা চীফ।

'হ্যাঁ, সে দাবি আমরা করতে পারি।'

'একটা মাত্র সাউন্ড সোর্স বিপুল হারে প্রাণ সংহার করবে?' প্রশ্নটা জর্জ রেডক্লিফের।

'না, তা পারবে না,' বলল কিং। 'সাগরের নিচে ও ওপরে আমাদের যে

পাইকারী হত্যাযজ্ঞের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা ঘটাতে হলে বিপরীত মুখী কয়েকটা সোর্স দরকার।' কাগজ-পত্রের স্তূপ ঘেঁটে একটা কাগজ আলাদা করল সে। তারপর একটা রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিল কয়েকবার। হলোগ্রাফিক চার্টে চারটে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। স্প্যাসিফিক ওশনের চারটে আলাদা পয়েন্টে ধ্বংসাত্মক সাউন্ড ওয়েভের উৎস খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'হাইড্রোফোনের গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম ধার কোরে,' বলল কিং। 'স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন নেভী সোভিয়েত সাবমেরিনের গতিবিধি মনিটর করার জন্যে ওগুলো বিভিন্ন মহাসাগরে বসিয়েছিল।' টেবিলে বসা প্রত্যেককে একটা করে ছাপা চার্ট দিল সে। 'সাউন্ড ওয়েভের এক নম্বর উৎস হলো নিমবাস আইল্যান্ড, ওখান থেকে উৎসারিত হয়ে সারফেসে উঠছে তাসমানিয়া ও সাউথ আইল্যান্ডের মাঝখানে। দ্বিতীয় উৎসটা ওয়েক আইল্যান্ডের কাছাকাছি, দ্বীপটার নাম রডগার।'

'অনেকটা উত্তরে,' মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'তবে আবার এত বেশি উত্তরে নয় যে রাশিয়াকে সন্দেহ করা চলে,' বললেন রেডক্লিফ।

'এরপর প্রশান্ত মহাসাগরের পুব দিকে আসুন,' বলল কিং। 'এখানে ক্লিপারটন আইল্যান্ড রয়েছে। ফরাসী দ্বীপ ওটা। ক্লিপারটনের কাছাকাছি ক্যান্ডি আইল্যান্ড। এটাও একটা উৎস। শেষ উৎসটা ট্রেস করা সম্ভব হয়েছে হাইড্রোফোনস-এর ডাটা প্যাটার্ন-এর সাহায্যে। দ্বীপটার নাম কোর। ইস্টার আইল্যান্ডের পাশেই ওটা।'

টেবিল ছেড়ে মহাসাগরের থ্রী ডাইমেনশন্যাল চার্টের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'ডাটা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত, ল্যারি?' জানতে চাইল ও। 'তোমার ইলেকট্রনিক গিয়ার হাইড্রোফোন সিস্টেম থেকে ট্র্যাকিং ইনফরমেশন ঠিক মত প্রসেস করতে পেরেছে তো?'

কিং এমন আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, রানা যেন তার বুকে ছুরি মেরেছে। 'আগে কখনও আমার কাজে কোন খুঁত পেয়েছ তুমি?'

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'দ্বীপগুলোয় কি লোকজন আছে?'

রানার হাতে ছোট একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিল কিং। 'প্রতিটি দ্বীপ সম্পর্কে বিস্তারিত সমস্ত তথ্য পাবে এতে। নিমবাস ব্যক্তি মালিকাধীন দ্বীপ। বাকি তিনটে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে লীজ নেয়া হয়েছে মিনারাল এক্সপ্লোরেশন-এর উদ্দেশ্যে। এগুলোকে নিষিদ্ধ এলাকা বলে গণ্য করতে হবে। নিমবাসের আশপাশে ছোট আরও একজোড়া দ্বীপ আছে, গুডউইল আর রেড স্যান্ড–এই তিনটেকে একটা উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।'

'সাউন্ড বা শব্দকে সাগরের তলা দিয়ে কিভাবে এত দূরে পাঠানো সম্ভব?' মুরল্যান্ডের প্রথম প্রশ্ন।

'হাই-ফ্রিকোয়েন্সী সাউন্ড সাগরজলের লবণ দ্রুত শুষে নেয়। কিন্তু লো-

ফ্রিকোয়েন্সী অ্যাকুসটিক ওয়েভস লবণের মলিকিউলার স্ট্রাকচার এড়িয়ে যায়, এবং ওগুলোর সিগন্যাল কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরেও ধরা পড়েছে। এর পরের ব্যাপারটা ঝাপসা বা অস্পষ্ট। কিভাবে তা এখনও আমরা জানি না, হাই-ইনটেনসিটি ও লো-ফ্রিকোয়েন্সী রে, বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত, কনভারজেন্স জোন নামে পরিচিত এলাকায় সারফেস ভেদ করে ও ফোকাস হয়। এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানীরা "কস্টিকস" বলেন।'

চশমা খুলে কাঁচে কোন দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করছেন জর্জ হ্যামিলটন। 'আর আমরা সবাই যদি একটা জাহাজের ডেকে বসে থাকি, জাহাজটা কনভারজেন্স জোনের মাঝখানে হয়, তাহলে কি হবে?'

'যদি একটা মাত্র সাউন্ড সোর্স আঘাত করে,' ব্যাখ্যা করল কিং, 'তাহলে নরম একটা গুঞ্জন শুনতে পাব, হালকা মাথাব্যথা ছাড়া আর কিছু টের পাব না। কিন্তু চারটে ওয়েভ একই এলাকায় একই সময়ে যদি মিলিত হয়, ইনটেনসিটি বহুগুণ বেড়ে যাবে, জাহাজের স্ট্রাকচার আওয়াজ করবে বা কেঁপে উঠবে, আর সোনিক এনার্জি শরীরের ভেতরকার অরগ্যান এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে যে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই আমরা মারা যাব।'

'উৎসগুলো যেহেতু বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে,' বলল মুরল্যান্ড, 'প্রশান্ত মহাসাগরের যে-কোন জায়গায় আঘাত হানতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ, পারে। টার্গেট করা হলে মেইনল্যান্ডের তীরেও আঘাত হানবে।'

'চারটে উৎসের মাঝখানে দ্বীপ রয়েছে কয়েক হাজার, সব মিলিয়ে কয়েক লাখ মানুষের বাস।' থমথম করছে রানার চেহারা। 'আর মেইনল্যান্ডের তীরে রয়েছে অসংখ্য শহর। ওহ্ গড!'

'রে চ্যানেলগুলো কোথায় মিলিত হতে পারে সেটা আন্দাজ করার জন্যে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা,' বলল কিং। 'তবে সেট করা একটা ফর্মুলা বের করা খুব কঠিন। আপাতত আমরা ঢেউ, স্রোত, সাগরের গভীরতা আর পানির তাপমাত্রা নোট করছি। এগুলো সাউন্ড রে-র গতিপথ কমবেশি বদলে দিতে পারে।'

'আমার প্রশ্ন,' বলল রানা, 'দ্বীপগুলো মিনারাল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানীর হাতে রয়েছে, এটা ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে আর কি মেলে?'

'দ্বীপগুলোয় গোপনে নিউক্লিয়ার কিংবা কনভেনশনাল উইপন টেস্ট করা হচ্ছে না তো?' মুরল্যান্ডের প্রশ্ন।

'না,' জবাব দিল কিং।

'তাহলে মিলটা কি?' অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন।

'হীরে।'

'হীরে?' তীক্ষ্ণ হলো অ্যাডমিরালের দৃষ্টি।

'জ্বী, স্যার,' বলল কিং। 'আলোচ্য চারটে বা সব মিলিয়ে ছ'টা দ্বীপেরই মালিক বুমার কনসলিডেটেড মাইনিং লিমিটেড। অস্ট্রেলিয়া, সিডনিতে ওদের হেড অফিস। হীরে উৎপাদনে ডি বিয়ারের পরই ওদের স্থান।'

রানা বলল, 'এই দ্বীপগুলোর মালিক যে রডনি বুমার তা আমি আগে থেকেই জানি। নুমার হেলিকপ্টার নিয়ে আমি যে মেয়ে দুটোকে উদ্ধার করলাম তাদের

একজন রডনি বুমারের মেয়ে, আরেকজন ভদ্রলোকের প্রেমিকা।'

'ডেথ প্লেগ হানা দেয়ার সময় অকুস্থলে মেয়ে দুটোর থাকাটা কাকতালীয় হতে পারে কি?' অ্যাডমিরালের গলায় সন্দেহ।

'সাউন্ড ওয়েভের উৎস যখন রডনি বুমারের দ্বীপ, এই অ্যাকুসটিক ডেথ প্লেগের জন্যে সরাসরি তাঁকেই দায়ী করতে হয়,' বললেন রেডক্লিফ। 'মি. রানা তাঁর প্রিয় দুই তরুণীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, কাজেই জেরা করার জন্যে ওঁকেই তার কাছে পাঠানো দরকার।'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'রডনি বুমার সম্পর্কে জানি আমি। সাংঘাতিক অহঙ্কারী মানুষ, কারও সঙ্গেই দেখা করেন না। তাছাড়া, ডি বিয়ারের মত বুমার মাইনিং কোম্পানীও চুরি বা স্মাগলিং হবার ভয়ে তাদের সম্পত্তি কড়া পাহারা দিয়ে রাখে, একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না। রানা তাঁর যত বড় উপকারই করে থাকুক, তিনি দেখা করবেন বলে মনে হয় না।'

'বললেই হলো দেখা করবেন না!' রেগে যাচ্ছে কিং। 'তাঁর মাইনিং অপারেশন পদ্ধতি যদি কোনভাবে এই ডেথ প্লেগের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে, পুলিস বা আমাদেরকে তিনি এড়াবেন কিভাবে?'

'রডনি বুমার অস্ট্রেলিয়ান বিলিওনেয়ার, মন্ত্রীসভা আর প্রশাসনে তাঁর বন্ধুর অভাব নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তাছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে আমাদের ইনোসেন্ট ধরে নিতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা জানি, এই দুর্বিপাকের জন্যে প্রকৃতি দায়ী।'

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'আমাদেরকে অফিশিয়ালি এগোতে হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি আমি। ইনভেস্টিগেশনে রডনি বুমারের সহযোগিতা চাইব আমরা।'

কিং বলল, 'তাতে তো কয়েক হপ্তা লেগে যাবে।'

মুরল্যান্ড বলল, 'তারচেয়ে লাল ফিতে এড়িয়ে দেখে আসি তাঁর মাইনিং টেকনোলজি এই পাইকারী হত্যার জন্যে দায়ী কিনা।'

'গোপনে কোন ডায়মন্ড মাইনে ঢোকা সম্ভব নয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আবার বলছি, ডায়মন্ড প্রডিউসিং মাইনের চারধারে সিকিউরিটি সাংঘাতিক কড়া। হাই-টেক ইলেকট্রনিক সিস্টেম পেনিট্রেট করতে হলে উঁচুদরের ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনাল দরকার হবে।'

'আর যদি একটা স্পেশাল ফোর্সেস টীম পাঠানো হয়?' জানতে চাইল কিং।

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাগবে।'

'অনুমোদন আমরা চাইছি না কেন?' মুরল্যান্ড জিজ্ঞেস করল।

'এখনও সময় হয়নি। আগে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল রানা, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন থামতে মুখ খুলল, 'বোঝা গেল, রডনি বুমারের বিরুদ্ধে নুমা এখুনি কিছু করতে পারবে না, অনেক অসুবিধে আছে। কিন্তু রানা এজেন্সির কোন অসুবিধে নেই, প্রয়োজনীয় অনুমতি আগেই তারা পেয়ে গেছে। আমরা দেড় হাজার বাংলাদেশীর নিরাপত্তা সম্পর্কে

উদ্বিগ্ন, কাজেই তদন্তের স্বার্থে রডনি বুমারের যে-কোন দ্বীপে যেতে পারি।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' গম্ভীর সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'বলে যাও।'

'ক্যান্ডি দ্বীপটার মূল মালিক কানাডা সরকার, রডনি বুমার ওটা লীজ নিয়েছেন,' বলল রানা। 'আমরা যদি কানাডা সরকারের অনুমতি নিয়ে একটা ক্যানূতে চড়ে ছবি-টবি তুলতে যাই ওদিকটায়, কার কি বলার আছে?'

'নাহ্, কার কি বলার থাকতে পারে!'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল।'

পাঁচ

রোজকার মত ঠিক সকাল সাতটায় প্রাইভেট এলিভেটর থেকে বেরিয়ে নিজের পেন্টহাউস স্যুইটে ঢুকলেন রডনি বুমার। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। চওড়া কাঠামো। শক্ত পেশী। লোমশ শরীর। ভেতরে ঢোকার সময় কাঁধ দুটো দরজার দু'পাশে ঘষা খেলো, লিনটেল পেরোবার সময় মাথা নিচু করলেন। লালচে চেহারায় সব সময় মারমুখো একটা ভাব থাকে, হাঁটার সময় সামান্য ঝাঁকি খান, চোখ দুটোয় ক্ষুরের মত ধারাল দৃষ্টি। দেখেই বোঝা যায় অসম্ভব দাম্ভিক মানুষ, দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করেন না। কারণ, রডনি বুমার নিজেই একটা সাম্রাজ্য, তিনি শুধু নিজের তৈরি আইন মেনে চলেন।

সিডনি শহরে তাঁর ছাব্বিশতলা জুয়েলারি ট্রেড বিল্ডিংটা খাড়া করতে চারশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। ব্যাংক থেকে কোন লোন নেননি বুমার। এই বিল্ডিঙেই তাঁর অফিস আর কারখানা। কারখানায় ল্যাবরেটরি আছে, হীরে কেটে সাইজ করা থেকে শুরু করে পালিশ করা পর্যন্ত সব কাজই হয় এখানে। তবে সব কাজই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয়, বাইরের লোককে কিছুই জানতে দেয়া হয় না। বিল্ডিঙের ভেতর ও বাইরে বুমারের নিজস্ব সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী টহল দিয়ে বেড়ায়।

বিশাল অ্যান্টিরুমে ঢুকলেন তিনি। চারজন সেক্রেটারিকে পাশ কাটালেন কারও দিকে সরাসরি না তাকিয়ে। যে অফিসটায় ঢুকলেন সেটা বিল্ডিঙের ঠিক মাঝখানে, বন্দর শহর সিডনির অপরূপ দৃশ্য দেখার জন্যে কোন জানালা রাখা হয়নি—বুমারের সঙ্গে ব্যবসায় মার খেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বহু ব্যবসায়ী তাঁকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে স্নাইপার ভাড়া করতে পারে। স্টীলের দরজা দিয়ে ঢুকলেন তিনি, কামরাটার দেয়াল দুই মিটার পুরু। গোটা কামরাটাকে বিশাল একটা ভল্ট বলা যেতে পারে। এখান থেকেই নিজের সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন বুমার। তাঁর এই অফিসে খনি থেকে সংগ্রহ করা কিছু বড় আকারের হীরে বিভিন্ন শো-কেসে সাজানো আছে, এক পত্রিকায় বলা হয়েছে শুধু ওগুলোরই মূল্য নাকি এক দশমিক দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ডেস্কটা পালিশ করা লাভা রক দিয়ে তৈরি, দেরাজগুলো মেহগনির। চেয়ারে বসেই একটা বোতামে চাপ দিলেন বুমার, প্রধান সেক্রেটারি জেনে গেল যে তিনি অফিসে পৌঁচেছেন।

এক মিনিট পরই মেয়েটার গলা ভেসে এল ইন্টারকম থেকে। 'মিস মলি আর মিস পাউলা, স্যার। ওঁরা প্রায় এক ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করছেন।'

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল রডনি বুমারের। 'পাঠিয়ে দাও,' কর্কশ সুরে বললেন তিনি, হেলান দিলেন চেয়ারে।

অফিস কামরায় প্রথমে ঢুকল কালো সুট পরা দীর্ঘদেহী এক তরুণ। পাথরে খোদাই করা ভাবলেশহীন চেহারা, চোখের পাতা নড়ছে না, নিঃশ্বাস ফেলছে কিনা তা-ও বোঝা যায় না, ভেতরে ঢুকে দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, ভুলেও মনিবের দিকে তাকাচ্ছে না। তার নাম মাইকেল শেলফিন, দু'জন সুপারভাইজারের একজন। সুপারভাইজার বলা হলেও, শেলফিন আসলে রডনি বুমারের বডিগার্ড। মনিবের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে শেলফিন তাদের সঙ্গে থাকবে। রডনি বুমার কাউকে বিশ্বাস করেন না, এমনকি নিজের মেয়েকেও নয়।

পাউলা ভেতরে ঢুকল যেন বাতাসের সঙ্গে ভেসে। তার শারীরিক গঠন দীর্ঘ ও পুরুষালি হলেও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত নয় সে, হাঁটা-চলার মধ্যে উড়ে বেড়ানোর একটা ভঙ্গি ব্যালে নর্তকীর কথা মনে করিয়ে দেয়। সাধারণ ডাবল-ব্রেস্টেড কোটড্রেসে দারুণ মানিয়েছে তাকে। ডেস্কের সামনে তিনটে চেয়ারের একটায় বসল সে। রডনি বুমারকে মিষ্টি হাসি উপহার দিল, তবে, 'হাই, ডার্লিং,' ছাড়া আর কিছু বলল না।

বুমার হাসলেন না বা কথাও বললেন না।

মলির হেঁটে আসা দেখে মনে হবে হালকা বাতাসে দোল খাওয়া লিকলিকে বেতস। নীল উল শার্ট পরেছে সে, বোতামের বদলে বুকের কাছে চেইন; সঙ্গে ম্যাচ করা স্কার্ট, পরেছে সাদা বর্ডার দেয়া টার্টলনেকের ওপর। দীর্ঘ চুল মখমলের মত চকচক করছে, রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ জোড়া। খালি একটা চেয়ারের পাশে দাঁড়াল ও, বাবার চোখের গভীরে তাকিয়ে আছে। 'আমি আমার ছেলেদের ফেরত চাই!' কোমরে হাত রেখে ফুঁসে উঠল।

'এই বোকা, আগে বোস,' হুকুম করলেন বুমার, একটা ব্রায়ার পাইপ তুলে নিয়ে পিস্তলের মত মেয়ের দিকে তাক করলেন।

'না!' চিৎকার জুড়ে দিল মলি। 'তোমার এত সাহস যে আমার ছেলেদের কিডন্যাপ করো! এখুনি ওদেরকে আমি ফেরত চাই, তা না হলে এখান থেকে বেরিয়ে সোজা পুলিসের কাছে যাব আমি, এই রাক্ষুসী পাউলা আর তোমাকে অ্যারেস্ট করাব। শুধু তাই নয়, তার আগে তোমার সমস্ত কুকীর্তির কথা নিউজ মিডিয়ায় ফাঁস করে দেব।'

মেয়ের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন বুমার, হাসি হাসি ভাব দেখে মনে হবে মেয়ের উদ্বেগ আর অস্থিরতা উপভোগ করছেন। তারপর ইন্টারকমের সুইচ টিপে বললেন, 'জ্যাক টেসটারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে, প্লীজ?' মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিটা বড় করলেন। 'টেসটারকে তো চিনিস তুই, তাই না?'

'স্যাডিস্টিক গরিলা, তোমার মাইনের সুপারিনটেনডেন্ট। কেন?'

'ও-ই তো তোর বাচ্চা দুটোর দেখাশোনা করছে।'

রাগের বদলে মলির চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল। 'টেসটার আমার...ওহ্ গড!'

'উঠতি বয়েসের ছেলেদের একটু শাসনে রাখা দরকার।'

মলি কিছু বলতে যাচ্ছিল, ইন্টারকম জ্যান্ত হয়ে ওঠায় হাত তুলে বাধা দিলেন বুমার, ডেস্কে রাখা একটা স্পীকার ফোনে কথা বললেন, 'জ্যাক?'

জ্যাক টেসটার জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি।' নেপথ্য থেকে ভারী যন্ত্রপাতির কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসছে।

'ছেলে দুটো কি কাছাকাছি কোথাও আছে?'

'জ্বী, স্যার। ট্রলি থেকে পড়ে যাওয়া পাথর তুলতে বলেছি।'

'আমি চাই তুমি একটা দুর্ঘটনার আয়োজন করবে...'

'না!' আর্তনাদ করে উঠল মলি। 'মাই গড, ওদের বয়েস মাত্র ছয়! তুমি তোমার নাতিদের খুন করতে পারো না!'

'এতদিন ওদেরকে আমি নাতি বলে মেনে নিতে রাজি ছিলাম,' বললেন বুমার। 'এখন আমাকে অন্য কথা ভাবতে হচ্ছে। তোকে কতবার বলেছি, আমার কাছে ফিরে আয়, পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে পড়। কিন্তু তুই আমার কথা কানে তুলিসনি। আমি জোর খাটাবার চেষ্টা করলেই ভয় দেখিয়েছিস, ব্যবসার সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস করে দিবি। কাজেই, তোর ছেলেরা এখন আমার কাছে একজোড়া যমজ বাস্টার্ড ছাড়া কিছুই নয়। ওরা বাঁচল কি মরল, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কারণ আমার কাছে ব্যবসা বড়, তারপর রক্তের সম্পর্ক।'

ভয়ে কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো মলির। এত অসুস্থ লাগছে, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ও জানে, এই যুদ্ধে ওর জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। ছেলেরা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে বাঁচানোর একটাই উপায়, সমস্ত অন্যায় মেনে নিয়ে বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করা। অসহায় বোধ করায় শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। উপলব্ধি করল, ছেলে দুটোকে বাঁচাবার জন্যে হাতে সময় পাওয়া দরকার। নুমার সেই ভদ্রলোক, প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। শুধু ওর প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে নয়, ভদ্রলোকের আচরণে এমন এক আশ্চর্য দৃঢ়তা লক্ষ করেছে ও, ভদ্রলোককে এতটাই দক্ষ আর যোগ্য বলে মনে হয়েছে, এই মহা বিপদের সময় তাঁর সাহায্য পাবার জন্যে মনটা আকুল হয়ে উঠল। মলি ভাবছে, আমার সব কথা শোনার পর ভদ্রলোকের মনে কি খানিকটা সহানুভূতি জাগবে না? একটা অসহায় মেয়েকে কি তিনি সাহায্য করবেন না?

কিন্তু হায়, এখন তাঁকে কোথায় পাবে ও! তিনি তো এখান থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। খালি একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল মলি। ম্লান সুরে জানতে চাইল, 'কি চাও তুমি?'

রডনি বুমারের পেশীতে ঢিল পড়ল। বোতাম টিপে ফোনটা বন্ধ করলেন তিনি। 'ছোটবেলায় তোকে মারধর করা উচিত ছিল আমার।'

'প্রচুর মেরেছ, ড্যাডি ডিয়ার,' বলল মলি। 'পিঠের সব দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি।'

'সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা যথেষ্ট হয়েছে,' গম্ভীর সুরে বললেন বুমার। 'আমি চাই আমেরিকায় ফিরে গিয়ে নুমার ভেতর ঢুকবি তুই। খুব সাবধানে ওদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখবি। ব্যাখ্যাহীন যে-সব মৃত্যু ঘটছে, সেগুলোর কারণ

জানার জন্যে কি পদ্ধতি ব্যবহার করছে ওরা, জানতে চেষ্টা করবি। যদি দেখিস সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, দেরি করিয়ে দিতে হবে। খুন করতে হোক, সাবোটাজ করতে হোক, সব করতে হবে। আমার এই সব শর্ত যদি না মানিস, তোর যমজ বাচ্চারা মারা গেলে আমাকে দায়ী করতে পারবি না। আর যদি সহযোগিতা করিস, ওরা অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যে বেঁচে থাকবে।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ!' কেঁদে ফেলল মলি। 'ক'টা টাকার জন্যে তুমি নিজের নাতিদের খুন করতে চাইছ...'

'ক'টা টাকা নয়, মলি,' এই প্রথম কথা বলল পাউলা। 'বিশ বিলিয়ন ডলার মেলা টাকা।'

'তোমার প্ল্যানটা কি বলবে আমাকে?' বাপকে জিজ্ঞেস করল মলি।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে না গেলে সবই তুমি জানতে পারতে,' বলল পাউলা। 'তোমার বাবা সবগুলো দ্বীপের খনি থেকে সমস্ত হীরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে ফেলতে চাইছেন।'

'কিন্তু কেন? আমি যতদূর জানি, হীরের উৎপাদন সীমিত রাখা হয় বলেই বাজারে ওগুলোর এত দাম। সাপ্লাই বেশি হলে দাম পড়ে যেতে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি,' বলল পাউলা। 'তবে একটা সমস্যা দেখা দেয়ায় এই কাজ করা ছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

হিসাবটা মলি মেলাতে পারছে না। 'সাপ্লাই বেশি হবার কারণে হীরের দাম পড়ে গেলে ডি বিয়ার আর কার্টেল তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আমি অন্তত এটুকু বুঝি যে লড়াই শুরু হলে ওদের সঙ্গে তোমরা পারবে না।'

'আগে শোনো কেন আমরা সবগুলো খনি থেকে সমস্ত হীরে তুলে ফেলতে চাইছি,' বললেন বুমার। 'আমাদের বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, নিমবাস আর নিমবাসের কাছাকাছি দুটো দ্বীপ অর্থাৎ গুডউইল আর রেড স্যান্ড যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে। দ্বীপ বিস্ফোরিত হবে মানে, ওগুলোর আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হবে। সাইজমাগ্র্যাফিক এক্সপেরিমেন্ট থেকে এই সব তথ্য পাওয়া গেছে, কাজেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। বিজ্ঞানীরা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন এক মাস। তার আগেই সমস্ত হীরে খনি থেকে বের করে আনতে হবে।'

'তুমি বললে সবগুলো দ্বীপের খনি থেকে সমস্ত হীরে তুলে ফেলবে। কিন্তু বিস্ফোরিত হবে বলছ মাত্র তিনটে দ্বীপ। তোমার আরও তিনটে দ্বীপ আছে। সেগুলো থেকে সব হীরে তুলে ফেলছ কেন?'

পাউলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিলেন বুমার। বললেন, 'সে-কথা গোপন থাক, আপাতত। শুধু এইটুকু বলি, আমরা হীরে স্টক করছি। একটা সময় আসবে, দুনিয়ার বুকে একা শুধু আমরাই হীরের ব্যবসা করব। ডি বিয়ারকে ব্যবসা থেকে হটিয়ে দেয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

'ত্রিশ দিন?' এই তোমার সময়সীমা?'

চেয়ারে হেলান দিলেন বুমার, বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে মাথা ঝাঁকালেন। 'এই এক মাসে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হীরে স্টক করব আমি। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে খনিগুলোয়।'

'খনিতে তুমি কি করছ যে গোটা প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে মড়ক লেগে গেছে?' মেয়ের চোখে কঠিন দৃষ্টি।

'সব কথা তোকে বলছি, তুই আমাদের ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ফাঁস করবি না, এটা ধরে নিয়ে,' বললেন বুমার। 'বেঈমানী করলে তার পরিণতি কি হবে সেটা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই। ইকো আর মিরেজ অ্যাক্সিডেন্ট করবে।'

'ওহ্ গড!' আবার কেঁদে ফেলল মলি।

'প্রায় বছরখানেক আগে আমার এঞ্জিনিয়াররা হাই-এনার্জি পালস্ড্ আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে একটা বৈপ্লবিক এক্সক্যাভেটর আবিষ্কার করেছে, ব্লু ক্লে খননে যার কোন জুড়ি নেই। ব্লু ক্লে-তেই বেশিরভাগ হীরে জমা হয়ে থাকে। এই নতুন পদ্ধতিতে দ্বীপগুলোর গভীরে সাবটারেনিয়েন রক খুঁড়ছি আমরা, ফলে একটা রেজোন্যান্স তৈরি হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের পানিতে। বিরল ঘটনা হলেও, মাঝে মধ্যেই আমাদের অন্যান্য দ্বীপের মাইনিং অপারেশন থেকে সৃষ্টি রেজোন্যান্স পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। ফলে এনার্জি বহুগুণ বেড়ে এমন একটা মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে যে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী টিকতে পারছে না। এটা স্রেফ দুঃখজনক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, আমার কিছু করার নেই।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল মলি। তারপর কাতর গলায় বলল, 'ড্যাডি, তুমি বুঝতে পারছ না? বিরাট এলাকা জুড়ে সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে! শুধু সামুদ্রিক প্রাণী নয়, মানুষও মরছে শয়ে শয়ে। তোমার কাছে ব্যাপারটা শুধুই দুঃখজনক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া? এ তো ঠাণ্ডা মাথায় পাইকারী হত্যাকাণ্ড!'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' বললেন বুমার। 'আগে সব কথা শোন, তারপর মন্তব্য কর। নিমবাসের পাশে রয়েছে গুডউইল আর রেড স্যান্ড, এই তিনটে দ্বীপকে একটা বিন্দু ধর, অস্ট্রেলিয়ান নরফোক আইল্যান্ডের পাশে। আরেকটা বিন্দু কল্পনা কর কোর দ্বীপকে, ইস্টারের পাশে। এবার উত্তরে চল। আমেরিকান দ্বীপ ওয়েক-এর পাশে রডগার আরেকটা পয়েন্ট, ঠিক আছে? চলে আয় পুবে। ফরাসী দ্বীপ ক্লিপারটনের পাশে আমাদের আরও একটা দ্বীপ রয়েছে, ক্যান্ডি আইল্যান্ড, এটাকে ধর চার নম্বর পয়েন্ট বা বিন্দু। সব মিলিয়ে চারটে বিন্দু, মাঝখানে রয়েছে কয়েক শো দ্বীপ, ঠিক আছে?'

'শুধু কয়েকশো দ্বীপ নয়, দ্বীপগুলোয় কয়েক লাখ মানুষও আছে,' বলল মলি। 'আর আছে কোটি কোটি সামুদ্রিক প্রাণী।'

'তোকে এখন যদি বলি আমি, এই কয়েকশো দ্বীপের প্রায় প্রত্যেকটিতেই রয়েছে হীরের বিশাল ভাণ্ডার, তোর প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

'হোয়াট!'

'কথাটা সত্যি,' তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন বুমার। 'আমাদের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন, এই এলাকায় আগ্নেয়গিরি আছে এমন প্রতিটি দ্বীপের নিচে টন টন হীরে জমে আছে, শুধু পাথর খুঁড়ে তুলে আনার অপেক্ষায়। এখন যদি এতগুলো দ্বীপ আমরা লীজ নিতে চাই, গোটা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে, প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়ে যাবে কয়েক ডজন। তাছাড়া, এতগুলো দ্বীপ লীজ নিতে হলে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি দরকার, যে ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, ভাবতেই শিউরে

উঠতে হয়। তাতে সময়ও লাগবে কয়েক বছর। দ্বীপগুলোয় লোক-বসতি আছে, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো তাদেরকে উচ্ছেদ করতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। 'কাজেই সবচেয়ে সহজ পথটাই আমাকে বেছে নিতে হয়েছে।'

'সাউন্ড ওয়েভ ব্যবহার করে দ্বীপবাসীদের মেরে ফেলবে, তারপর পানির দরে লীজ নেবে ওগুলো, হীরে তোলার জন্যে?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মলি, ভাষা হারিয়ে আর কিছু বলতে পারছে না।

'বলেছি শত শত দ্বীপ, কিন্তু বলিনি ওগুলোর বেশিরভাগই খালি,' বললেন বুমার। 'কাজেই খুব বেশি মানুষ মারা যাবে না। তাছাড়া, ডেথ প্লেগ হানা দিচ্ছে দেখে তারা সাবধান হলেই তো পারে। এই চারটে পয়েন্টের মাঝখানে যত দ্বীপ আছে সবগুলো খালি করে দিক। তাহলেই তো কেউ আর মারা যায় না।'

মলি কথা বলতে পারছে না, জন্মদাতা বাবার দিকে এখনও আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

বডিগার্ড শেলফিনের দিকে তাকালেন বুমার। 'ইয়টটা কোথায়, মাইকেল?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ওটা আমি ক্যান্ডিতে পাঠিয়ে দিয়েছি, স্যার,' বলল শেলফিন। 'আমাদের সিকিউরিটি চীফ রবার্ট হল্ট খবর পাঠিয়েছেন, কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস সন্দিহান হয়ে উঠেছে, ক্যান্ডির আশপাশে ঘুরঘুর করছে আর ফটো তুলছে। আপনি অনুমতি দিলে ইয়টে থাকতে চাই আমি। আপনার জিওফিজিস্টরা আরেকটা কনভারজ্যান্স আসন্ন বলে জানিয়েছেন, লিমা থেকে এক হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে। ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে ওদিকে আমার থাকা দরকার, পেরুর কোস্ট গার্ড তদন্ত শুরু করার আগেই।'

'তোমাকে আমার এখানে দরকার, কোম্পানীর জেট নিয়ে পাউলা যাক।'

'তুমি জানো এরপর কোথায় আঘাত করা হবে?' আতঙ্কিত মলি জানতে চাইল। 'এলাকার জাহাজগুলোকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দাও তাহলে।'

'কি বলছ, মলি!' তিরস্কারের সুরে বলল পাউলা। 'আমাদের গোপন তথ্য দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেব? তাছাড়া, তোমার বাবার বিজ্ঞানীরা নির্ভুলভাবে বলতে পারেন না ঠিক কোথায় বা কখন আঘাত করবে সাউন্ড ওয়েভ। ব্যাপারটা এখনও অনেকটাই অনুমান নির্ভর।'

'কিন্তু তোমরা জানতে সাউন্ড ওয়েভ ঠিক কখন আঘাত করবে রুরালিতে,' বলল মলি। 'ওই দ্বীপের হোয়েলিং স্টেশনের গুহায় আমি ঢুকলাম কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে ড্যাডি তোমাকে মর্নিং রোজে থাকতে বলেছিল, আমি যাতে মারা না যাই।'

পাউলা বলল, 'বিজ্ঞানীদের হিসাব শতকরা দশ ভাগ সঠিক হয়। তোমার ভাগ্য ভাল, সেবার তাঁদের হিসেবে ভুল হয়নি।'

'তারমানে? হিসাবে ভুল হলে আমি মারা যেতাম?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' হেসে উঠল পাউলা। 'একা শুধু তুমি নও, আমিও হয়তো মারা যেতাম।'

'ড্যাডি, পাউলার এই কথা কি সত্যি?' বাবার দিকে তাকাল মলি। 'আমি তোমার একমাত্র সন্তান। এভাবে তুমি আমার মারা যাবার ঝুঁকি নিতে পারো?'

মেয়ের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন রডনি বুমার। 'তুমি পরিবার ছেড়ে চলে গেছ, মলি। আমার কাছে তোমার কোন অস্তিত্ব নেই। যদি ফিরে আসো, যদি অনুগত হও, এ-ধরনের ঝুঁকি অবশ্যই আমি আর নেব না।'

ছয়

কানাডার অটোয়ায় এসে 'এনভায়রনমেন্ট কানাডা'-র ডিরেক্টর ম্যাকআর্থারের সঙ্গে আলাপ করল রানা। ভদ্রলোক ওর পূর্ব-পরিচিত। কি বিষয়ে কথা বলতে চায় আগেই তা টেলিফোনে জানিয়েছে, ফলে দেখা হবার পর সরাসরি প্রসঙ্গটা তোলা গেল। রানা সংক্ষেপে পরিস্থিতি বর্ণনা দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করল, ক্যান্ডি দ্বীপে যে মাইনিং অপারেশন চলছে সেটার ধরন-ধারণ তদন্ত করে দেখতে চায় ও।

ম্যাকআর্থার জানালেন, ক্যান্ডিকে নিয়ে তাঁরাও খুব চিন্তিত। মেইন ল্যান্ড থেকে বহু দূরে দ্বীপটা, সেজন্যে ভালভাবে খোঁজ নেয়া যাচ্ছে না। পানামা সিটিতে একটা তদন্তকারী দলকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তারা তেমন সুবিধে করতে পারছে না। রানা তদন্ত করতে চাইলে তাঁদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে এনভায়রনমেন্ট কানাডার সঙ্গে রানাকে একটা চুক্তিতে আসতে হবে। তাঁদের কাছে রিপোর্ট আছে, ক্যান্ডিতে নাকি চীন আর বাংলাদেশী শ্রমিকদের লেবার পেভ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপর তিনি জানতে চাইলেন; রানা কি একা যেতে চায়, নাকি ওর সঙ্গে নুমার কোন এজেন্ট থাকবে? রানা বলল, নুমা ব্যাপারটার সঙ্গে এখুনি জড়াতে চাইছে না, কাজেই রানা এজেন্সির তরফ থেকে একাই যেতে হবে ওকে। তখন ম্যাকআর্থার বললেন, 'এনভায়রনমেন্ট কানাডার প্রতিনিধি হিসেবে ক্যান্ডির চারধারের কেল্প ফরেস্ট পরীক্ষা করতে যাবেন আপনি। আমি আপনাকে দু'জন লোকের নাম বলছি, ইচ্ছে করলে এদের সাহায্য নিতে পারবেন।'

একজনের নাম ইকলাম তানাবু, ক্যান্ডির কাছাকাছি মোসাবি দ্বীপের বাসিন্দা। এনভায়রনমেন্ট কানাডা-র তরফ থেকে কয়েকটা প্রজেক্টে আগেও সে কাজ করছে। আদিবাসী, তবে খুবই সাহসী আর যোগ্য, বিশ্বস্তও বটে। রানা জানতে চাইল, সে কি জেলে? ম্যাকআর্থার হেসে ফেলে বললেন, 'না, তানাবু টোটেম পোল বানায়।' কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, দেখা করে কি বলতে হবে সব তিনি জানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় লোকটার নাম জেমস রুবেন। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস, ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেকটরিট-এর একজন এজেন্ট।

এই মুহূর্তে পানামায় আছে সে। তাকে একটা চিঠি লিখলেন এনভায়রনমেন্ট কানাডার ডিরেক্টর, এনভেলাপটা নিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা।

লাল একটা ফ্লোটপ্লেন, গায়ে সাদা হরফে লেখা চিনুক কার্গো ক্যারিয়ার, একটা রিফুয়েলিং ডক-এর পাশে দোল খাচ্ছে পানিতে। পানামা সিটি এয়ারপোর্ট এখান থেকে একদম কাছে। ফ্লোটপ্লেনের উইং ট্যাঙ্কে গ্যাস ভরছে এক লোক–হালকা-

পাতলা শরীর, সরল ও আত্মভোলা টাইপের চেহারা। পরনে লেদার ফ্লাইট সুট। মুখ তুলে তাকাল সে, ডক ধরে এগিয়ে আসা আগন্তুককে দেখতে পেল।

আগন্তুকের পিঠে কালো একটা কেস, পরনে জিনস আর টি-শার্ট, মাথায় কাউবয় হ্যাট। এয়ারক্রাফটার পাশে এসে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, 'জেমস রুবেন?'

কথা না বলে এক গাল হাসল লোকটা, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'মাসুদ রানা,' বলল আগন্তুক, পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বাড়িয়ে ধরল।

এনভেলাপ খুলে চিঠিটা পড়ল রুবেন। হ্যান্ডশেক করার সময় বলল, 'ফোনে এনভায়রনমেন্ট কানাডার চীফ আর্থার ম্যাকআর্থার সব আমাকে জানিয়েছেন। আপনি টোটেম কার্ভার ইকলাম তানাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কোথায় পাব তাকে?'

'তানাবু ইসাবেলা দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা, সর্বদক্ষিণের একটা দ্বীপে থাকে—মোসাবি আইল্যান্ডে।'

'কতক্ষণের ফ্লাইট?'

'দেড় ঘণ্টা, লাঞ্চের আগেই পৌঁছে যাব,' বলে রানার ব্যাকপ্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল রুবেন। 'ওটায় কি আছে?'

'একটা হাইড্রোফোন, পানির তলায় শব্দ পরিমাপ করার একটা যন্ত্র।' ফ্লোটপ্লেনটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। ধারণা করল, সম্ভবত সত্তর দশকে তৈরি। 'ডি হ্যাভিল্যান্ড, তাই না।'

'ডি হ্যাভিল্যান্ড বিভার। উনসত্তরে কানাডায় তৈরি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বুশ প্লেন। একশো মিটার পানি পেলেই টেক অফ করা যায়।'

'আজকাল বড় আকারের রেডিয়াল এঞ্জিন খুব কমই দেখা যায়।'

'উঠে পড়ুন, মি. রানা,' গ্যাস ভরা শেষ করে বলল রুবেন। মুরিং লাইনস খুলে প্লেনটাকে এক পায়ে ঠেলে ডক থেকে দূরে সরাল সে, তারপর ককপিটের দিকে এগোল। 'কার্গো সেকশনে কোন সীট নেই, কাজেই আপনাকেও সামনে, অর্থাৎ কো-পাইলটের সীটে বসতে হবে। আপনি কি ফ্লায়ার?'

'প্রফেশনাল নই,' জবাব দিল রানা।

চ্যানেলের কোথাও বোট বা প্লেন আছে কিনা দেখে নিল রুবেন, তারপর থ্রটল নামিয়ে আকাশে তুলল বিভার ফ্লোটপ্লেন, ইসাবেলা দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাচ্ছে।

'ইন্সপেক্টর রুবেন,' আলাপ শুরু করল রানা। 'একটা ব্যাপার আমার বোধগম্য হয়নি। আপনি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স-এর লোক, এনভায়রনমেন্ট কানাডা আমাকে আপনার কাছে পাঠাল কেন?'

'কারণ গত নয় মাস ধরে একটা টীম নিয়ে আমি বুমার কোম্পানীর ক্যান্ডি মাইনের ওপর নজর রাখছি।'

'বিশেষ কোন কারণ আছে?'

'অবৈধ অভিবাসন। আমাদের সন্দেহ, ক্যান্ডি দ্বীপে চীনা আর বাংলাদেশী শ্রমিক পাচার হচ্ছে।'

'ক্যান্ডি আপনাদের দ্বীপ। আপনি কানাডিয়ান ল এনফোর্সমেন্টের প্রতিনিধি।

সরাসরি ওখানে গিয়ে কাগজ-পত্র দেখতে চাইলেই তো পারেন।'

'বুমার আমাদের পার্লামেন্টের অনেক সদস্য আর আমলাকে কিনে রেখেছেন। ক্যান্ডিতে গিয়ে তদন্ত করতে চাইলেই প্রথমশ্রেণীর আইন ব্যবসায়ীরা লিগ্যাল রোডব্লক খাড়া করে বাধা দেয়। ডকুমেন্টেড প্রুফ ছাড়া কিছু করা যাবে না।'

'বোকার মত কেন আমার মনে হচ্ছে যে সুযোগ পেয়ে আপনারা আমাকে ব্যবহার করছেন?'

'আপনার আবির্ভাব সত্যি একটা সুযোগ এনে দিয়েছে, অন্তত মাউন্টেড পুলিসকে।'

'অনুমান করতে দিন। মাউন্টেড পুলিস যেখানে যেতে সাহস পায় না, আপনারা আশা করছেন আমি সেখানে যাব।'

'আপনি একজন বিদেশী, ধরা পড়লে বড় জোর আপনাকে বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু আমাদের বেলায় ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে রাজনৈতিক বিপর্যয়। আমাকে, আমার টীমের সদস্যকে, পেনশনের কথা ভাবতে হয়।'

'বাহ্, দারুণ।'

'যদি বলেন, আপনাকে আমি পানামা সিটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'উঁহুঁ, না। প্যাসিফিকে মানুষ মরছে। আমাকে জানতে হবে সেজন্যে বুমারের মাইনিং অপারেশন দায়ী কিনা।'

'আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে, জাহাজ আর দ্বীপ অজ্ঞাত অ্যাকুসটিক প্লেগে আক্রান্ত হচ্ছে। আমাকে আরও বলা হয়েছে, আপনি স্বদেশী শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন। ভাল কথা, মি. রানা, আপনার প্ল্যানটা কি?'

'খুব সহজ,' বলল রানা। 'চুপি চুপি মাইনে ঢুকতে চাই। গাইড হিসেবে ভাড়া করব তানাবুকে, সে আমাকে দ্বীপটায় পৌঁছে দেবে। অবশ্য সে যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়।'

'তানাবুকে যদি চিনে থাকি, প্রস্তাবটা লুফে নেবে। কারণ আছে।'

কারণটা ব্যাখ্যা করল রুবেন। বছরখানেক আগে ক্যান্ডির কাছাকাছি মাছ ধরছিল তানাবুর ভাই সলেবু। বুমার কোম্পানীর একটা সিকিউরিটি বোট এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে তাকে। সে রাজি হয়নি, কারণ তাদের পরিবার বহু যুগ ধরে ওখানে মাছ ধরছে। বুমারের লোকজন তাকে মারধর করে, বোটটাও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস তদন্ত করতে গেলে বলা হলো, সলেবুর বোট বিস্ফোরিত হয়, বুমার কোম্পানীর লোকজন তাকে সাগর থেকে উদ্ধার করে।

'আমি আপনাদের সাহায্য নিচ্ছি,' রুবেন থামার পর বলল রানা। 'আপনারা আমার কাছ থেকে কি সাহায্য আশা করেন?'

জানালা দিয়ে জঙ্গল ঢাকা একটা দ্বীপ দেখাল রুবেন রানাকে, মাঝখানে কালো একটা দাগ। 'ক্যান্ডি দ্বীপ। ওখানে ওরা ছোট একটা এয়ারপোর্ট তৈরি করেছে। এঞ্জিনের সমস্যা দেখা দিয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে ল্যান্ড করব ওখানে। আমি মেরামতের ভান করব, আপনি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনিয়ে সিকিউরিটি গার্ডদের মনোযোগ ধরে রাখবেন।'

'কি লাভ তাতে? আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'ল্যান্ড করতে চাওয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে। একটা হলো, ফ্লোটে ফিট করা ক্যামেরা দিয়ে ল্যান্ডিং আর টেক-অফ করার সময় ক্লোজ-আপ ছবি তোলা।'

'অনিমন্ত্রিত ভিজিটর ওরা পছন্দ করে না,' বলল রানা। 'খেপে গিয়ে যদি খারাপ কিছু ঘটিয়ে বসে? ধরুন, আহত করল?'

'দ্বিতীয় কারণ হলো,' রানার প্রতিবাদ গ্রাহ্য করছে না রুবেন, 'আমার বস্ চাইছেন এ-ধরনের কিছু একটা ঘটুক, তাহলে দলবেঁধে ছুটে আসতে পারবেন, বন্ধ করে দেবেন মাইনিং অপারেশন, লীজ বাতিল করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'হুম।'

'তৃতীয় কারণ, মাইনে আমাদের একজন আন্ডারকাভার এজেন্ট কাজ করছে। ওখানে ল্যান্ড করতে পারলে সে হয়তো কোন তথ্য পাচার করতে পারবে।'

'আমাদের মাথায় কুবুদ্ধি গিজগিজ করছে।'

'যদি দেখি মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, নিজের পরিচয় দেব আমি,' বলল রুবেন। 'ওরা আমার লাশ গুম করার ঝুঁকি নেবে না।'

'আপনার টীম আর অফিস জানে আমরা কি করতে যাচ্ছি?'

আহত দেখাল রুবেনকে। 'আমরা নিখোঁজ হলে কাগজের সান্ধ্য সংস্করণে খবরটা অবশ্যই ছাপা হবে। চিন্তা করবেন না, বুমার মাইনের অফিসাররা অপপ্রচারকে সাংঘাতিক ভয় পায়।'

'মিরাকলটা কখন আমরা ঘটাচ্ছি?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা।

দ্বীপটার দিকে আবার ইঙ্গিত করল রুবেন। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামছি ওখানে।'

নিচের দৃশ্য উপভোগ করা ছাড়া রানার কোন কাজ নেই। মোচা আকৃতির ভলক্যানিক কোন্ দেখতে পাচ্ছে ও, বিশাল গহ্বর, নীল মাটির সেন্ট্রাল পাইপ সহ। এই নীল মাটিতেই হীরে থাকে। খোলা গহ্বরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ইস্পাতের দৈত্যাকার কড়ি দিয়ে তৈরি ব্রিজ রয়েছে। ব্রিজ থেকে ঝুলছে অসংখ্য স্টীল কেবল, শেষ মাথায় বালতি, খুঁড়ে রাখা পাথর আর মাটি তুলে আনছে। চূড়ায় উঠে আসার পর বালতিগুলো আড়াআড়িভাবে এগোচ্ছে, ঢুকে পড়ছে কয়েকটা বিল্ডিঙের ভেতর, ওখানে ওর থেকে হীরে বের করা হবে। বালতিগুলোর কাজ এখানেই শেষ হচ্ছে না, বাতিল ওর বা আবর্জনা তুলে এনে ফেলা হচ্ছে আগ্নেয়গিরির চারধারে, ফলে পাহাড়ের মতই উঁচু স্তূপ তৈরি হয়েছে–খনি এলাকায় ঢোকা বা বেরুনোর পথে ওগুলো বিরাট বাধা বলে মনে হলো রানার। একটাই মাত্র রাস্তা দেখতে পেল ও–রাস্তা থেকে শুরু হয়েছে টানেলটা, রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে ছোট বে-র একটা ডক-এ। ম্যাপ দেখে আগেই জেনেছে ও, বে-র নাম রোজ হারবার। এই মুহূর্তে একটা টাগ দেখা গেল, খালি একটা বার্জকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ডক থেকে।

আকাশ ছোঁয়া স্তূপ আর গহ্বরের মাঝখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আট-দশটা প্রিফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং, অফিসার আর মাইনারদের লিভিং কোয়ার্টার। আবর্জনার স্তূপ দিয়ে ঘেরা জায়গাটা ডায়ামিটারে দুই কিলোমিটারের মত হবে,

ভেতরে হ্যাঙ্গার সহ সরু এয়ারস্ট্রিপও রয়েছে। আকাশ থেকে গোটা মাইনিং অপারেশনকে দেখতে লাগে প্রকাণ্ড একটা দাগের মত।

একটু পরই ফ্লোটপ্লেনের এঞ্জিন ব্যাকফায়ার শুরু করল, রুবেন নিশ্চয়ই কোন কারিগরি ফলিয়েছে। এরইমধ্যে রেডিওর মাধ্যমে সাবধান করা হলো—এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, দূরে সরে থাকো।

জবাবে রুবেন বলল, 'ফুয়েল ব্লকেজের শিকার আমরা, ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিঙের জন্যে তোমাদের এয়ারস্ট্রিপ ব্যবহার না করে উপায় নেই।' রেডিও বন্ধ করে দিল সে।

এয়ারস্ট্রিপে নামল প্লেন। পুরোপুরি থামেনি, তার আগেই নীল ফেটিগ পরা দশজন লোক ঘিরে ফেলল ওটাকে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে এম-সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল, সাপ্রেসর সহ। দীর্ঘদেহী এক লোক, ডাকাতের মত চেহারা, মাথায় কমব্যাট হেলমেট, হেঁটে এসে ফ্লোটের দরজা খুলল। প্লেনে ঢুকে ককপিটের দিকে এগোল সে। রানা লক্ষ করল, গার্ডের হাত হোলস্টারে ভরা নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিকের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'এটা প্রাইভেট প্রপার্টি,' হালকা সুরে বলল সে। 'আপনারা অনধিকার প্রবেশ করেছেন।'

'সরি,' বলল রুবেন। 'আমাদের ফুয়েল ফিল্টার বুজে গেছে। এ নিয়ে এ মাসে দু'বার। আজকাল গ্যাসেও ওরা ভেজাল দিচ্ছে।'

'মেরামত সেরে চলে যেতে কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট বিশেক, তার বেশি নয়।'

'প্লীজ, জলদি করুন,' সিকিউরিটি গার্ড বলল। 'আরেকটা কথা, প্লেন ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুর-ঘুর করতে পারবেন না।'

'বাথরূম ব্যবহার করতে পারি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'বাথরূম হ্যাঙ্গারে। আমার এক লোক নিয়ে যাবে আপনাকে।'

'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!' এমন ভাব করল রানা, যেন প্রকৃতির ডাকে খুব কষ্ট পাচ্ছে। লাফ দিয়ে প্লেন থেকে নামল ও, পিছু নিল একজন গার্ড।

ধাতব কাঠামোর ভেতর ঢুকে একটা জেট দেখতে পেল রানা, গালফ স্ট্রীম ভি। রানা জানে, এগারোশো মিটার উচ্চতায় ঘণ্টায় নয়শো বিশ কিলোমিটার গতিতে ছোটে ওটা, ছয় হাজার তিনশো নটিকাল মাইল রেঞ্জ। পাওয়ার সাপ্লাই দেয় বিএমডব্লিউ আর রোলস-রয়েসের বানানো টার্বো জেট। দাম প্রায় তেত্রিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

হ্যাঙ্গারের মূল গেটের ঠিক সামনে আরও রয়েছে এক জোড়া হেলিকপ্টার। এগুলোও চিনতে পারল রানা। ম্যাকডোনেল ডগলাস ফাইভথ্রীজিরো এমডি ডিফেন্ডার। মিলিটারি এয়ারক্রাফট, সন্দেহ নেই। ফিউজিলাজের নিচে পড়ে বসানো রয়েছে এক জোড়া করে ৭.৬২ মিলিমিটার কামান। ককপিটের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে ট্র্যাকিং গিয়ার। এই হেলিকপ্টারগুলো স্কাউট মডেল, ডায়মন্ড স্মাগলার আর অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের ধাওয়া করার জন্যে বিশেষ ভাবে মডিফাই করা।

বাথরূম থেকে বেরুবার পর ইঙ্গিতে একটা অফিস দেখাল গার্ড। ডেস্কের পিছনে বসে থাকা লোকটা লম্বা আর রোগা। মুখে শয়তানের ঠাণ্ডা হাসি। পরে

আছে হালকা নীল সুট। চোখ দুটো কোটরের এত গভীরে, ভাষা ঠিক পড়া যায় না। 'আমি রবার্ট হল্ট, এই মাইনের সিকিউরিটি চীফ,' রানাকে বলল সে, অস্ট্রেলিয়ান বাচনভঙ্গি। 'পরিচয়-পত্র দেখাতে পারেন, প্লীজ?'

কথা না বলে রানা এজেন্সির আইডি বের করল রানা।

'মাসুদ রানা, মাসুদ রানা,' কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে দু'বার উচ্চারণ করল হল্ট। 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, কেমন? ক্যান্ডিতে কেন এসেছেন?'

'আপনি বরং পাইলটকে জিজ্ঞেস করুন। আপনাদের রত্ন ভাণ্ডারে তিনিই ল্যান্ড করেছেন। আমি স্রেফ নিরীহ প্যাসেঞ্জার।'

'জেমস রুবেন রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিসের একজন ইন্সপেক্টর, সেই সঙ্গে তিনি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরিটের একজন সদস্যও।' কমপিউটরের দিকে ইঙ্গিত করল হল্ট। 'তার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমার জানা আছে। প্রশ্ন উঠছে আপনাকে নিয়ে।'

'কানাডা সরকারের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে,' বলল রানা। 'কাজেই ধরে নিচ্ছি যে আমার সম্পর্কেও ইতিমধ্যে অনেক কিছু জেনেছেন আপনারা। এই এলাকায় আমার আসার কারণ লোকাল কেল্প আর ফিশ পপুলেশন স্টাডি করা, রাসায়নিক দূষণের মাত্রা পরিমাপ করা। আপনি আমার আরও কাগজ-পত্র দেখতে চান? আমি এনভায়রনমেন্ট কানাডার একজন সদস্য।'

'ও-সবের কপি এরইমধ্যে আমার হাতে এসেছে।'

রানা ধরে নিল, হল্ট মিথ্যে কথা বলছে। এনভায়রনমেন্ট কানাডার চীফ ডগলাস ম্যাকআর্থার ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। 'তাহলে প্রশ্ন করছেন কেন?'

'দেখলাম মিথ্যে তথ্য দেন কিনা।'

'ভয়ঙ্কর কোন অপরাধ করেছি বলে সন্দেহ করছেন আমাকে?'

'আমার কাজ স্মাগলার পাকড়াও করা,' বলল হল্ট। 'এখানে আপনার আসাটা সন্দেহজনক, কাজেই আপনার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা দেখতে হবে আমাকে।'

অফিসটা কাঁচ ঘেরা, ভেতরে দাঁড়ানো গার্ডের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে কাঁচে। ওর একটু ডান দিকে আর পিছনে রয়েছে লোকটা। 'আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর আমাকে ডায়মন্ড স্মাগলার মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে না।' চেয়ার ছাড়ল ও। 'আলাপটা উপভোগ করলাম, তবে এবার আমাকে উঠতে হয়।'

'সত্যি দুঃখিত,' বলল হল্ট। এখন সে হাসছে না। 'আপনাকে আপাতত আটক করা হলো।'

'সে অধিকার আপনার নেই।'

'আছে। প্রাইভেট প্রপার্টিতে বেআইনী অনুপ্রবেশের অভিযোগে একজন সিটিজেন হিসেবে অবশ্যই আপনাকে আমি গ্রেফতার করতে পারি।'

পরিস্থিতি সুবিধের নয়। মর্নিং রোজ খুঁজে পেয়েছে ও, রডনি বুমারের মেয়ে মলি আর তার প্রেমিকা পাউলাকে উদ্ধার করেছে, এ-সব যদি হল্ট জানতে পারে,

কোন মিথ্যে দিয়েই এখানে ওর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যাবে না। 'রুবেন সম্পর্কে কি ভাবছেন? আপনি যখন জানেনই যে তিনি আইনের লোক, আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলে অসুবিধে কি?'

'আমি তাঁর সুপিরিয়ারদের হাতে আপনাকে তুলে দিতে চাই,' বলে হাসল হল্ট। 'তবে তার আগে গোটা ব্যাপারটা আমি নিজে আরও ভালভাবে তদন্ত করব।'

রানার সন্দেহ হচ্ছে, প্রাণ নিয়ে ওকে ফিরতে দেয়া হবে না। 'আর রুবেন? তাকে কি আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'প্লেন তো আর সত্যি সত্যি নষ্ট হয়নি। যখন খুশি চলে যেতে পারেন উনি।'

'আমাকে আটক করা হলে ফিরে গিয়ে উনি রিপোর্ট করবেন।'

'জানা কথা।'

বাইরে থেকে একটা প্লেন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ ভেসে এল। রানাকে না নিয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে রুবেন। প্রাণ বাঁচাতে হলে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে কিছু একটা করতে হবে। ডেস্কের ওপর অ্যাশট্রে আর সিগারেটের অবশিষ্টাংশ দেখে আন্দাজ করল, হল্ট ধূমপান করে। পরাজয় মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা হলো আমাকে। আমি কি সিগারেট ধরাতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলে অ্যাশট্রেটা রানার দিকে ঠেলে দিল হল্ট। 'আপনার সঙ্গে আমিও একটা ধরাই।'

সিগারেট বহু বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছে রানা, তবু বুক পকেট থেকে প্যাকেট বের করার ভান করল। হাতটা ভাঁজ করে পিছন দিকে বিদ্যুৎ বেগে কনুই চালাল ও, গার্ডের পাঁজরে লাগল সেটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে কুঁজো হয়ে গেল লোকটা। হল্টের রিফ্লেক্স সত্যি দারুণ, চোখের পলকে বেল্ট হোলস্টার থেকে ছোট নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিকটা তার হাতে চলে এল। তবে সেটার মাজল ডেস্ক টপ ছাড়িয়ে ওপরে ওঠার আগেই সে দেখতে পেল গার্ডের অটোমেটিক রাইফেল রানার হাতে চলে এসেছে, সরাসরি তার মাথার দিকে তাক করা। ধীরে ধীরে, খুবই সাবধানে, হাতের অটোমেটিকটা ডেস্কের ওপর রেখে দিল সে। তিক্ত সুরে বলল, 'এতে কোন লাভ হবে না।'

অটোমেটিকটা তুলে পকেটে ভরল রানা। 'ডিনারের জন্যে থাকতে না পারায় দুঃখিত।' পাঁজরে প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে গার্ডকে ফেলে দিল ও, ছুটে বেরিয়ে এল অফিস থেকে, বেরুবার আগে হাতের রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল কামরার এক কোণে।

অফিস থেকে বেরিয়ে শান্তভাবে হাঁটছে রানা, ছড়িয়ে থাকা গার্ডদের পাশ কাটিয়ে। তাদের চোখে সন্দেহ, তবে ধরে নিয়েছে বস্ ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে থ্রটল ওপেন করেছে রুবেন, রানওয়ে ধরে ছুটছে ফ্লোটপ্লেন। ছুটে এসে লাফ দিল রানা, একটা ফ্লোটে উঠে পড়ল, প্রপেলারের তীব্র বাতাস অগ্রাহ্য করে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল কার্গো বেতে।

রানাকে কো-পাইলটের সীটে বসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল রুবেন। 'গুড লর্ড! আপনি কোত্থেকে এলেন?'

'এয়ারপোর্টে আসার পথে ট্রাফিক জ্যামে পড়েছিলাম,' দম নিয়ে বলল রানা।

'ওরা আমাকে হুমকি দিয়ে বলল আপনাকে ছাড়াই ফিরে যেতে হবে, তা না হলে...'

'জানি। আপনার আন্ডারকাভার এজেন্টের খবর কি?'

'সে আসেনি। কি করে আসবে, প্লেনের চারধারে সিকিউরিটি এত কড়া!'

'শুনে দুঃখ পাবেন, বুমারের সিকিউরিটি চীফ রবার্ট হল্ট আপনার সম্পর্কে সব কথাই জানে,' বলল রানা।

'বুশ পাইলট হিসেবে কাভারটা বাতিল হয়ে গেল,' কন্ট্রোল কলাম টানার সময় বিড়বিড় করল রুবেন।

সাইড উইন্ডো খুলে প্রপেলারের তৈরি বাতাসে মাথা বের করল রানা, ঘাড় বাঁকা করে পিছন দিকে তাকাল। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। 'কাভার তো গেছেই, এবার প্রাণটাও না যায়।' সিকিউরিটি গার্ডরা আতঙ্কিত পিঁপড়ের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে রানার মনোযোগ অন্য দিকে।

'কেন? কি বলছেন?'

'ওরা খেপে গেছে।'

'কি করে এসেছেন বলুন তো?'

জানালাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'একজন গার্ডকে মারধর করেছি, আর সিকিউরিটি চীফের সাইড আর্মটা কেড়ে এনেছি।'

'শোনা যায়, এরচেয়ে অনেক হালকা অপরাধে মানুষকে মেরে ফেলে ওরা।'

'ওদের একটা সামরিক হেলিকপ্টার আকাশে উঠছে।'

'সেরেছে!' মুখ শুকিয়ে গেল রুবেনের। 'আমার এই পুরানো বাসের চেয়ে ওটার স্পীড চল্লিশ নট বেশি। আমরা পানামায় পৌঁছুবার আগেই ওরা আমাদেরকে ধরে ফেলবে।'

'সাক্ষীদের সামনে ওরা আমাদেরকে গুলি করে ফেলে দিতে পারবে না,' বলল রানা। 'লোকবসতি আছে এমন দ্বীপ কোনটা কাছে?'

'মোসাবি,' বলল রুবেন। 'তানাবুর দ্বীপ। ওদের গ্রামের মাঝখানে ওয়াটার ল্যান্ডিং সম্ভব, এক ঝাঁক নৌকোর পাশে। অবশ্য যদি হেলিকপ্টারের চেয়ে আগে পৌঁছুতে পারি।'

ভয় আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে রানার চোখ। 'চেষ্টা করুন।'

সাত

রানা ও রুবেন দু'জনেই সচেতন, শুরু থেকেই পরিস্থিতি ওদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে প্লেন ঘোরাতে বাধ্য হলো ওরা, ছুটে চলেছে মোসাবি দ্বীপের দিকে। ম্যাকডোনেল ডগলাস ডিফেন্ডার হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গারের সামনে থেকে প্রায় খাড়াভাবে আকাশে উঠল, ভেতরে রডনি বুমারের সিকিউরিটি গার্ডরা রয়েছে, দক্ষিণ-পুব দিকে ঘুরে ধাওয়া শুরু করল। মন্থরগতি ফ্লোটপ্লেনের পিছনে চলে আসতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ওটার।

বিভারের এয়ারস্পীড ইন্ডিকেটর একশো ষাট নটের ঘরে, অথচ রুবেনের মনে হলো একটা গ্লাইডার চালাচ্ছে সে। 'কোথায় ওরা?' সামনে একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছে সে, পাহাড়গুলো জঙ্গলে ঢাকা। সে জানে, দ্বীপটায় কোন মানুষ বাস করে না। পানি থেকে মাত্র একশো মিটার ওপর দিয়ে প্লেন চালাচ্ছে সে, অন্য কোন দিকে তাকাতে পারছে না।

'আমাদের আধ কিলোমিটার পিছন,' বলল রানা। 'প্রতি সেকেন্ডে আরও কাছে চলে আসছে।'

'একটাই?'

'হ্যাঁ। আপনার এই অ্যান্টিকে কোন অস্ত্র আছে?'

'রাখার নিয়ম নেই।'

'ফ্লোটের ভেতর একটা শটগান লুকিয়ে রাখলে ভাল করতেন।'

'বেঁচে থাকলে কথাটা মনে রাখব।'

'হেলিকপ্টারে দুটো হেভি মেশিন গান রয়েছে,' বলল রানা। 'আর আমার কাছে রয়েছে চুরি করা একটা নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক। তবু আমি হতাশ নই।'

'কি বললেন?'

'আমি একবার একটা কপ্টার নামিয়ে ছিলাম, রোটরে লাইফ র‍্যাফট বা ভেলা ছুঁড়ে দিয়ে।'

'দুঃখিত, একজোড়া লাইফ ভেস্ট ছাড়া কার্গো বেতে আর কিছু নেই,' বলল রুবেন।

'আমাদের স্টারবোর্ড সাইডে সরে যাচ্ছে ওরা, গুলি করতে সুবিধে হবে ভেবে। আমি বললেই ফ্ল্যাপ নামিয়ে থ্রটল টানবেন।'

'এই অলটিচ্যুডে স্থির হলে পরে আর প্লেন তুলতে পারব না।'

'সিদ্ধান্ত নিন, খুলিতে গুলি খেয়ে আগুনে পুড়ে মরবেন, নাকি পানিতে বা গাছপালার মাথায় পড়ার ঝুঁকি নেবেন?'

'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, ব্লু-ব্ল্যাক হেলিকপ্টার ফ্লোটপ্লেনের পাশে, সমান্তরাল রেখার ওপর চলে এল, মনে হলো ঝুলে আছে ওখানে, যেন একটা বাজপাখি কবুতরের দিকে তাকিয়ে আছে। এত কাছে ওরা, পাইলট আর কো-পাইলটের হাসি ভরা গোলগাল মুখ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। সাইড উইন্ডো আবার খুলল রানা, ফ্রেমের নিচে লুকিয়ে রেখেছে অটোমেটিকটা।

'রেডিওতে কোন ওয়ার্নিং নেই,' রুবেনের গলায় অবিশ্বাস। 'একবারও বলছে না মাইনে ফিরে যেতে হবে।'

'ব্যাপারটা সত্যি সিরিয়াস,' বলল রানা। 'রডনি ঘুমারের হুকুম না পেলে মাউন্টেড পুলিসের একজন ইন্সপেক্টরকে ওরা খুন করতে চাইবে না।'

'ওরা কি ভাবছে খুন করে পার পাবে? আমি বিশ্বাস করি না।'

'চেষ্টা করবে, কোন সন্দেহ নেই।' রানা একদম শান্ত, ওর দৃষ্টি গানারের

ওপর চুম্বকের মত আটকে আছে। 'তৈরি থাকুন।' হাল ছাড়তে রাজি না হলেও, মোটেও আশাবাদী নয় ও। একটাই সুবিধে পাবে ওরা, যেটাকে আসলে কোন সুবিধেই বলা যায় না–ডিফেন্ডার হেলিকপ্টার এয়ার-টু-এয়ার কমব্যাটের চেয়ে গ্রাউন্ড-টু-এয়ার অ্যাটাকে ভাল করে।

রুবেন কন্ট্রোল কলাম দুই হাঁটুর মাঝখানে আটকে রেখেছে, এক হাতে ধরে আছে ফ্ল্যাপ লিভার, অপর হাতের মুঠোয় থ্রটল। নিজেকে সে প্রশ্ন করছে, পরিচয় হয়েছে দু'ঘণ্টাও হয়নি এমন একজন লোকের ওপর এতটা আস্থা রাখার কি কারণ তার? উত্তরটা সহজ। এত বছর পুলিসে চাকরি করছে, কখনও দেখেনি চরম বিপদের মুখে কোন মানুষ এতটা শান্ত থাকতে পারে। আর রানাকে শুধু শান্ত মনে হচ্ছে না, সে তার সমস্ত মেধা আর মনোযোগ কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতিটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করছে।

'নাউ!' চেঁচিয়ে বলল রানা, নিঃশ্বাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই অটোমেটিক তুলে ফায়ার করল।

ফ্ল্যাপগুলো ডাউন পজিশনে পুরোটা ঠেলে দিল রুবেন, হ্যাঁচকা টান দিল থ্রটলেও। মান্ধাতা আমলের বিভার এঞ্জিনের শক্তি হারিয়ে, ফ্লোটগুলো তীব্র বাতাসের ধাক্কা খেয়ে, এমন আচমকা গতি হারাল যেন আঠার মেঘে ঢুকে পড়েছে। প্রায় ওই একই মুহূর্তে মেশিন গানের বিরতিহীন গর্জন আর একটা ডানা ঝাঁঝরা হবার আওয়াজ শুনতে পেল রুবেন। রানার হাতে অটোমেটিক তীক্ষ্ণ আওয়াজ করল, তা-ও সে শুনতে পেয়েছে। এটা কোন যুদ্ধই নয়, উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে প্রায় স্থির প্লেনটাকে বাতাসে ঘোরাবার সময় ভাবল সে–এ যেন বিশ্বকাপে জার্মানীর গোটা ডিফেন্স লাইনের সামনে একা ম্যারাডোনাকে দাঁড়াতে হয়েছে। তারপর হঠাৎ, অজ্ঞাত কোন কারণে, মেশিন গানের গর্জন থেমে গেল। প্লেনের নাক নিচু হচ্ছিল, খানিকটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে থ্রটল সামনে ঠেলল সে।

ফ্লোটপ্লেন সিধে করে নিয়ে স্পীড তোলার সময় আড়চোখে একবার তাকাল রুবেন। হেলিকপ্টার কাত হয়ে আরেকদিকে সরে গেছে। ককপিটের প্লাস্টিক বুদ্বুদে কয়েকটা বুলেট হোল দেখা যাচ্ছে, ওটার পিছনে নিজের সীটে ঢলে পড়েছে কো-পাইলট। বিভার এখনও তার নির্দেশ মেনে চলছে দেখে বিস্মিত হলো রুবেন। আরও বিস্মিত হলো রানার মুখভাব লক্ষ করে। হতাশায় অন্ধকার হয়ে আছে চেহারা।

'দূর, দূর, দূর,' বিড়বিড় করছে রানা। 'মিস করেছি!'

'কি বলছেন আপনি? কো-পাইলটকে তো লাগিয়েছেন।'

নিজের ওপর রেগে আছে রানা, ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল। 'নিশানা করেছিলাম রোটর অ্যাসেমব্লিতে।'

'আপনার টাইমিংটা খুব নিখুঁত হয়েছে,' প্রশংসা করল রুবেন। 'আমাকে সঙ্কেত দেয়ার ঠিক সময়টি কি ভাবে টের পেলেন?'

'পাইলটের মুখে থেমে গেল হাসিটা।'

রুবেন তর্কের মধ্যে গেল না। ঝড় থেকে এখনও বেরুতে পারেনি ওরা। প্লেন ইসাবেলা দ্বীপপুঞ্জের ওপর চলে এলেও, তানাবুর গ্রাম এখনও ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

'আবার দূরত্ব কমিয়ে আনছে ওরা,' বলল রানা।

'একই কৌশলে দ্বিতীয়বার কাজ না-ও হতে পারে।'

'আমি একমত। পাইলট তৈরি থাকবে। এবার আপনি কন্ট্রোল কলাম টেনে এনে ইমেলম্যান জাদু দেখাবেন।'

'ইমেলম্যান আবার কি?'

রুবেনের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি জানেন না? কত দিন প্লেন চালাচ্ছেন, ফর গড'স্ সেক?'

'কমবেশি একুশ ঘণ্টা।'

'গ্রেট!' গুঙিয়ে উঠল রানা। 'প্রথমে একটা হাফ লূপ তৈরি করবেন, তারপর একটা হাফ রোল, অ্যাকশন শেষে দেখা যাবে উল্টোদিকে ছুটছে প্লেন।'

'বলছেন যখন, চেষ্টা করে দেখতে পারি, তবে পারব কিনা জানি না।'

'কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিসে কোয়ালিফায়েড-প্রফেশনাল পাইলট নেই?'

'এই অ্যাসাইনমেন্টে যাদেরকে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে নেই,' বলল রুবেন, আড়ষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। 'কি মনে হয়, এবার আপনি কপ্টারের ভাইটাল কোন পার্টসে গুলি লাগাতে পারবেন?'

'ভাগ্য অতি প্রসন্ন হলে পারব,' বলল রানা। 'আর মাত্র তিন রাউন্ড গুলি আছে।'

ডিফেন্ডারের পাইলটের আচরণে কোন ইতস্তত ভাব নেই। সরাসরি অ্যাটাক করার জন্যে অসহায় ফ্লোটপ্লেনের ওপরে এবং এক পাশে চলে আসছে সে। তার হামলার প্ল্যানটা খুবই ভাল, নড়াচড়ার জন্যে রুবেনকে খুব বেশি জায়গা দিতে রাজি নয়।

'নাউ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'স্পীড বাড়াবার জন্যে নাক নিচু করুন, তারপর লূপ তৈরির জন্যে ওপরে উঠুন।'

অভিজ্ঞতা না থাকায় ইতস্তত করছে রুবেন। হাফ রোল-এর প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে লূপের মাথায় মাত্র উঠে আসছে, এই সময় ৭·৬২ মিলিমিটার শেল ফ্লোটপ্লেনের পাতলা অ্যালুমিনিয়াম ঝাঁঝরা করতে শুরু করল। হাজার টুকরো হয়ে গেল উইন্ডশীল্ড, ইন্সট্রুমেন্টাল প্যানেলে হাতুড়ির বাড়ি মারছে অসংখ্য শেল। ডিফেন্ডারের পাইলট ককপিটকে বাদ দিয়ে ফিউজিলাজে লক্ষ্যস্থির করল। তার এই ভুলটাই বিভারকে ভাসিয়ে রাখল বাতাসে। তার উচিত ছিল এঞ্জিন উড়িয়ে দেয়া।

শেষ তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা নিচু করল রানা, নিজেকে যতটা সম্ভব ছোট টার্গেটে পরিণত করতে চাইছে।

দেরি হলেও, রুবেন ইমেলম্যান সম্পূর্ণ করেছে। এই মুহূর্তে হেলিকপ্টারের উল্টোদিকে ছুটছে বিভার। ধাওয়া করতে হলে ডিফেন্ডারের পাইলটকে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক ঘুরতে হবে। মাথা ঝাঁকাল রানা, আচ্ছন্নবোধ করছে। জখমের খোঁজে শরীরটা পরীক্ষা করল ও। অদ্ভুত ব্যাপার, দু'এক জায়গার চামড়া জ্বালা করলেও, কোথাও রক্ত বেরোয়নি বা কোন হাড়ও ভাঙেনি। বিভার লেভেল ফ্লাইটে রয়েছে, রেডিয়াল এঞ্জিনের গর্জনেও কোন ছন্দপতন ঘটছে না। এঞ্জিনটাই প্লেনের একমাত্র অংশ যেখানে কোন বুলেট লাগেনি। রুবেনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'কেমন আছেন?'

ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল বটে রুবেন, কিন্তু চোখে শূন্য দৃষ্টি, বোধহয় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। 'শালারা বোধহয় আমাকে পেনশন পেতে দিল না,' বিড়বিড় করল সে। তারপর কাশল। ঠোঁট জোড়া রাঙা হয়ে গেল, চিবুক হয়ে বুকে গড়িয়ে পড়ল খানিকটা রক্ত। তারপর সামনের দিকে ঢলে পড়ল, জ্ঞান হারিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কো-পাইলটের হুইল হাতে নিল রানা, ফ্লোটপ্লেনকে একশো আশি ডিগ্রী ঘুরিয়ে নিয়ে আবার রওনা হলো মোসাবির দিকে। ওর এই অকস্মাৎ বাঁক ঘোরা ডিফেন্ডারের পাইলটকে হতচকিত করে তুলল, ফলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো সে, এক ঝাঁক বুলেট বৃষ্টি হলো ফ্লোটপ্লেনের লেজের পিছনে খালি বাতাসে।

ফ্লোটপ্লেনের সারা গায়ে একশোরও বেশি বুলেটের ফোঁড় তৈরি হয়েছে, তবে কন্ট্রোল সিস্টেম আর সারফেস এখনও পুরোপুরি অক্ষত, আর এঞ্জিনটাও পুরো দমে চলছে।

প্রশ্ন হলো, এখন কি করবে রানা। সন্দেহ নেই এটা অসম যুদ্ধ। ওর কাছে কোন অস্ত্রই নেই। ডিফেন্ডার সামরিক কপ্টার, ওটার তুলনায় ফ্লোটপ্লেনকে ভঙ্গুর খেলনা ছাড়া কি বলা যায়। প্রথমে রানা ভাবল, প্লেনটা দিয়ে ডিফেন্ডারকে ধাক্কা মারলে কেমন হয়? মরতে তো এমনিতেই হবে, প্রতিপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে তবু একটা সান্ত্বনা থাকে। তারপর মনে সন্দেহ জাগল। বিশাল পন্টুনগুলো থাকায় বিভারের ওজন অনেক বেশি, এদিক ওদিক করতে সময় নেয়, তার তুলনায় ডিফেন্ডার বাতাসে অনেক স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে। ফ্লোটপ্লেনকে সরাসরি ছুটে আসতে দেখলে ডিফেন্ডারের পাইলট বাউলি কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, এবং সম্ভবত সফলও হবে। ধাক্কা লাগবে না, অথচ ডিফেন্ডারের সহজ টার্গেট হয়ে উঠবে ফ্লোটপ্লেন। এই সব যখন ভাবছে রানা, আধ কিলোমিটার সামনে নিচু একটা পাথুরে রিজ দেখতে পেয়ে শয়তানী বুদ্ধি গজাল মাথায়, উৎসাহ আর প্রেরণা অনুভব করল।

সামনে ওটা মোসাবি দ্বীপ। পাথুরে রিজ-এর দিকে একটা পথ চলে গেছে আকাশছোঁয়া ডগলাস ফার গাছের ভেতর দিয়ে।

ওই গাছগুলোর ভেতর প্লেন নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, ডানার ডগা মগডালের শাখা স্পর্শ করছে। অন্য কারও দৃষ্টিতে ব্যাপারটা আত্মঘাতী পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। ডিফেন্ডারের পাইলট ভাবল, বাঁচার কোন পথ না দেখে ফ্লোটপ্লেনের কো-পাইলট বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলেছে, কি করছে নিজেও জানে না। তৃতীয় আক্রমণের প্ল্যানটা বাতিল করে দিয়ে ফ্লোটপ্লেনকে পিছন থেকে অনুসরণ করছে সে, পিছনে ও সামান্য একটু ওপরে রয়েছে, নিশ্চিত সংঘর্ষ চাক্ষুষ করার অপেক্ষায়।

কন্ট্রোল হুইল দু'হাতে ধরে আছে রানা, দৃষ্টি সামনে ঝুলে থাকা পাথর পাঁচিলের ওপর স্থির। ভাঙা উইন্ডশীল্ড থেকে বিস্ফোরণের মত ভেতরে ঢুকছে বাতাস, তাকিয়ে থাকার জন্যে মাথাটা একদিকে ঘুরিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে।

'আল্লা আল্লা করো ভাই, নবী করো সার,' মনে মনে বলছে রানা, নিজেকেই।

গাছগুলোর ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে ফ্লোটপ্লেন। আন্দাজে কোন ভুল হওয়া চলবে না, জানে রানা, হিসাবেও থাকা চলবে না কোন খুঁত। সময়ের মাহেন্দ্র

ক্ষণটিতে ঠিক চালটি চালতে হবে। সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও যদি হেরফের হয়ে যায়, মৃত্যু ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। পাথরগুলো ধেয়ে আসছে প্লেনের দিকে, যেন পিছন থেকে কেউ ঠেলছে। ওগুলোকে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, ধূসর আর খয়েরি রঙের বোল্ডার, গায়ে কালো দাগ। অনেকক্ষণ তাকায়নি, তবু জানে অলটিমিটারের কাঁটা শূন্যের ঘরে নেমে এসেছে, আর ট্যাকমিটার কাঁটা লাল ঘরে কাঁপছে। বেচারি ফ্লোটপ্লেন যত দ্রুত পারে ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে।

নিঃশব্দে চিৎকার করছে রানা, 'নিচে! আরও দু'মিটার নিচে!'

বিপদ এড়াবার সময় আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে, নির্দিষ্ট মাপে কন্ট্রোল কলামে একটা ঝাঁকি দিল রানা–প্লেনের নাক উঁচু করার জন্যে স্রেফ যতটুকু প্রয়োজন, যাতে শুধু প্রপেলারের ডগা সচল চাবুকের মত পেরিয়ে আসে রিজ, দু'এক সেন্টিমিটারের জন্যে চূড়ার সঙ্গে ধাক্কা না খায়। হিসাব যেখানে এরকম চুলচেরা, সেখানে তো ত্রুটি হতেই পারে। হলোও তাই। মোচড়ানো ও বিস্ফোরিত অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোটগুলো আর্তনাদ করে উঠল, পাথরে বাড়ি খেয়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ফিউজিলাজ থেকে। ছুটন্ত তীরের মত বাতাস কাটছে বিভার, যেন সদ্য মুক্তি পাওয়া একটা বাজপাখি। ভারী ফ্লোটগুলো না থাকায় পুরানো প্লেনটার চাঞ্চল্য বেড়ে গেল, যোগ হলো অতিরিক্ত ত্রিশ নট এয়ারস্পীড। রানার নির্দেশে কোন রকম ইতস্তত না করে সাড়া দিচ্ছে এখন, আকাশের আরও ওপরে ওঠার সময় কোন রকম আড়ষ্টতা নেই।

আয় শালা, এবার তোদের দেখাই কাকে বলে ইমেলম্যান! বিড়বিড় করছে রানা, ঠোঁটের কোণে শয়তানী হাসি। হালকা বিভারকে নিয়ে একটা হাফ লূপ সম্পন্ন করল ও, তারপরই ডিগবাজি বা গড়ান দিয়ে হাফ রোল শেষ করল, সরাসরি একটা কোর্স ধরে ডিফেন্ডারের দিকে ছুটছে। 'কেমন মজা বোঝ এবার!' বাতাস আর এঞ্জিনের গর্জনে চাপা পড়ে গেল ওর চিৎকার। 'দেখি কোথায় পালাস!'

রানার উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি করে ফেলল কপ্টারের পাইলট। সরার পথ নেই তার, লুকোবার জায়গা নেই। ঝাঁঝরা ও তোবড়ানো একটা ফ্লোটপ্লেন সরাসরি ধাক্কা মারতে আসবে, এটা সে কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু চোখের সামনে ঠিক তাই ঘটতে দেখছে। কলিশন কোর্স ধরে প্রায় দুশো নট স্পীডে ছুটে আসছে বিভার। এই সগর্জন গতি সম্ভব বলে ধারণা ছিল না তার। বিপজ্জনক পাল্টা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে, এরকম ভাব দেখাল সে, কিন্তু রানা সে-সব ভ্রূক্ষেপ না করে সরাসরি ছুটে আসছে। ডিফেন্ডারের পাইলট হেলিকপ্টারের নাক সরাসরি প্রতিপক্ষের দিকে তাক করল, আসন্ন সংঘর্ষের আগে ঝাঁঝরা ফ্লোটপ্লেনকে গুলি করে ফেলে দিতে চাইল আকাশ থেকে।

রানা দেখতে পেল হেলিকপ্টারটা নাক বরাবর ঘুরে গেল, ঝলসে উঠল মেশিন গানের মাজল। শুনতে পেল রেডিয়াল এঞ্জিনে আঘাত করছে শেল। কাউলিং-এর নিচে থেকে অকস্মাৎ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল গরম তেল, ইগজস্ট স্ট্যাক ভিজে গেল, ফলে নীল ঘন ধোঁয়ার মোটা একটা টানেল তৈরি হচ্ছে প্লেনের পিছনে। মুখে গরম তেল লাগবে, এই ভয়ে হাত তুলে চোখ আড়াল করল রানা।

সংঘর্ষের মাইক্রো সেকেন্ড আগে ওর স্মৃতিতে যে দৃশ্যটা স্থির হয়ে থাকল সেটা হলো অমোঘ নিয়তিকে মেনে নেয়া হেলিকপ্টার পাইলটের মুখে ভাবগম্ভীর নির্লিপ্ততা।

ফ্লোটপ্লেনের প্রপেলার আর এঞ্জিন সরাসরি আঘাত করল কপ্টারকে, ককপিটের ঠিক পিছনটায়, ধাতব আবর্জনা বিস্ফোরিত হয়ে টেইল রোটর বুম ছিঁড়ে নিয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে ডিগবাজি খেতে শুরু করল ডিফেন্ডার, ডিগবাজি বন্ধ হবার পর ছেড়ে দেয়া পাথরের মত খসে পড়ল পাঁচশো মিটার নিচের পাথরে। পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরল না। ভাঙাচোরা কাঠামো বা আবর্জনার স্তূপটা থেকে প্রথম শিখা বেরুল দু'মিনিট পর, তারপরই চোখ ধাঁধানো আগুনে ঢাকা পড়ে গেল সব।

বিভারের বিচ্ছিন্ন প্রপেলার আকাশে ডিগবাজি খাচ্ছে। এঞ্জিন থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে গেছে কাউলিং, গাছপালার ভেতর আহত পাখির মত ডানা ঝাপটাচ্ছে। এঞ্জিন এত দ্রুত বন্ধ হলো, রানা যেন ইগনিশন সুইচ অফ করে দিয়েছে। চোখ থেকে তেল মুছল ও, উন্মুক্ত হয়ে পড়া সিলিন্ডার হেডের ওপর দিয়ে সবুজ কার্পেটের মত গাছপালার মগডাল দেখতে পাচ্ছে শুধু। বিভার গতি হারাচ্ছে, ঝাঁকি সামাল দেয়ার জন্যে শরীরের পেশী শক্ত করল রানা। কন্ট্রোল এখনও কাজ করছে, ও চেষ্টা করল প্লেনটা যাতে গাছপালার ওপরদিকের ডালপালায় পড়ে।

তাই পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু ডান ডানার বাইরের কিনারা ধাক্কা খেলো সত্তর মিটার লম্বা লাল একটা সিডারে, ওই এক ধাক্কাতেই অকস্মাৎ নব্বুই ডিগ্রী ঘুরে গেল প্লেন। অল্প একটু অবশিষ্ট আকাশে বিভার এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে, গাছপালার নিরেট পাঁচিলের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। বাম ডানা আরেক লম্বা সিডারে জড়িয়ে গেল, তারপর ছিঁড়ে গেল। সবুজ পাইনের কাঁটা ঘিরে ফেলল লাল প্লেনটাকে, আকাশ থেকে তাকালে ওটাকে এখন আর কেউ দেখতেই পাবে না। একটা ফার গাছের কাণ্ড, আধ মিটার চওড়া, ভাঙাচোরা প্লেনটার সামনে খাড়া হয়ে আছে। প্রপেলারের 'হাল' সরাসরি আঘাত করল, গাছটাকে ভেদ করে বেরিয়ে এল। মাউন্টিং থেকে বিচ্ছিন্ন হলো এঞ্জিন, গাছটার ওপরের অর্ধেক আছাড় খেলো প্লেনের গায়ে, টেইল সেকশন খুলে নিয়ে গেল। বিধ্বস্ত কাঠামোর যে-টুকু অবশিষ্ট আছে সে-টুকু জঙ্গলের ভেজা মাটি চেঁছে তুলে ফেলল খানিকদূর, তারপর স্থির হয়ে গেল। গাছপালার নিচে, জমিনে, কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। রানা বসে আছে যেন একটা মূর্তি, হতবিহ্বল, নড়ার শক্তি নেই। চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, ফাঁকটার ভেতর দিয়ে তাকাল, যেখানে উইন্ডশীল ছিল। এই প্রথম লক্ষ করল, পুরো এঞ্জিনটাই নেই। অস্পষ্টভাবে চিন্তা করল, কোথায় গেল ওটা? তারপর ধীরে ধীরে কাজ শুরু করল ব্রেন, চিন্তাশক্তি ফিরে আসছে। ঝুঁকে রুবেনকে পরীক্ষা করল ও।

কাশির সঙ্গে ঝাঁকি খাচ্ছে ইন্সপেক্টর, দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, এইমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর দিয়ে তাকিয়ে পাইন গাছ দেখতে পেল সে, ককপিটের ওপর ঝুলে আছে। 'আমরা জঙ্গলে পড়লাম কিভাবে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'কি মিস করেছেন জানেন না,' বিড়বিড় করল রানা, নড়তে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল। তবে শরীরটা পরীক্ষা করে স্বস্তিবোধ করল–কোথাও কোনও হাড় ভাঙেনি, শুধু কপালটা ফুলে আছে, আর হাতের দু'জায়গার চামড়া ছড়ে গেছে সামান্য।

রানার মনে কোন সন্দেহ নেই, হাসপাতাল ছাড়া বাঁচানো যাবে না রুবেনকে। 'দাঁড়ান, দেখি,' বলে তার ফ্লাইং সুট খোলার পর শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল, ক্ষতটা খুঁজছে। ব্রেস্টবোনের বাম দিকে পাওয়া গেল সেটা, কাঁধের নিচে। রক্ত এত কম বেরিয়েছে, আর ফুটোটা এত ছোট যে প্রথমে দেখতেই পায়নি। প্রথমে মনে হলো, বুলেটের ক্ষত নয়। আলতো স্পর্শে পরীক্ষা করতে গিয়ে আঙুলের ডগায় তীক্ষ্ণ ধাতব টুকরো ঠেকল। রানা হতভম্ব, মুখ তুলে ফ্রেমটার দিকে তাকাল, এক সময় ওটা উইন্ডশীল্ডকে ধরে রেখেছিল। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বোধগম্য হলো। বুলেটের আঘাতে বিচ্ছিন্ন অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের একটা টুকরো ছুটে এসে রুবেনের বুকে ঢুকেছে, ভেদ করেছে বাম ফুসফুস। খুব বেশি হলে এক সেন্টিমিটারের জন্যে হৃৎপিণ্ডে ঢোকেনি।

খক খক কোরে দু'বার কেশে জানালা দিয়ে রক্ত ফেলল রুবেন। 'অদ্ভুতই বলতে হবে,' বিড়বিড় করল সে। 'সব সময় ভয় পেয়েছি কোন কানাগলিতে ছিনতাইকারীরা গুলি করবে আমাকে।'

'টাকা-পয়সা নয়, ওরা আপনার প্রাণ ছিনতাই করতে চেয়েছিল।'

'অবস্থাটা কি? কতটা খারাপ?'

'ফুসফুসে মেটাল স্প্লিন্টার,' বলল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ব্যথা আছে?'

'দপ দপ করছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে লাথি মেরে দোমড়ানো এন্ট্রি ডোর খুলে রুবেনকে বের করে আনল রানা, নরম মাটিতে শুইয়ে দিল। চোখ বুজে থাকল রুবেন। 'ঘুমাবেন না, প্লীজ। আমাকে পথ দেখাতে হবে, তানাবুর গ্রামটা কোন দিকে?'

চোখ মেলল রুবেন, দৃষ্টিতে প্রশ্ন, কি যেন স্মরণ করতে চাইছে। 'রডনির হেলিকপ্টার,' কাশতে কাশতে বলল সে। 'ওরা যারা আমাদেরকে গুলি করছিল, তাদের কি হলো?'

ঘাড় ফিরিয়ে জঙ্গলের মাথায় কালা ধোঁয়ার দিকে তাকাল রানা। 'ওরা এখন সেদ্ধ হচ্ছে।'

আট

প্লেনের কার্গো সেকশন থেকে রশি আর ক্যানভাস সংগ্রহ করল রানা, তারপর গাছের ডাল কেটে চৌকো একটা স্ট্রেচার বানাল, পায়াবিহীন, সেটার মাঝখানে শুইয়ে দিল রুবেনকে। তাকে স্ট্র্যাপ দিয়ে স্ট্রেচারের সঙ্গে বাঁধার পর কাঠামোটার সামনের ফ্রেমে গিঁট দিয়ে আটকাল দুই প্রস্থ রশি, শেষ মাথায় থাকল দুটো লূপ,

লূপ দুটোয় হাত গলিয়ে তুলে আনল বগলের নিচে আর কাঁধের ওপর। হাঁটছে রানা, রশির সঙ্গে বাঁধা স্ট্রেচার ওকে অনুসরণ করছে।

দশ মিনিট পর কথা বলল রানা, 'আপনি আমার সঙ্গে আছেন তো?'

'কোন রকমে।'

'আমি একটা অগভীর ঝর্ণা খুঁজছি,' বলল রানা। 'পশ্চিম দিকে চলে গেছে।'

'আপনি উলফ ক্রীকে এসে পড়েছেন। এটা পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যেতে হবে।'

'তানাবুর গ্রাম কতদূরে?'

'দুই কি তিন কিলোমিটার,' ফিসফিস করে বলল রুবেন। ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে আবার, এই ভয়ে সারাক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলছে রানা। 'বিবাহিত?'

'দশ বছর ধরে। দারুণ এক মেয়ে। পাঁচটা বাচ্চা উপহার দিয়েছে।'

ভার টানতে হচ্ছে, কাজেই এগোবার গতি খুব মন্থর। সময় যেন ফুরোতেই চায় না। শরীরটাও যেন আর এত কষ্ট সইতে পারছে না। তবে নিজেকে রানা বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বাবা বাড়ি ফিরবে এই আশায় অপেক্ষা করছে পাঁচটা বাচ্চা। স্ত্রীও পথ চেয়ে আছে। এখন যদি ও ক্লান্তির অজুহাতে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামে, সময়মত চিকিৎসা পাবে না সে, আর চিকিৎসা না পেলে বাঁচানো যাবে না।

আড়াই ঘণ্টা পর আবার জ্ঞান হারাল রুবেন। তবে ইতিমধ্যে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে রানা। চেইন শ দিয়ে গাছ কাটার আওয়াজও শুনতে পেয়েছে। তারপর কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল আকাশ। ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা, শেষ প্রান্তটা সাগর ছুঁয়েছে, সেখানে ছোট একটা হারবার। ডানে-বাঁয়ে কাঠের তৈরি কয়েকটা ঘর দেখা গেল, ছাদগুলো করোগেটেড টিনের। একটা মাচার ওপর ডিশ অ্যান্টেনা দেখা গেল, পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। পাথরের চিমনি, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে লম্বা সিলিন্ডার আকৃতির টোটেম পোল দাঁড়িয়ে আছে, পশু বা মানুষের আকৃতি নিয়ে। একটা ফ্লোটিং ডকে বেশ কয়েকটা ফিশিং বোট ভাসছে। ওদেরকে দেখতে পেয়ে প্রথমে ছুটে এল একদল ন্যাংটা বাচ্চা ছেলে। খোলা একটা দরজার ভেতর চেইন শ দিয়ে লগ কাটছে এক লোক, ছেলেদের হৈ-চৈ শুনে মুখ তুলে তাকাল। স্ট্রেচারে পড়ে থাকা রুবেন আর রানাকে দেখে ভুরু কোঁচকাল সে, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল। খালি গা, তবে শার্টটা টেনে নিয়ে কাঁধের ওপর ফেলল, পরনে ট্রাউজার।

ক্লান্তিতে অবসন্ন রানা ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে পৌঁছে মাটির ওপর বসে পড়ল। ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লোকটা, সঙ্গে আরও তরুণ ও তরুণী–তরুণদের পরনে শুধু নেংটি, মেয়েরা খাটো স্কার্ট পরে আছে, অনেকের বুকই অনাবৃত।

রানার ওপর ঝুঁকে লোকটা বলল, 'কোন চিন্তা নেই, ভাল জায়গায় এসে পড়েছেন।' জড়ো হওয়া লোকজনের দিকে তাকাল সে। 'ট্রাইবাল হাউসে তুলে নিয়ে যাও ওদেরকে।' পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই বেমানান আরও একটা

জিনিস দেখতে পেল রানা–লোকটা তার ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ফোনের রিসিভার বের করল। 'আমি মেইনল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

মুখ তুলে লোকটার দিকে তাকাল রানা। 'আচ্ছা, বলতে পারেন, ইকলাম তানাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

লোকটার চোখে-মুখে কৌতূহল ফুটে উঠল। 'কেন? আমিই তো তানাবু।'

'ধন্যবাদ–আপনাকে, এবং আমার ভাগ্যকে,' বলেই চোখ বুজে নেতিয়ে পড়ল রানা।

বাচ্চা একটা মেয়ের নার্ভাস হাসির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল রানার। সারারাত একটানা ঘুমিয়ে অনেক বেলা করে চোখ মেলল ও। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু, লজ্জা পেয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে, মা, মা বলে চিৎকার করছে।

ছোট একটা কামরায় শুয়ে রয়েছে রানা। এক কোণে একটা স্টোভ জ্বলছে। ভালুক আর নেকড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি বিছানা। কাল বিকেলের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে হাসি পেল রানার–নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ে আর তরুণ-তরুণীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্যাটেলাইট ফোনে কলম্বিয়ার ক্যালি শহরের একটা খ্রিস্টান মিশনারি হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ করছে তানাবু, তাগাদা দিচ্ছে এয়ার অ্যামবুলেন্স পাঠাবার জন্যে।

ফোনটা ধার নিয়ে পানামা সিটির কানাডিয়ান কনসুলেটে রুবেনের আহত হবার খবরটা পৌঁছে দেয় রানা। কোন পরিস্থিতিতে কি ঘটেছে জানাতে ভুল করেনি। পন্টুনে ক্যামেরা আছে, একটা টীম পাঠিয়ে সেটা উদ্ধার করা যায় কিনা দেখতে বলেছে।

ফিশ সুপ খাওয়া শেষ করেনি রানা, সী প্লেন পৌঁছে যায়। দু'জন প্যারামেডিক আর একজন ডাক্তার রুবেনকে পরীক্ষা করে রানাকে আশ্বাস দিল, বেঁচে যাবার আশি ভাগ সম্ভাবনা আছে। রুবেনকে নিয়ে সী প্লেন চলে যাবার পরপরই তানাবুর বিছানায় ঘুমাতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু তানাবুর স্ত্রী সুপটুকু না খেয়ে নড়তে দেয়নি ওকে।

মেয়ের চিৎকারে ঘরের ভেতর ছুটে এল মহিলা, এক গাল হেসে বলল, 'এখন কেমন আছেন, মি. রানা? কতবার এসে দেখে যাচ্ছি, ভাবছিলাম...' সাংঘাতিক সরল মহিলা, আচরণে কোন রকম আড়ষ্টতা নেই, ভাব দেখে মনে হচ্ছে রানা যেন কতদিনের পরিচিত। গোলগাল গঠন, ভরাট স্বাস্থ্য, পরনে পরিচ্ছদ এত কম যে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না রানা।

প্যান্ট-শার্ট পরে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিয়ে চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। 'বিছানাটা দখল করে রেখেছি, নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের।'

'বেলা সাড়ে দশটা, খালি বিছানা এখন কি কাজে লাগবে?' খিলখিল করে হেসে উঠল নিমা তানাবু। 'শুনুন, ভাই, আতিথেয়তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলে মোসাবির হাইডারা খুব অপমানিত বোধ করে। আমি জানি, রাক্ষসের মত

খিদে পেয়েছে আপনার। স্যামন স্টেক তৈরি করেছি, সঙ্গে আছে নারকেল ভাত। বাইরে কাজ করছে তানাবু, ওর সঙ্গে কথা বলুন, আপনাকে ওখানেই আমি খেতে দেব।'

মোজা পরে হাইকিং বুটে পা গলাল রানা, হাত দিয়ে মাথার চুল সিধে করে নিল, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। খোলা শেডে বসে পাঁচ মিটার লম্বা লাল একটা সিডার লগ কাটছে তানাবু, ধীরে ধীরে একটা পশুর আকৃতি নিচ্ছে সেটা। রানাকে দেখে হাসল। 'এটাই আমার পেশা।'

'আপনি যে টোটেম পোল তৈরি করেন, ডগলাস ম্যাকআর্থার তা আমাকে আগেই জানিয়েছেন। আপনি কি জানেন, এখানে আমি কেন এসেছি?'

কথা না বলে কাজ ছেড়ে উঠে পড়ল তানাবু, হারবারের দিকে হাঁটা ধরে ইঙ্গিতে রানাকে পিছু নিতে বলল। পানি পর্যন্ত বিস্তৃত ছোট একটা বোট হাউসে ঢুকল ওরা। ইউ আকৃতির ডকে ছোট দুটো জলযান ভাসছে। দেখেই চিনতে পারল রানা–মাস্টারক্রাফট বোট কোম্পানীর তৈরি ডিউয়ো থ্রী হানড্রেড ওয়েটজেট ওয়াটারক্রাফট। অত্যন্ত শক্তিশালী বাহন, দু'জন বসতে পারে। উজ্জ্বল রঙ দিয়ে গায়ে পাখির ছবি আঁকা হয়েছে। 'দেখে মনে হচ্ছে উড়তেও পারে,' মন্তব্য করল রানা।

'অতিরিক্ত পনেরো ঘোড়া পাবার জন্যে এঞ্জিন মডিফাই করেছি আমি,' এক গাল হেসে বলল তানাবু। 'গতি প্রায় পঞ্চাশ নট।' আচমকা প্রসঙ্গ বদল করল সে। 'ম্যাকআর্থার স্যার বলেছেন অ্যাকুসটিক মেজারিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে ক্যান্ডি দ্বীপের চারধারে ঘুরবেন আপনি, তাই ভাবলাম এই ওয়াটারক্রাফট আপনার কাজে আসবে।'

'আমার কাজের জন্যে একেবারে আদর্শ,' বলল রানা। 'কিন্তু প্লেন ক্র্যাশের সময় আমার হাইড্রোফোন গিয়ার হারিয়ে গেছে। দ্বীপটার আশপাশে ঘুর ঘুর করে কোন লাভ নেই, আমি সরাসরি মাইনে ঢুকতে চাই।'

'কেন? মাইনের ভেতর আপনার কি দেখার আছে?'

'হীরে তোলার জন্যে রডনি কি পদ্ধতিতে খোঁড়াখুঁড়ি করছে।'

একটা নুড়ি পাথর তুলে সবুজ পানিতে ছুঁড়ল তানাবু। 'দ্বীপের চারধারে কোম্পানীর কয়েকটা বোট চক্কর দিয়ে বেড়ায়,' অবশেষে বলল সে। 'ওদের কাছে অস্ত্র থাকে। কাছাকাছি গেলে জেলেদের ওপর হামলা চালায়।'

'হ্যাঁ, শুনেছি আপনার ভাইয়ের বোটটা ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'এ-ও কি শুনেছেন যে আমার কাকাকে খুন করেছে ওরা?'

'না।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত।'

'ক্যান্ডি থেকে আট মাইল দূরে আমি তার লাশ পাই। একজোড়া ফুয়েল ক্যানের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল। ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ থাকায় মারা যায় সে। তার ফিশিং বোটের হুইল ছাড়া আর কিছুই আমরা পাইনি।'

'আপনার ধারণা রডনির লোকজন তাকে খুন করেছে?'

'ধারণা নয়, আমি জানি।'

'আইন কি বলে?'

মাথা নাড়ল তানাবু। 'পানামা সিটিতে বসে ইন্সপেক্টর রুবেন কতটুকু কি করবেন। ক্যান্ডিতে হীরা আছে জানার পর কানাডা সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকায় দ্বীপটা লীজ নেন রডনি, চুক্তিতে শর্ত থাকে ক্যান্ডির আশপাশে কেউ ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু দ্বীপটার মালিক কানাডা সরকার হলেও, আমরা হাইডা আদিবাসীরা মনে করি ওটা আমাদের একটা পবিত্র স্থান। এক সময় ওখানেও তো আমরা থাকতাম। অথচ ওই চুক্তির ফলে ক্যান্ডিতে আমাদের পা ফেলা বেআইনী। পা ফেলা তো দূরের কথা, ক্যান্ডির চার মাইলের মধ্যে যাওয়া নিষেধ। ফলে ওদিকটায় আমরা মাছ ধরতেও যেতে পারি না। গেলে কানাডিয়ান পুলিসই আমাদেরকে গ্রেফতার করতে চায়।'

'বোঝা গেল রডনির সিকিউরিটি চীফ আইনকে কেন ভয় পায় না।'

'রবার্ট হল্ট একটা পিশাচ। আপনি নেহাতই ভাগ্যবান বলে ওর হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছেন। হীরের খোঁজে বহু লোকই দ্বীপটায় গেছে বা আশপাশে ঘুরঘুর করেছে, তাদের কেউ ফিরে এসেছে বলে শুনিনি।'

'ক্যান্ডিতে এক সময় আপনারা থাকতেন, সেই সূত্রে কোন সুবিধে কি পান?'

'আমাদেরকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়েছে,' বলল তানাবু। 'ক্যান্ডির হীরের ওপর আমাদের অধিকার আছে কিনা তা পলিটিক্যাল ইস্যু নয়, লিগ্যাল ইস্যু। আমরা কেস করেছি, কিন্তু রডনির অ্যাটর্নিরা বছরের পর বছর কেস ঝুলিয়ে রেখেছে।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'মি. রানা, আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলবেন আমাকে? আপনি কি মাইনটা বন্ধ করে দিতে চান?'

'চাইব, যদি দেখি ওদের মাইনিং অপারেশন পদ্ধতিই অ্যাকুসটিক প্লেগের জন্যে দায়ী,' জবাব দিল রানা। 'আপনি নিশ্চই শুনেছেন, প্যাসিফিকে মানুষ আর সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে?'

'শুনেছি। মি. রানা, আপনি এখানে নিজে আসেননি, ঈশ্বর আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনাকে আমি ওদের মাইনিং প্রপার্টির ভেতরে নিয়ে যাব।'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করল রানা, তারপর বলল, 'আপনার স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চা আছে। দুটো জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। আপনি আমাকে দ্বীপে পৌঁছে দিন, ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব।'

'সম্ভব নয়। ওদের সিকিউরিটি সিস্টেম একটা খরগোশকেও ভেতরে ঢুকতে দেয় না। কথার কথা নয়, আবর্জনার স্তূপগুলোর আশপাশে ওগুলোর অসংখ্য লাশ দেখেছি আমি। শুধু খরগোশ নয়, সব রকম প্রাণীই আছে। ওদের সঙ্গে অ্যালসেশিয়ান পুলিস ডগও আছে, একশো মিটার দূর থেকে ডায়মন্ড-স্মাগলারদের গন্ধ পেয়ে যায়।'

'সেক্ষেত্রে টানেল দিয়ে ঢুকব।'

'একা আপনি পারবেন না।'

'পারি বা না পারি, একাই চেষ্টা করতে হবে আমাকে। আমি চাই না আপনার স্ত্রী এত তাড়াতাড়ি বিধবা হন।' মহিলাকে ওর খুব ভাল লেগে গেছে, কথাটা বলতে ইচ্ছে হলেও বলল না রানা।

'আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না,' শান্ত সুরে বলল তানাবু, যদিও তার

চোখ দুটো প্রতিশোধের আগুনে জ্বলজ্বল করছে। 'তাজা মাছ সাপ্লাই পাবার জন্যে মাইনের লোকজন আমাদের ওপর নির্ভর করে। হপ্তায় একদিন জালে ধরা মাছ পৌঁছে দিয়ে আসি আমরা।'

'আচ্ছা!' আগ্রহ বেড়ে গেল রানার। 'কিভাবে কি করেন বলুন আমাকে।'

'ডকে পৌঁছে কার্টে তোলা হয় মাছ, টানেলের ভেতর দিয়ে কার্ট নিয়ে হেড কুকের অফিসে চলে যাই। সে আমাদেরকে নাস্তা খাওয়ায়, মাছের দাম দেয়, তারপর আমরা ফিরে আসি। আপনার চুল কালো, গায়ের রঙও উজ্জ্বল শ্যামলা, হাইডা বলে চালানো কোন সমস্যাই নয়। তবে জেলেদের পোশাক পরতে হবে। আর মাথা সব সময় নিচু করে রাখবেন। গার্ডরা বিশেষভাবে লক্ষ রাখে কেউ হীরে নিয়ে পালাচ্ছে কিনা। আমরা কিছু বের করে আনি না, শুধু ডেলিভারি দিই, কাজেই আমাদেরকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখে না।'

'ছোট্ট একটা সমস্যা আছে,' বলল রানা। 'হল্ট আমাকে দেখেছে, আবার দেখলে চিনতে পারবে।'

হাত নেড়ে সমস্যাটা বাতিল করে দিল তানাবু। 'টানেল বা কিচেনের মত নোংরা জায়গায় থাকে না হল্ট। এই ঠাণ্ডায় অফিস থেকে সে বেরুবেই না।'

'কিচেন স্টাফ খুব বেশি তথ্য আমাকে দিতে পারবে না,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করা যায় এমন কোন মাইনারকে চেনেন? খনন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখে?'

'চীনা আর বাংলাদেশী ওয়ার্কাররা কাজ করছে ওখানে,' বলল তানাবু। 'আপনার স্বদেশী হলেও, সাধারণ শ্রমিক তো, তেমন কোন সাহায্য করতে পারবে না। তবে একজন মাইনার এঞ্জিনিয়ার আছেন, কোম্পানীর প্রতি তাঁর চরম ঘৃণা।'

'আপনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'আমি এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত জানি না। শুধু জানি যে তিনি বাংলাদেশী। বেশির ভাগ সময় রাতেই ডিউটি করেন, আমরা মাছ ডেলিভারি দেয়ার সময় ব্রেকফাস্ট করতে দেখেছি। কফি খাবার সময় দু'একবার দু'চারটে কথাও হয়েছে। ওয়ার্কিং কন্ডিশন সম্পর্কে অভিযোগ আছে তাঁর। শেষবার আমাকে জানিয়েছেন, গত তিন মাসে পাঁচজন চীনা আর তেরোজন বাংলাদেশী ওই মাইনে মারা গেছে।'

'তাঁর সঙ্গে মিনিট দশেক কথা বলতে পারলে এই অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারতাম।'

'এবার গিয়ে আমরা তাঁকে পাবই, তার কোন নিশ্চয়তা নেই,' বলল তানাবু।

'মাছ নিয়ে কবে আবার যাচ্ছেন আপনারা?'

'জেলেরা তো আজ রাতেই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়বে। এই ধরুন কাল প্রথম আলোয়।'

'ঠিক আছে, আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা।

উজ্জ্বল বাহারি রঙে রাঙানো ছয়টা ফিশিং বোট রোজ হারবারে ঢুকে পড়ল, ওগুলোর ডেকে সাজিয়ে রাখা কাঠের বাক্সের ভেতর বরফ মোড়া মাছ। হালকা কুয়াশা পানি ছুঁয়ে আছে, সাগরকে সবুজ দেখাচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা মুকুট

নেই। পুব আকাশে ঝাপসা দেখাচ্ছে সূর্যটাকে, বাতাসের গতিবেগ পাঁচ নটের বেশি হবে না।

স্টার্নে বসে আছে রানা, ওর দিকে এগিয়ে এল তানাবু। 'সময় হয়েছে, মি. রানা, নাটক শুরু করুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অর্ধ সমাপ্ত একটা মুখোশের নাক ছুরি দিয়ে চাঁছতে শুরু করল রানা। মুখোশটা তানাবুই ওকে ধার দিয়েছে। ওর পরনে হলুদ অয়েলস্কীন প্যান্ট, সঙ্গে সাসপেন্ডার আছে, সেটা ভারী একটা উলেন সোয়েটারের ওপর ঝোলানো। সোয়েটারটা নিমা তানাবু নিজের হাতে বুনেছে, তার এক ভাইয়ের জন্যে। রানার মাথায় একটা স্টকিং ক্যাপও আছে, কপাল আর ভুরু ঢেকে রেখেছে। মুখোশের নাকে ছুরির ভোঁতা দিকটা চালাচ্ছে ও, মুখ না তুলে আড়চোখে তাকাল লম্বা ডকের দিকে। ছোটখাট কোন জেটি নয়, বড় জাহাজ ভিড়তে পারে এমন একটা ল্যান্ডিং স্টেজ। সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে লম্বা একটা ক্রেন ভারী ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে। ডকে নোঙর ফেলেছে বিশাল একটা লাক্সারি ইয়ট, খুবই সুন্দর দেখতে। ইয়টের সুপারস্ট্রাকচার গ্লোব আকৃতির, আগে কখনও এরকম দেখেনি রানা। জোড়া হাই-পারফরম্যান্স ফাইবারগ্লাস 'হাল', ডিজাইন করা হয়েছে গতি আর আরাম পাবার জন্যে। রানা ধারণা করল, ইয়টটার স্পীড আশি নট পর্যন্ত উঠতে পারে। আশ্চর্যই লাগল, গায়ে কোথাও ওটার নাম লেখা নেই। এর একটাই অর্থ হতে পারে, রডনি বুমার নিজের ইয়টের কথা প্রচার করতে চান না। আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় সরাসরি ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

ইয়টের জানালাগুলোয় পর্দা ঝুলছে। ডেকে কেউ নেই। ক্রু বা প্যাসেঞ্জাররা এত সকালে হয়তো বিছানা ছেড়ে নামেইনি। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে ডকে দাঁড়ানো ছ'জন ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডের দিকে তাকাতে যাবে রানা, এই সময় মেইন সেলুনের দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল ডেকে।

পাউলাকে দেখেই চিনতে পারল রানা। দীর্ঘদেহী সে, পুরুষালি ভাবটুকু আজ আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল চোখে। পরে আছে খাটো একটা রোব, সম্ভবত এইমাত্র বিছানা ছেড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিশিং বোটগুলোর ওপর চোখ বুলাল পাউলা, তবে রানার দিকে সরাসরি তাকাল না। ঠাণ্ডা লাগায় একটু কেঁপে উঠল সে, ঘুরে মেইন সেলুনে ঢুকে পড়ল।

'পাউলা পার্কার,' বলল তানাবু। 'রডনি বুমারের রক্ষিতা। হিংস্র বাঘিনী বললেও চলে। ওই সৌখিন ইয়টটা নিয়ে বছরে দু'তিনবার ক্যান্ডিতে আসে।'

'বেড়াতে?'

মাথা নাড়ল তানাবু। 'কোম্পানীর সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর পাউলা। এক মাইন থেকে আরেক মাইনে ঘুরে বেড়ায়, সিস্টেম চেক করে, অসঙ্গতি দেখলে শাস্তির ব্যবস্থা করে।'

'আমি তাহলে খারাপ একটা সময়ে এসে পড়েছি,' বলল রানা, মনে মনে ভাবছে, পাউলার প্রাণ বাঁচিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এখন এখানে ধরা পড়লে কোন রকম ছাড় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

'হ্যাঁ, আমাদেরকে খুব সাবধান থাকতে হবে,' বলল তানাবু। ডকে দাঁড়ানো

সিকিউরিটি গার্ডদের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওদিকে তাকান। ওরা ছ'জন। সাধারণত মাছ ডেলিভারি দেয়ার সময় দু'জনের বেশি পাঠায় না ডকে। গলায় মেডেল পরা লোকটা, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর নাম ব্রড। সেই ডক ইনচার্জ। পাগলা কুত্তা বললেই হয়।'

গার্ডদের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল রানা। রুবেনের সঙ্গে ক্যান্ডির এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করার পর ফ্লোটপ্লেনটাকে কয়েকজন গার্ড ঘিরে ফেলেছিল, এদের মধ্যে তারা কেউ থাকলে ওকে না আবার চিনে ফেলে। বিশেষ করে হল্টের অফিসে যাকে মেরেছিল, সে যদি থাকে, কপালে খারাবি আছে। তবে স্বস্তিবোধ করল রানা একজনকেও পরিচিত মনে না হওয়ায়।

গার্ডরা তাঁদের অস্ত্র এক কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে, গানমাজল জেলেদের দিকে ঘোরানো। এটা স্রেফ একটা সতর্ক ভঙ্গি, বুঝতে পারছে রানা। কার্গো শিপের ক্রু আর নাবিকরা এদিকে তাকিয়ে আছে, তাদের সামনে ওরা কাউকে গুলি করবে না। ইনচার্জ ব্রড সাতাশ-আটাশ বছরের তরুণ, চেহারায় গোঁয়ার গোঁয়ার ভাব, ডকের একেবারে কিনারায় এসে তানাবুর বহরটাকে ভিড়তে দেখছে। একটা লাইন ছুঁড়ল তানাবু, ব্রডের জুতোর ওপর পড়ল সেটা। বলল, 'হাই, ফ্রেন্ড। রশিটা একটু বেঁধে দাও না, প্লীজ।'

লাথি মেরে রশিটা বোটে ফিরিয়ে দিল ব্রড। 'নিজে বাঁধো!' ধমক দিল সে।

লাইনটা ধরার সময় রানা ভাবল, নিশ্চয়ই কোন সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসে রডনির চাকরি নিয়েছে লোকটা। একটা মই বেয়ে ডকে উঠল ও, ছোট একটা বোলার্ড-এ লাইনটা জড়াবার সময় ইচ্ছে করে ঘষা খেলো ব্রডের সঙ্গে।

সবুট লাথি মেরে বসল ব্রড, রানা সিধে হতেই ওর সাসপেন্ডার মুঠোয় ভরে প্রবল বেগে ঝাঁকাল। 'ব্যাটা জেলের বাচ্চা, এত সাহস, আমার ইউনিফর্মে মাছের গন্ধ লাগিয়ে দিলি!'

স্থির হয়ে গেল তানাবু। এটা একটা ফাঁদ। হাইডারা শান্ত মানুষ, দপ করে জ্বলে উঠতে জানে না। সে ভয় পাচ্ছে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রানা না ব্রডকে মেরে বসে।

তবে না, রানা ফাঁদে পা দেয়নি। পেশী ঢিল করে দিল ও, লাথি খাওয়া নিতম্বে হাত বুলাল, ব্রডের দিকে তাকিয়ে আছে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে। মাথা থেকে ক্যাপটা খুলল, যেন সমীহ করার ভঙ্গিতে, মাথা ভর্তি কালো চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'খেয়াল করিনি। দুঃখিত।'

'তোমাকে আমার পরিচিত মনে হচ্ছে না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ব্রড।

'এবার নিয়ে বিশবার এলাম,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আপনাকে আমি বহুবার দেখেছি। আপনি ব্রড। তিন হপ্তা আগে মাছ আনলোড করতে দেরি হওয়ায় আপনি আমাকে মেরেছিলেন।'

রানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ব্রড, তারপর শয়তানি হাসি হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে লাগতে এলে হাত-পা বেঁধে চ্যানেলে ফেলে দেব, মনে থাকে যেন।'

সরল একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা, লাফ দিয়ে ফিশিং বোটের ডেকে ফিরে

এল। বাকি বোটগুলো সাপ্লাই শিপগুলোর মাঝখানের ফাঁকে ঢুকে পড়েছে, ডকের সঙ্গে লাইন আটকাচ্ছে। ছকে বাঁধা কাজ, মাছ ভর্তি কাঠের বাক্স ডকে তোলা হচ্ছে অভ্যস্ত হাতে। জেলেদের সঙ্গে রানাও হাত লাগাল। বাক্সগুলো একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রেলার-এ তোলা হচ্ছে, সেগুলো আট চাকাঅলা ছোট একটা ট্রাক্টরের সঙ্গে জোড়া। বাক্সগুলো অসম্ভব ভারী, রানার বাইসেপ আর পিঠ ব্যথায় টন টন করছে। দাঁতে দাঁত চেপে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে, জানে ঢিল পড়তে দেখলে গার্ডরা ওকে সন্দেহ করবে।

ট্রেলারগুলো ভরতে দু'ঘণ্টা লেগে গেল, তারপর ফিশিং বোটের জেলে আর চারজন গার্ডকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ট্রেন, সরাসরি মাইনিং অপারেশনের মেস হলে পৌঁছুবে। টানেলের প্রবেশমুখে থামানো হলো ওদেরকে, ছোট একটা বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকিয়ে কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে বলা হলো, পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার থাকবে। পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় সার্চ করা হলো, আলাদাভাবে এক্স-রে করা হলো প্রত্যেকের। একজন বাদে পরীক্ষায় পাস করল সবাই। বুটের ভেতর একটা ফিশিং নাইফ ঢুকিয়ে রেখেছে সে, খেয়াল ছিল না। লোকটাকে বোটে ফেরত পাঠানো হলো, ছুরিটা সহ, দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। বাকি সবাইকে কাপড় পরার অনুমতি দেয়া হলো। আবার সবাই ট্রেলারে চড়ে বসল।

'ফেরার সময় হীরের খোঁজে আবার নিশ্চয়ই সার্চ করা হবে?' তানাবুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, একই পদ্ধতিতে। এক্স-রে করার মানে হলো, হীরে গিলে ফেললেও কোন লাভ নেই।'

টানেলের মুখটা ধনুকের মত, পাঁচ মিটার উঁচু আর দশ মিটার চওড়া, দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ কিলোমিটার। সারি সারি আলো জ্বলছে সিলিঙে। মূল টানেল থেকে সাইড টানেলও বেরিয়েছে। 'এগুলো কোথায় গেছে?' তানাবুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই সাইড টানেলগুলো সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশবিশেষ,' জবাব দিল তানাবু। 'গোটা কমপাউন্ডকে ঘিরে রেখেছে। প্রতিটি টানেলে ডিটেকশন ডিভাইস ফিট করা আছে।'

'এত গার্ড, এত অস্ত্র, বিপুল সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট, শুধু হীরে পাচার ঠেকাবার জন্যে?'

'না। জোর করে ধরে আনা শ্রমিকরা যাতে পালাতে না পারে।'

টানেলের আরেক মাথা হয়ে মাইনিং অপারেশনের মাঝখানে বেরিয়ে এল ট্রেলারের ট্রেন। ট্রাক্টরের ড্রাইভার ট্রেলারগুলোকে পাকা একটা রাস্তায় তুলে আনল। রাস্তাটা প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে। এই গহ্বরটাই ভলক্যানিক শুট। একটা লোডিং ডকের পাশে ট্রাক্টর থামাল সে, ডকটা নিচু একটা কংক্রিট বিল্ডিঙের সঙ্গেই।

সাদা ওভারঅল পরা শেফ ওয়্যারহাউসের দরজা খুলে দিল, মাছগুলো এখানেই তোলা হবে। তানাবুকে দেখে হাসল সে। 'ঠিক সময়মত পৌঁচেছ তুমি। আমাদের মাছ প্রায় শেষ।'

'এবার এত মাছ এনেছি, খেয়ে শ্রমিকদের গায়ে আঁশ না গজায়।' রানার

দিকে ফিরে ফিসফিস করল তানাবু, 'মাইকেল কাটিং, মাইনারদের হেড কুক। এমনিতে লোক মন্দ নয়, তবে বড় বেশি বিয়ার খায়।'

'ফ্রোজেন-ফুডের লকার খোলাই আছে,' বলল কাটিং। 'বাক্সগুলো সাবধানে সাজাবে। গতবারে স্যামনের সঙ্গে কড মিশে গিয়েছিল, মেনু নিয়ে খুব ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। কাজ সেরে মেসে চলে এসো, আমার লোকজন তোমাদের নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। সাজানো কেমন হয়েছে দেখে চেক লিখে দেব আমি।'

ফ্রোজেন-ফুড লকারে বাক্সগুলো সাজিয়ে মেস হলে চলে এল ওরা। রুটি, মাখন, সেদ্ধ ডিম আর কফি পরিবেশন করা হলো ওদেরকে। আশপাশের টেবিলে বেশিরভাগই চীনা শ্রমিকরা খেতে বসেছে, তাদের মেনু আলাদা। বাঙালীদের সংখ্যা কম, খুঁটিয়ে লক্ষ করেও তাদের কারও চেহারায় কোন রকম ক্ষোভ, ভয় বা অস্বস্তির চিহ্ন মাত্র দেখল না রানা, দু'একজনকে শুধু একটু মনমরা লাগল। জেলেদের দিকে কারও তেমন মনোযোগ নেই, রানার সঙ্গে কোন বাঙালীর চোখাচোখি হলো না।

দরজার কাছে চারজন সশস্ত্র গার্ড পাহারা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে নাস্তা খেতে বসেছে প্রায় একশোর মত লোক। দশজন লোক একটু তফাতে একটা গোল টেবিলে বসেছে, রানা ধারণা করল এরা সম্ভবত মাইনিং এঞ্জিনিয়ার আর সুপারিনটেনডেন্ট।

'আপনার অসন্তুষ্ট বাঙালী এঞ্জিনিয়ার, কোথায় তিনি?' তানাবুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

কিচেনের দরজাটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে তানাবু বলল, 'বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

রানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'আয়োজনটা কিভাবে করলেন?'

ঠোঁট মুড়ে হাসল তানাবু। 'ফাইবার অপটিক ছাড়াও হাইডারা যোগাযোগ করতে পারে।'

এখন সময় নয়, রানা আর কোন প্রশ্ন তুলল না। গার্ডদের দিকে সতর্ক চোখ রেখে শান্ত ভঙ্গিতে কিচেনে ঢুকল ও। কুক বা অন্যান্য লোকজন কেউই কাজ থেকে মুখ তুলে তাকাল না। আরেক দরজা দিয়ে কিচেনের বাইরে বেরিয়ে এল ও। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, ধাপ তিনটে টপকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ঘাসের ওপর, কি আশা করা উচিত জানে না।

পাশেই একটা ডাস্টবিন, সেটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক, বাঙালী কিনা বোঝা গেল না। হলুদ জাম্প সুট পরে আছেন। পায়ার নিচের দিকে কাদা লেগে আছে, রঙটা অদ্ভুত নীলচে। মাথায় মাইনারের কঠিন হ্যাট, মুখে ব্রিদিং ফিলটার লাগানো মাস্ক। তার এক হাতে একটা বান্ডিল রয়েছে। 'শুনলাম আপনি নাকি বাংলাদেশী, এখানকার মাইনিং অপারেশন সম্পর্কে জানতে চান,' শান্ত গলায় ইংরেজিতে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ। আমার নাম...'

'নামের কোন গুরুত্ব নেই। আপনি ফিশিং বোটের সঙ্গে ফিরে যেতে চাইলে হাতে সময় খুবই কম।' বান্ডিল খুলে একটা জাম্পসুট, একটা মাস্ক আর একটা হার্ড হ্যাট ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। 'এগুলো পরে আমার পিছু নিন।'

কথা না বলে তাই করল রানা। ব্যাপারটাকে ফাঁদ বলে মনে করছে না ও। ডকে পা ফেলার পর থেকে ইচ্ছে করলে যে-কোন সময় গার্ডরা ওকে কাবু করতে পারত, ফাঁদ পাতার কোন দরকার নেই। মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের পিছু নিল ও। ভাবছে, সাগরে মড়ক লাগার আসল কারণটা এবার বোধহয় জানা যাবে।

নয়

দুঃসাহসী এঞ্জিনিয়ারের পিছু নিয়ে রাস্তা পেরুল রানা, ঢুকে পড়ল একটা আধুনিক প্রিফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিঙে। ভেতরে এক সারি এলিভেটর রয়েছে, অনেক নিচের খনিতে অফিসার আর শ্রমিকদের আনা-নেয়ার কাজ করে। বড় এলিভেটরগুলো শুধু শ্রমিকদের জন্যে। ওরা একটা ছোট এলিভেটরে চড়ল, এগুলো শুধু অফিসারদের জন্যে। 'কত নিচে নামতে হবে?' ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল রানা, ব্রিদিং মাস্ক থাকায় ভোঁতা শোনাল ওর গলা।

'পাঁচশো মিটার।'

'মাস্ক কেন?'

'যে আগ্নেয়গিরিতে আমরা নামছি সেটা যখন অতীতে বিস্ফোরিত হয়েছিল, ক্যান্ডি দ্বীপ পামিস রকে ভর্তি হয়ে যায়। এখন খোঁড়াখুঁড়ির সময় পামিস ধুলো ওড়ে, ফুসফুসের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।'

'এটাই কি একমাত্র কারণ?'

'না,' এঞ্জিনিয়ার জবাব দিলেন। 'আমি চাই না আপনি আমার চেহারা দেখুন। তাহলে, সিকিউরিটি সন্দিহান হয়ে উঠলে, লাই ডিটেক্টর টেস্ট পাস করে যাব আমি। আমাদের সিকিউরিটি চীফ যখন যাকে সন্দেহ করেন তখনই তাকে পরীক্ষা করান।'

'রবার্ট হল্ট,' বলে হাসল রানা।

'আপনি তাকে চেনেন?'

'আমাদের দেখা হয়েছে।'

কোন মন্তব্য না করে কাঁধ ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। উনি নিজের পরিচয় দেবেন না, বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল রানা। এলিভেটর পাতালে প্রায় নেমে এসেছে, এই সময় কানে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন অনুভব করল ও। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই এলিভেটর থেমে গেল, খুলে গেল দরজা। একটা মাইন শাফটের ভেতর দিয়ে পথ দেখানো হলো ওকে। শাফটটা শেষ হয়েছে অবজারভেশন প্ল্যাটফর্মে, নিচের বিশাল এক্সকাভেশন চেম্বারের পঞ্চাশ মিটার ওপরে ঝুলে আছে ওটা। গহ্বরের নিচে ইকুইপমেন্টগুলো রানার কাছে একদম নতুন, কোন মাইনিং অপারেশনে ব্যবহার করা হয় বলে ওর অন্তত জানা নেই। 'ওর' ভর্তি কার দেখা যাচ্ছে না, রেললাইন নেই, এমন কি কোন এক্সপ্লোসিভ বসানোর আয়োজনও চোখে পড়ছে না। আবর্জনা সরাবার জন্যে বিশাল আকৃতির ট্রাক দরকার হয়, তা-ও নেই। অল্প কিছু মানুষকে দিয়ে চালু রাখা হয়েছে কমপিউটারাইজড় একটা সিস্টেম-,

অত্যাধুনিক, সুশৃংখল। দৃশ্যমান একমাত্র মেকানাইজেশন বলতে মাথার ওপর প্রকাণ্ড ব্রিজটা, অসংখ্য সারিতে কেবল ঝুলে আছে, শেষ মাথায় বালতি, হীরে সমৃদ্ধ কাদা-মাটি-পাথর সারফেসে তুলে আনছে, সেগুলো খালাস করা হচ্ছে বিভিন্ন বিল্ডিঙে, ওখানে পাথরগুলো আলাদা করা হবে।

মাস্কের ভেতর থেকে কালো চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক। 'তানাবু আপনার সম্পর্কে সব কথা বলেনি আমাকে। আমি জানতেও চাই না। সে শুধু আমাকে জানিয়েছে যে আপনি একটা সাউন্ড চ্যানেল ট্রেস করতে চাইছেন। ওটা পানির তলা দিয়ে যাচ্ছে, আর সামুদ্রিক প্রাণী ও মানুষকে মেরে ফেলছে।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ধারণা ওই সাউন্ড এখানে তৈরি হচ্ছে?'

'আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে, মোট চারটে উৎসের মধ্যে ক্যান্ডি আইল্যান্ড একটা।'

মাথা ঝাঁকালেন মাইনার ভদ্রলোক। 'দক্ষিণে নিমবাস আর কোর, উত্তরে ক্যান্ডি আর রডগার।'

'অনুমান?'

'আমি জানি। এখানে আমরা যে-ধরনের পালসড্ আলট্রাসাউন্ড এক্সকাভেশন্ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছি, বাকি তিনটে দ্বীপে ওরাও তা-ই ব্যবহার করছে।' হাত নেড়ে খোলা গহ্বরটা দেখালেন ভদ্রলোক। 'আগে আমরা পাথর আর মাটি খুঁড়ে শাফট তৈরি করতাম, হীরের বড় আকারের ভাণ্ডার অনুসরণ করার জন্যে। কিন্তু রডনির বিজ্ঞানী আর এঞ্জিনিয়াররা নতুন একটা মেথড নিখুঁত করার পর প্রোডাকশন বারো গুণ বেড়ে গেছে। সেই থেকে পুরানো মেথড বাতিল করা হয়েছে।'

রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে গহ্বরের নিচে কি ঘটছে দেখছে রানা। বড় আকারের রোবোটিক ভেহিকেল উদয় হলো, লম্বা শাফট ঢোকাচ্ছে নীল কাদায়। তারপর একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন শুরু হলো, রানার পা হয়ে উঠে এল শরীরে। চোখে প্রশ্ন, এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের দিকে তাকাল ও।

'হীরে সমৃদ্ধ পাথর আর মাটি হাই-এনার্জি পালসড্ আলট্রাসাউন্ডের সাহায্যে ভাঙা হয়।' বড় আকৃতির একটা কংক্রিট কাঠামো দেখালেন ভদ্রলোক, কোন জানালা দেখা যাচ্ছে না। 'খাদের দক্ষিণ দিকে ওই বিল্ডিংটা দেখছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওটা একটা নিউক্লিয়ার জেনারেটিং প্ল্যান্ট। প্রতি সেকেন্ডে দশ থেকে বিশটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথরের মত শক্ত মাটি ভাঙতে হয়। যথেষ্ট এনার্জি পাবার জন্যে বিপুল শক্তি দরকার।'

রানা বলল, 'আপনাদের ইকুইপমেন্ট যে শব্দ তৈরি করছে, সেটা সাগরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্যাসিফিকে ছড়িয়ে থাকা রডনির অন্যান্য দ্বীপ থেকে নিক্ষিপ্ত এই একই শব্দ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় ইনটেনসিটি এত বেড়ে যাচ্ছে যে বিরাট এলাকা জুড়ে সামুদ্রিক প্রাণী বা মানুষ, কিছুই বাঁচছে না।'

'আপনার ধারণাটা ইন্টারেস্টিং, তবে সবটুকু আপনি বোঝেননি।'

'কি রকম?'

'নিচে ওখানে সাউন্ড এনার্জি যা তৈরি হচ্ছে তিন কিলোমিটার দূরের একটা ছোট মাছও তাতে মরবে না। আলট্রাসাউন্ড ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট যে সাউন্ড পালস ব্যবহার করছে তার অ্যাকুসটিক ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার থেকে আশি হাজার হার্টস। এই ফ্রিকোয়েন্সি সাগরের লবণ শুষে নেয়, খুব বেশি দূর যাবার আগেই।'

ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। 'কি করে বুঝব আপনি আমাকে ভুল বোঝাচ্ছেন না?'

মাস্কের ভেতর ভদ্রলোকের হাসি রানা দেখতে পেল না। 'আমার সঙ্গে আসুন,' বললেন তিনি। 'আপনার সংশয় দূর করার চেষ্টা করি।' এলিভেটরে চড়লেন তিনি, তবে বোতামে চাপ দেয়ার আগে রানার হাতে একটা অ্যাকুসটিক ফোম-হেলমেট ধরিয়ে দিলেন। 'হার্ড হ্যাট খুলে এটা পরে নিন। টাইটভাবে পরবেন, তা না হলে মাথা ঘুরবে। ওটায় ট্র্যান্সমিটার আর রিসিভার আছে, ফলে চিৎকার না করেও আলাপ করা যাবে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'একটা এক্সপ্লোরেটরি টানেলে। মূল গহ্বরের নিচে কাটা হয়েছে, পাথরের বড় ভাণ্ডারগুলো সার্ভে করার জন্যে।'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ভলক্যানিক রক কেটে তৈরি করা একটা মাইন শাফটে বেরিয়ে এল ওরা, শাফটের মাথায় সারি সারি বাঁশ সাজিয়ে ঠেক দেয়া হয়েছে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো তুলে মাথার দু'পাশ চেপে ধরল রানা। সমস্ত আওয়াজ ভোঁতা লাগলেও, কানের ভেতর ড্রামে অদ্ভুত একটা কম্পন অনুভব করছে ও।

'আমার কথা আপনি ঠিকমত শুনতে পাচ্ছেন তো?' এঞ্জিনিয়ার জানতে চাইলেন।

'তা পাচ্ছি,' খুদে মাইক্রোফোনে বলল রানা। 'তবে গুঞ্জনের ভেতর দিয়ে।'

'একটু পরই অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।'

'কি এটা?'

'শাফট ধরে একশো মিটার আমার সঙ্গে হাঁটুন, দেখিয়ে দেব কোথায় আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে।'

ভদ্রলোকের পিছু নিয়ে হাঁটছে রানা। একটা সাইড শাফটে পৌঁছুল ওরা। এটার মাথায় কোন ঠেক নেই। প্রায় গোলাকার ভলক্যানিক রক দিয়ে তৈরি শাফটের দুই পাশ, এত মসৃণ যে মনে হলো প্রকাণ্ড কোন বোরিং টুল দিয়ে ওগুলো পালিশ করা হয়েছে। 'থার্সটন লাভা টিউব,' বলল রানা। 'হাওয়াই-এর একটা বড় খনিতে এরকম দেখেছি আমি।'

'নির্দিষ্ট কিছু লাভা, এই যেমন ব্যাসলটিক বা কালো আগ্নেয় শিলা, পাতলা প্রবাহ সৃষ্টি করে, উঠে আসে সাইড বা পাশ ধরে, প্রবাহের ওপরের গা থাকে মসৃণ,' ব্যাখ্যা করলেন ভদ্রলোক। 'সারফেসের কাছাকাছি এসে লাভা যখন ঠাণ্ডা

হয়ে পড়ে, স্বভাবতই তখন তার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আরও গভীর ও আরও উত্তপ্ত স্রোত থামে না, বেরিয়ে আসে বাইরে, পিছনে রেখে আসে চেম্বার বা টিউব। বাতাসের এই পকেটগুলোয় আঘাত করে ওপরের মাইনিং অপারেশন থেকে সৃষ্ট পালসড্ আলট্রাসাউন্ড, ফলে একটা অনুরণন তৈরি হয়।'

'আমি যদি এখন মাথা থেকে হেলমেট খুলি, কি হবে?'

ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ইচ্ছে হলে খুলুন, তবে মজা পাবেন না।'

কান থেকে অ্যাকুসটিক-ফোম হেলমেট খুলে ফেলল রানা। আধ মিনিট পর বিহ্বল ও দিশেহারা বোধ করায় টিউবের দেয়াল ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল। তারপর শুরু হলো বমি বমি ভাব, ক্রমশ বাড়ছে। হাত বাড়িয়ে হেলমেটটা রানার মাথায় পরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, তারপর এক হাতে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরলেন। 'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা ঘোরা আর বমি ভাব দ্রুত দূর হতে বড় করে একটা শ্বাস নিল রানা। 'এই কষ্ট পাওয়াটা আমার দরকার ছিল। এখন আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি দুর্ভাগা লোকগুলো মারা যাবার সময় কি সাংঘাতিক ভুগেছে।'

ভদ্রলোক ওকে এলিভেটরের দিকে ফিরিয়ে আনছেন। কান ভোঁ ভোঁ করা ছাড়া এখন পুরোপুরি সুস্থ রানা। গোটা ব্যাপারটা এখন জানা হয়ে গেছে ওর। অ্যাকুসটিক প্লেগের উৎস চিনে ফেলেছে। ধ্বংসাত্মক কাজটা কিভাবে করা হয় বোঝে। এটা বন্ধ করার উপায় সম্পর্কেও ধারণা আছে। 'ব্যাপারটা তো এই রকম,' নিঃসন্দেহ হবার জন্যে বলল ও। 'লাভার ভেতর এয়ার চেম্বার হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ড পালস অনুনাদ বা প্রতিধ্বনি হিসেবে পাথরের ভেতর দিয়ে সাগরে পাঠিয়ে দেয়, সৃষ্টি করে এনার্জির অবিশ্বাস্য একটা বিস্ফোরণ।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' হেলমেট খুলে পাতলা চুলে আঙুল চালালেন ভদ্রলোক। 'সাউন্ড ইনটেনসিটির সঙ্গে রেজোনান্স যোগ হওয়ায় অবিশ্বাস্য এনার্জি তৈরি হয়, খুন করার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তারচেয়ে অনেক বেশি।'

হঠাৎ গোটা ব্যাপারটা রানার কাছে অবাস্তব বলে মনে হলো। কেউ কি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে? শুধু হীরের উৎপাদন বহুগুণ বাড়াবার জন্যে কেউ কি পাইকারী হারে মানুষ খুন করবে? নাহ্, তা কি করে হয়। 'রডনির উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো? শুধু হীরের উৎপাদন বাড়ানো?' খনি তো কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না, হীরেগুলো আস্তে-ধীরে তুললে ক্ষতি কি?

'এই ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়,' ভদ্রলোক গম্ভীর সুরে বললেন। 'আপনার মত আমিও বিশ্বাস করি না শুধু উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে এই পালসড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। রডনির মনে নিশ্চয়ই আরও বড় কোন পাপ আছে।'

'কি হতে পারে সেই পাপ?'

'আমি শুধু অনুমান করতে পারি।'

'প্লীজ।'

'রডনি হয়তো প্যাসিফিকের নির্দিষ্ট একটা এলাকা খালি করে ফেলতে চাইছেন,' এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক বললেন। 'এলাকার দ্বীপগুলো তাঁর হয়তো

দরকার। শত শত দ্বীপ, একটাও তাঁর বাপের সম্পত্তি নয়, কাজেই খালি করতে হলে ভয় দেখিয়ে মানুষজনকে তাড়াতে হবে। সেই ভয় দেখাতে গিয়েই হয়তো নতুন এই প্রযুক্তিটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।'

মনে মনে চমকে উঠল রানা। আইডিয়াটা সত্যি হবারই সম্ভাবনা। 'কিন্তু এতগুলো দ্বীপ কেন তিনি দখল করতে চাইবেন?'

'শুনেছি, তবে গুজবই বলতে পারেন, প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি এলাকায় যত দ্বীপ আছে তার প্রায় শতকরা সত্তরটায় নাকি হীরে পাবার প্রচুর সম্ভাবনা।'

রানার মাথা ঘুরছে, তবে এবার অন্য কারণে। লোভ কি মানুষকে এতটা ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে? হীরের লোভে লাখ লাখ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলার কথা ভাবছেন রডনি বুমার, তাঁর বিবেক বা মনুষ্যত্বে বাধছে না?

তারপর রানা ভদ্রলোককে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'এই সব আমাকে দেখিয়ে নিজের প্রাণের ওপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি। কেন?'

ভদ্রলোকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, জাম্পসুটের পকেটে হাত ভরলেন তিনি। 'কথাটা একটু কাব্য করে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। যদিও তাতে আপনি আমার পরিচয় ধরে ফেলবেন। দেখুন, আমি এমন এক জাতির প্রতিনিধিত্ব করি, যারা একটি ফুলকে বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করে। আরও যদি একটু ব্যাখ্যা করতে বলেন, তাহলে শুনুন। রডনি বুমার স্রেফ গরল। বেশিরভাগ এঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী আর সাধারণ শ্রমিককে মোটা বেতন-বোনাসের লোভ দেখিয়ে বোকা বানাতে পারলেও, সবাইকে পারেননি। যাদেরকে পারেননি, আমি তাদের দলে। তবে আমি যে তাদের বিরুদ্ধে, এটা ওরা এখনও জানে না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার দরকার করে না, রডনি বুমার ভয়ঙ্কর একটা প্ল্যান ফেঁদেছেন। আমাকে আপনি বিদ্রোহী বলতে পারেন, অমানবিক কাজ সমর্থন করতে পারি না।'

'আপনারা কি এখানে বন্দী?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কতজন বাঙালী আছেন এখানে?'

'খুব কম, সব মিলিয়ে পাঁচজন এঞ্জিনিয়ার আর বিশজনের মত শ্রমিক।'

'রডনিকে আপনি কখনও দেখেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'মাত্র একবার। স্রেফ গরল। তবে তাঁর রক্ষিতাকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। পাউলা পার্কার একটা বিষাক্ত সাপ।'

'আচ্ছা!'

'গায়ে বুনো ষাঁড়ের শক্তি। আমি তাকে দেখেছি এক হাতে ধরে একজন লোককে শূন্যে ঘোরাচ্ছে।'

এলিভেটর সারফেস লেভেলে নেমে এল, থামল মেইন লিফট বিল্ডিঙে। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। একটা ফোর্ড ভ্যান ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেল, আড়চোখে সেটার দিকে একবার তাকালেন ভদ্রলোক। তাঁর পিছু নিয়ে মেস হলের বাঁক ঘুরল রানা, পৌঁছে গেল কিচেনের পাশে ডাস্টবিনের সামনে। ইঙ্গিতে তিনি রানার জাম্পস্যুটটা দেখালেন। 'ওটা একজন জিওলজিস্টের, তার ফ্লু হয়েছে। সে খুঁজতে শুরু করার আগেই জায়গামত রেখে আসতে হবে।'

জাম্পসুটটা খুলে দিল রানা।

'আপনার ইন্ডিয়ান বন্ধুরা নিজেদের বোটে ফিরে গেছে।' ফুড-স্টোরেজ লোডিং ডক-এর দিক ইঙ্গিত করলেন ভদ্রলোক। ট্রাক্টর আর ট্রেলার চলে গেছে। 'এইমাত্র যে ভ্যানটা গেল, ওটা পারসোনেল শাটল, দু'মিনিট পর ফিরে আসবে। হাত তুলে ড্রাইভারকে থামাবেন, টানেল দিয়ে নিয়ে যেতে বলবেন।'

'ড্রাইভার জানতে চাইবে না, আমি একা কেন রয়ে গেছি?'

পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে কিছু লিখলেন ভদ্রলোক, কাগজটা ছিঁড়ে ভাঁজ করলেন, তারপর রানার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এটা ওকে দেবেন। আপনার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। সিকিউরিটি গার্ডরা দেখে ফেলার আগেই কাজে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে।'

রানা তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি গর্বিত। আর সাহায্য করার জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। গুড লাক।'

পাঁচ মিনিট পর ভ্যানটাকে আবার দেখা গেল। হাত দেখিয়ে ড্রাইভারকে থামাল রানা। সে আসলে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডই। রানার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল। কথা না বলে তার হাতে কাগজটা গুঁজে দিল রানা। পড়ার পর সে বলল, 'ঠিক আছে, বসুন সীটে। টানেলের শেষ মাথায়, সার্চ হাউস পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।'

দরজা বন্ধ করে ড্রাইভার ভ্যান ছেড়ে দিতে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে দোমড়ানো কাগজটা তুলে নিল রানা। তাতে লেখা রয়েছে—

> 'এই-হাইডা জেলে বাথরুমে ছিল, তার বন্ধুরা না বুঝে তাকে ফেলে চলে গেছে। ফিশিং বোটগুলো ফিরে যাবার আগেই তাকে ডকে পৌঁছে দেবেন, প্লীজ। শাহিন চৌধুরী, চীফ ফোরম্যান।'

সিকিউরিটি বিল্ডিঙের সামনে থামল ভ্যান। ওখানে আবার এক্স-রে করা হলো। অ্যানাটমিক্যালি সার্চ করার পর ডাক্তার মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। তোমার সঙ্গে কোন হীরে নেই।'

'চায়টা কে?' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল রানা। 'পাথর কি খাওয়া যায়? পাপ বা অভিশাপ যাই বলা হোক, সাদারা দায়ী। ইন্ডিয়ানরা হীরে নিয়ে খুনোখুনি করে না।'

'তোমার দেরি হলো কেন? বাকি সবাই তো বিশ মিনিট আগেই এক্স-রে করিয়ে চলে গেল।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' আড়ষ্ট হেসে বলল রানা, দ্রুত কাপড় পরছে।

বাইরে বেরিয়ে ছুটল ও, হাঁপাতে হাঁপাতে ডকে পৌঁছুল। শেষ মাথা পঞ্চাশ মিটার দূরে থাকতে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল। উদ্বেগ আর ভয় গ্রাস করছে। সর্বনাশ! চ্যানেল ধরে পাঁচ কিলোমিটার দূরে চলে গেছে জেলেদের ফিশিং বোট। শত্রুদের মাঝখানে ক্যান্ডি দ্বীপে একা আটকা পড়েছে ও।

বড় একটা ফ্রেইটার কার্গো খালাস করছে ডকে, উল্টোদিকে পানিতে ভাসছে রডনি বুমারের ইয়ট। বড় আকারের কন্টেইনারগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিল

রানা, ব্যস্ত লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে জাহাজটার দিকে এগোচ্ছে। ওই ফ্রেইটারই ওকে এখন ক্যান্ডি থেকে উদ্ধার করতে পারে। যেভাবেই হোক জাহাজটায় চড়তে হবে ওকে।

রেইলিঙে হাত দিল রানা, সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা।

'এই ব্যাটা জেলে, থামো তুমি,' একদম শান্ত গলায় নির্দেশ এল পিছন থেকে। 'বোট মিস করেছ, তাই না?'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা, তারপরই স্থির পাথর হয়ে গেল শরীর, অনুভব করল হার্টবিট দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একটা কন্টেইনারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যাডিস্টিক ব্রড, আয়েশ করে টান দিচ্ছে চুরুটে। পাশে একজন গার্ড, হাতের এম-ওয়ান অ্যাসল্ট রাইফেল সরাসরি রানার বুকে তাক করা। হল্টের অফিসে যাকে মেরেছিল, এ সে-ই। রানার হার্টবিট তিনগুণ হয়ে গেল গার্ডের পিছন থেকে স্বয়ং হল্টকে বেরিয়ে আসতে দেখে। রানার দিকে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিটায় শীতল কর্তৃত্ব ফুটে আছে, মানুষের জীবন যেন তার হাতের মুঠোয়। 'বাহ, বেশ। বাহ, বেশ। এখানে আমরা একজন গোঁয়ার মানুষের সাক্ষাৎ পাচ্ছি।'

'শাটল ভ্যানে চড়ার সময়ই চিনে ফেলি আমি ওকে,' গার্ড বলল, দাঁত বের করে হাসছে। এগিয়ে এসে রানার পেটে রাইফেলের মাজল চেপে ধরল সে। 'আমাকে মারা হয়েছে, এখন সেই মারটা ফেরত দেয়া হবে।'

সরু আর গোল মাজল পেটের গভীরে ডেবে যাওয়ায় কুঁজো হয়ে গেল রানা, মাংস ভেদ না করলেও চামড়া অক্ষত থাকেনি। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল ও, কোন কথা বলল না।

আবার আঘাত করার জন্যে রাইফেল তুলল গার্ড, তবে বাধা দিল হল্ট। 'থাক, কিকুই। আগে উনি ব্যাখ্যা করুন একই অপরাধ বারবার কেন করছেন। তারপর ওঁকে নিয়ে যত ইচ্ছে খেলো তুমি।' রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসল। 'একটা টিপস দিই, মি. রানা। কিকুই যখন মারবে, কোন শব্দ করবেন না। ওর ভিক্টিম যত শব্দ করে, ও তত রেগে যায়, ফলে মারার প্রতিটি পর্ব শুধু লম্বা হতে থাকে।'

ওদের কথায় তেমন কান দিচ্ছে না রানা, মরিয়া হয়ে পালাবার কি উপায় করা যায় ভাবছে। ইচ্ছে করলে এক ছুটে ডক পেরিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিতে পারে। কিকুই গুলি করে মাছের খাদ্য বানিয়ে ফেলবে ওকে। গুলি যদি না-ও লাগে, ঠাণ্ডায় মারা যাবে। তার আগে হাঙরের হামলা ঠেকাতে হবে। নাহ, কোন এভিনিউ খোলা নেই। 'আমাকে যদি হুমকি বলে মনে করেন, তাহলে বলতে হবে আপনাদের কল্পনাশক্তি খুবই উর্বর,' সময় পাবার আশায় বিড় বিড় করল রানা।

সোনালি কেস বের করে অলসভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল হল্ট। 'শেষবার আমাদের দেখা হবার পর আপনার সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি, মি. রানা। যাদের বিরোধিতা করেন তাদের জন্যে আপনি শুধু হুমকি নন, ভয়ঙ্কর বিপদ। আপনি মাছ আর কেল্প স্টাডি করার জন্যে রডনি বুমারের প্রপার্টিতে অনুপ্রবেশ করেননি। অসৎ ও অশুভ কোন উদ্দেশ্য আছে আপনার। সেটা কি, এখন আপনি তা ব্যাখ্যা করে বলবেন আমাকে।'

'সময় কোথায়?' বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'আমাকে জেরা বা টরচার করার সুযোগ আপনারা পাবেন না।'

হল্ট বোকা নয় যে সহজে ধোঁকা দেয়া যাবে। তবে সে জানে যে রানা সাধারণ কোন ডায়মন্ড স্মাগলার নয়। ওর চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই দেখে তার মনের কোণে খুদে অ্যালার্ম বেজে উঠল। কৌতূহল হচ্ছে তার, সঙ্গে সামান্য অস্বস্তি। 'মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, খবর নিতে গিয়ে আপনার সম্পর্কে খানিকটা শ্রদ্ধা জেগেছে আমার মনে, কাজেই সস্তা ধোঁকা দিয়ে পার পেতে চেষ্টা করলে সে-টুকু আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

মুখ তুলে আকাশে চোখ বুলাল রানা। 'আমার ফিরতে দেরি হলে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নিমিজ থেকে এক স্কোয়াড্রন ফাইটার আসার কথা,' বলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। 'আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমি নুমার একজন অফিসার। যে-কোন মুহূর্তে চলে আসবে ওগুলো।'

'তা জেনেছি। আপনার মত নগণ্য এক অফিসারের জন্যে কানাডার একটা দ্বীপে আমেরিকা ফাইটার পাঠাবে, এ-কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

'আমি নগণ্য, তা ঠিক, তবে আমার বস্ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন এয়ার অ্যাটাকের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।'

পলকের জন্যে হল্টের চেহারা কালো হয়ে গেল দেখে রানা ভাবল, বোধহয় বিশ্বাস করেছে। কিন্তু তারপরই শয়তানী হাসি ফুটল লোকটার মুখে, শান্ত ভঙ্গিতে দু'পা এগিয়ে এসে দস্তানা পরা হাত দিয়ে রানার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল। হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল রানা, অনুভব করল ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। 'আর কোন গাঁজাখুরি গল্প নয়। শুধু প্রশ্ন করা হলে মুখ খুলবেন।' ব্রড আর কিকুইয়ের দিকে তাকাল হল্ট। 'ওকে তোমরা আমার অফিসে নিয়ে যাও। ওখানেই ইন্টারোগেট করা হবে।'

রানার মুখে হাতের তালু ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল ব্রড, আবার হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো রানা। 'ওকে আমরা ভ্যানে না তুলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাই, স্যার। পথে খানিকটা নরম করা যাবে...'

'থামো তোমরা!' ইয়টের ডেক থেকে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের নির্দেশ ভেসে এল। রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে রয়েছে পাউলা পার্কার। সাদা একটা টার্টলনেকের ওপর উলেন কার্ডিগান পরেছে সে, স্কার্টটা খুবই ছোট। সাদা মোজা পরা পায়ে লম্বা কাফস্কিন রাইডিং বুট। মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা চুল কাঁধে ফেরত পাঠাল, ইঙ্গিতে গ্যাংওয়েটা দেখিয়ে বলল, 'ওঁকে ইয়টে নিয়ে এসো।'

হল্ট আর ব্রড দৃষ্টি বিনিময় করল। রানাকে নিয়ে গ্যাংওয়ের দিকে রওনা হলো ওরা। পিছন থেকে ওর পিঠে অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে আরও দু'একটা গুঁতো মারল কিকুই। ইয়টে ওঠার পর টিক দরজা দিয়ে মেইন সেলুনে ঢোকানো হলো ওকে।

একটা ডেস্কের কিনারায় বসে আছে পাউলা, টপটা ইটালিয়ান মার্বেল। তার স্কার্ট উরুর অর্ধেকটাও ঢাকতে পারেনি, চামড়ার সঙ্গে সেঁটে আছে। দীর্ঘ, পুরুষালি গঠন। হল্ট, ব্রড বা কিকুই তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

তবে রানা একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল, সেলুনের চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। সেলুনটা সাজানোর মধ্যে আরাম-আয়েশ বা বিলাসিতার কোন অভাব নেই। 'বাহ্, সুন্দর,' মন্তব্য করল ও।

'মিস পার্কারের সামনে মুখ বুজে থাকবে,' ধমক দিল কিকুই, আবার মারার জন্যে রাইফেলের বাঁট তুলল।

পায়ের ওপর ঘুরল রানা, এগিয়ে আসা রাইফেলটা এক হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিল, অপর হাত দিয়ে কিকুইয়ের তলপেটে প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগাল। ব্যথায় ও রাগে গুঙিয়ে উঠল কিকুই, কুঁজো হয়ে গেল, হাত থেকে ছেড়ে দিল রাইফেলটা, দু'হাতে তলপেট চেপে ধরেছে।

কেউ নড়ার আগেই মোটা কার্পেট থেকে অস্ত্রটা তুলে হতভম্ব হল্টের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'ওকে সামলে রাখুন, প্লীজ। ওর ছোঁয়া নোংরা লাগছে আমার।' পাউলার দিকে তাকাল। 'জানি একটু সকাল সকাল হয়ে যাচ্ছে, তবু গলাটা ভেজাতে পারলে মন্দ হত না। অন্য কিছু না থাকলেও, আপনাদের এই ভাসমান ভিলায় কফি বা চায়ের কোন ব্যবস্থা নেই?'

শান্ত ও নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে পাউলাকে। হল্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটনা, খুলে বলো আমাকে।'

'লোকাল ফিশারম্যানের ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদের সিকিউরিটি পেনিট্রেট করেছেন উনি,' বলল হল্ট। 'নুমার সঙ্গে আছেন, অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

'এভাবে মাইনে ঢোকার কারণ কি?'

'জানার জন্যে আমার অফিসে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এই সময় আপনি ডাকলেন।'

ডেস্কের কিনারা থেকে নামল পাউলা, উপস্থিত সবার চেয়ে সামান্য হলেও লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। 'কি ব্যাপার, মি. রানা? এ-সব আমি কি শুনছি?'

হল্টকে বিস্মিত দেখাল, 'আপনি ওঁকে চেনেন, মিস পার্কার?'

'তুমি চুপ করো তো,' ধমক দিল পাউলা, রানার দিকে তাকাল। 'মি. রানা, কি ব্যাপার?'

'এদিকে আমি রাসায়নিক দূষণ স্টাডি করছি,' বলল রানা। 'সিকিউরিটি এত কড়া, আপনাদের ক্যান্ডিতে ঢোকাই যায় না, তা-ই বাধ্য হয়ে ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে।'

হল্ট বলল, 'মিথ্যে কথা! নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব নিয়ে এসেছেন!'

মাথা নাড়ল পাউলা। 'আপনি সত্যি কথা বলছেন না, মি. রানা। সত্যি কথা না বললে আমি কিন্তু আপনার কোন সাহায্যে আসব না।'

'তাহলে শুনুন। অবশ্য সবই আপনাদের জানা। হীরে সংগ্রহ করার জন্যে এখানে পালসড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়। ফলে একটা তীব্র প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হচ্ছে, সেই প্রতিধ্বনি পানির ভেতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। রউনি বুমারের অন্যান্য দ্বীপের মাইনিং অপারেশন থেকে রওনা হয়ে এই পালসগুলো প্রশান্ত মহাসাগরে যেখানে মিলিত হচ্ছে সেই এলাকায় বিরাট জায়গা জুড়ে সমস্ত প্রাণী মারা যাচ্ছে।'

'এরকম একটা উদ্ভট ধারণা কোত্থেকে হলো আপনার?' চেহারা কালো হয়ে

গেলেও, জোর করে হাসতে চেষ্টা করল পাউলা।

'শুধু উদ্বেগ নয়, আতঙ্কের বিষয় হলো,' পাউলার কথায় কান না দিয়ে বলল রানা, 'রডনি বুমার এমন একটা অস্ত্র পেয়ে গেছেন যেটা পারমাণবিক বোমার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়, অন্তত প্রাণী হত্যায় এটার জুড়ি নেই। এখন আরও জানা গেছে যে রডনি বুমার প্যাসিফিকের কয়েক হাজার দ্বীপ খালি করতে চান। পালসড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে মানুষ মারছেন তিনি। তারপরও যদি লোকজন দ্বীপগুলো ছেড়ে না পালায়, এই অস্ত্র তিনি আরও ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করবেন।'

'আপনি এমন সব কথা বলে ফেলেছেন, আমি কেন, ঈশ্বরেরও সাধ্য নেই আপনাকে সাহায্য করে।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পাউলা। হল্ট আর ব্রডের দিকে তাকাল সে। 'এই ভদ্রলোক সাংঘাতিক বিপজ্জনক এলিমেন্ট। রডনি মাইনিং কোম্পানীর জন্যে ভয়ঙ্কর একটা হুমকি। ওঁকে তোমরা আমার বোট থেকে নামিয়ে নিয়ে যাও, তারপর যা খুশি করো–আমি শুধু চাইব, উনি যেন আর কখনও আমাদেরকে বিরক্ত না করেন।'

মৃদু হাততালি দিল রানা। 'প্রাণ বাঁচানোর এই প্রতিদান, মিস্ পার্কার?'

'আপনি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন,' বলল পাউলা, রাগে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা। 'আপনার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে, কাজেই সব কথা স্বীকার করতে অসুবিধে নেই। রডনি বুমারকে ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই। কোন সরকার বা লিগ্যাল অথরিটি কিছুই করতে পারবে না তার। অন্তত আগামী সাতাশ দিনের মধ্যে তো নয়ই। ততদিনে আমাদের বেশ কয়েকটা দ্বীপের খনি আমরা বন্ধ করে দেব। হ্যাঁ, নতুন কয়েক হাজার দ্বীপ আমাদের দখলে চলে আসবে। সেখানে যদি হাজার হাজার বা লাখ লাখ সামুদ্রিক প্রাণী আর মানুষ মারা যায়ও, তার জন্যে আমাদেরকে দায়ী করা যাবে না। প্রমাণ কোথায়? যে অস্ত্রের কথা আপনি বলছেন, সেটা তখন আমাদের কাছে থাকবে না, সব নষ্ট করে ফেলা হবে।'

'লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে, সবাই বুঝতে পারবে রডনি বুমার দায়ী, কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাঁর বিচার করা যাবে না, এটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

'ধরুন বিশ্ব-বিবেক খুব বেশি হৈ-চৈ শুরু করেছে। পরিস্থিতি রডনি বুমারের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তখন আমরা কি করব, তা-ও বলে দিচ্ছি। খনির একজন মালিক কি নিজে পাথর বা মাটি খোঁড়া প্রত্যক্ষ করেন? না। এ-সব কাজ তাঁর বেতনভুক কর্মচারী অর্থাৎ বিজ্ঞানী আর এঞ্জিনিয়াররা করেন। রডনি বুমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। সবার আগে তাঁদের বিরুদ্ধে তিনিই মামলা দায়ের করবেন আদালতে। হলো? জবাব পেলেন?'

'কিন্তু এত কেন লোভ তাঁর? বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক, তারপরও খাই মিটছে না? কি হবে এত টাকা?'

'টাকাই ক্ষমতা, মি. রানা। টাকা থাকলে আপনাকে ঈশ্বরের ভূমিকাতেও মানিয়ে যাবে।' হাসছে পাউলা। 'আপনি একজন মিসকিন, একজন বাংলাদেশী,

এ-সব ঠিক বুঝবেন না। ভাল কথা, একা শুধু আমাকে নয়, মলিকেও আপনি উদ্ধার করেছেন, চিরবিদায়ের আগে তাকে আপনার কিছু বলার আছে? আমি জানি, আপনার প্রতি তার খুব টান।'

'বলবেন, আমি তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় দেখা করব।'

পাউলা হেসে উঠল। 'হল্ট আপনাকে সে সুযোগ দিলে তো। তবে না, মলি অস্ট্রেলিয়ায় নেই, ওয়াশিংটনে চলে গেছে। আপনি শুনে বিমর্ষ হবেন, সে তার বাবার নির্দেশে নুমায় অনুপ্রবেশ করেছে, ডেডলি সাউন্ড ওয়েভ সম্পর্কে নুমার তদন্ত কতটুকু এগোল জেনে নিয়ে রডনিকে খবর পাঠাবে।'

'কথাটা যদি সত্যি হয়, খুবই দুঃখের বিষয়। তাঁর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, সী লাইফ রক্ষার কাজে নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছেন।'

'রডনি তার দুই ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে শুনে মলি বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। বুঝতে পেরেছে, সী লাইফ রক্ষার বিলাসিতা এখন আর তার সাজে না। আমার জায়গায় এখানে যদি মলি থাকত, আজ একই পরিণতি হত আপনার–সে-ও হল্টকে নির্দেশ দিত আপনাকে যেন মেরে ফেলা হয়।' হল্টের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল পাউলা। 'নিয়ে যাও ওকে।'

ব্রড জানতে চাইল, 'অনেক তথ্যই চেপে গেছে ও, সেগুলো আদায় করতে পারি কিনা?'

'এ কি জিজ্ঞেস করতে হয়?' চোখ গরম করল পাউলা। 'ক্যান্ডিতে কেউ না কেউ ওকে সাহায্য করেছে, তা না হলে এত তথ্য পেলেন কোথায়? জেরা করে তার বা তাদের পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারপর সবাইকে একই গর্তে পুঁতে ফেলো।'

রানার দু'পাশে থাকল হল্ট আর ব্রড, পিছনে কিকুই, গ্যাংওয়ে ধরে নিচে নেমে ডক পেরুচ্ছে, সামনে অপেক্ষা করছে একটা ভ্যান। সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্টের বড় আকারের কন্টেইনারগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা, খানিক আগে কার্গো শিপ থেকে খালাস করা হয়েছে ওগুলো। ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ বাকি সব শব্দকে চেপে রাখছে, ক্রেন অপারেট করছে ওগুলো। হঠাৎ হাত-পা ছড়িয়ে ডকের ওপর পড়ে গেল ব্রড। সে পড়ে যাবার পর বন করে সিকি পাক ঘুরল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে আক্রমণ ঠেকাবার একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেলেছে, জানে না কি ঘটল। ঘুরেই দেখতে পেল হল্টের চোখের মনি খুলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তারপর ভারী বস্তার মত সে-ও ডকের ওপর পড়ে গেল। ওদের কাছ থেকে কয়েক পা পিছনে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে কিকুই, যেন একটা লাশ–আসলেও তাই।

কিকুইয়ের ঘাড়ে মরণ কোপ থেকে শুরু, শেষ হয়েছে হল্টের খুলি ফাটানোর মধ্যে দিয়ে, সময় লেগেছে চার কি পাঁচ সেকেন্ড।

রানার বাঁ হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলল তানাবু, হাতে এখনও একটা স্টীল রেঞ্জ। 'জলদি, লাফ দিন।'

হতভম্ব রানা, ইতস্তত করছে। 'কোথায় লাফ দেব?'

'কি আশ্চর্য! পানিতে!'

পাঁচ কদম দৌড়ে দু'জনেই লাফ দিয়ে পড়ল সাগরে, কার্গো শিপের বো থেকে কয়েক মিটার সামনে। হিম ঠাণ্ডা পানি অবশ করে দিল রানাকে, প্রাণপণে সাঁতার কেটে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছে। 'এরপর কি?' তানাবুকে জিজ্ঞেস করল ও, পাশেই রয়েছে সে।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে পানি ছিটিয়ে তানাবু বলল, 'ওয়াটারক্রাফট। ফিশিং বোট থেকে নামিয়ে জেটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।

'বোটে ওয়াটারক্রাফট ছিল? দেখিনি তো।'

'গোপন একটা কমপার্টমেন্টে ছিল,' বলল তানাবু, দাঁত বের করে হাসছে। 'কেউ বলতে পারে শেরিফকে ফাঁকি দিয়ে কখন শহর ছাড়তে হয়?' একটা কংক্রিট পাইলিং-এর পাশে একজোড়া ডিউয়ো থ্রী-হানড্রেড ওয়েটজেট ভাসছে, হাত বাড়িয়ে ধরল সেটা। 'চালাতে জানেন?'

'জানি,' বলে ওয়েটজেটের ওপর উঠে পড়ল রানা, দু'পা ফাঁক করে বসে পড়ল সীটে।

'ডক আর আমাদের মাঝখানে কার্গো শিপটাকে রাখতে পারলে, অন্তত আধ কিলোমিটার পর্যন্ত ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না। তারপর গুলি লাগাতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

স্টার্টারে থাবা মারল ওরা, মডিফায়েড এঞ্জিন গর্জে উঠল। রানার এক মিটার সামনে তানাবু, ডকের নিচে থেকে কামানের গোলার মত বেরিয়ে এল ওরা। ওয়াটারক্রাফটের নাক দ্রুত ঘুরে গেল, কার্গো শিপের বো ঘুরে ছুটল দু'জন, খোলটাকে শীল্ড হিসেবে ব্যবহার করছে। পিছন ফিরে একবারও তাকায়নি রানা, হ্যান্ডেলবারের ওপর ঝুঁকে ট্রিগার থ্রটল ঠেলে রেখেছে, অপেক্ষায় আছে আশপাশের পানিতে বুলেট বৃষ্টি শুরু হবে। তবে কিছুই ঘটল না, হল্টের সিকিউরিটি টীম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারেনি এখনও।

ওরা যেন পানির ওপর মোটরসাইকেল চালাচ্ছে, ওয়াটারক্রাফট সেভাবেই তৈরি। স্পীড বাড়িয়ে তানাবুর পাশে চলে এল রানা। 'ওরা পিছু নিলে বাঁচার কোন আশা নেই।'

'চিন্তা করবেন না,' পাল্টা চিৎকার করল তানাবু। 'ওদের পেট্রল বোটের চেয়ে আমাদের স্পীড বেশি।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে ক্যান্ডি। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আবর্জনার স্তূপ ছাড়িয়ে দ্বিতীয় ডিফেন্ডারটাকে আকাশে উঠতে দেখে। এক মিনিটও কাটল না, চ্যানেলের ওপর দিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল ওটাকে, সরাসরি ধাওয়া করছে ওদেরকে। 'কিন্তু হেলিকপ্টারকে ফাঁকি দেব কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

উত্তেজনায় তানাবুর তামাটে চেহারা চকচক করছে। 'ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' হাসছে সে। 'আপনি ঠিক আমার পিছনে থাকুন।'

ঘরমুখো ফিশিং বোটগুলো দ্রুত কাছে চলে এল, তবে বাঁক নিয়ে ওগুলোকে এড়াল তানাবু; তার ওয়াটারক্রাফট ইসাবেলা দ্বীপপুঞ্জের একটা পাথুরে দ্বীপ লক্ষ করে ছুটছে। পাঁচ মিটার পিছিয়ে পড়েছে রানা। পাথুরে দ্বীপ আর মাত্র কয়েকশো

মিটার সামনে, আর ওদের এক কিলোমিটার পিছনে রডনির সামরিক হেলিকপ্টার।

রানার বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক করছে। তানাবু যা-ই বলুক, প্রাণে বাঁচার কোন পথ ওর চোখে অন্তত এখনও ধরা পড়ছে না। সামনে ওটা দ্বীপ নয়, পাথরের খাড়া পাঁচিল, আক্ষরিক অর্থেই তীর বা সৈকত বলতে কিছু নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, ঢেউগুলো সরাসরি পাঁচিলের গায়ে আছাড় খাচ্ছে। হ্যান্ডলবার যত জোরে সম্ভব চেপে ধরল ও। পাঁচিলে লেগে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে ঢেউ, বিরতিহীন তুমুল গর্জনে কান পাতা দায়। বিস্ফোরণের ফলে ফেনা আর পানির কণা ছড়িয়ে পড়ছে, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাহাড়-প্রাচীর। আর তীব্র বেগে ওটার দিকে এগোচ্ছে ওরা। সংঘর্ষ ঠেকায় কে! স্বেচ্ছায় মরতে যাচ্ছে ওরা।

হেলিকপ্টার প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে। তবে একা শুধু রানা নয়, পাইলটও ওদের আত্মঘাতী আচরণ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। কিছুই করছে না সে, জোড়া ৭.৬২ মেশিন গান ওদের দিকে তাক করতেও ভুলে গেছে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে অবধারিত সংঘর্ষ দেখার জন্যে, আর লক্ষ রাখছে প্রাচীরের সঙ্গে যেন কপ্টার ধাক্কা না খায়।

আর একশো মিটার, তারপরই ওরা দু'জন ছাতু হয়ে যাবে। এভাবে আত্মহত্যা করতে কারই বা মন চায়, রানার ইচ্ছে হলো ওয়াটারক্রাফটের স্পীড কমিয়ে দেয়, মরতে ইচ্ছে হয় একা মরুক তানাবু। অবশ্য পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা না খেলেও মরতে হবে রানাকে, কপ্টার থেকে গুলি করা হবে ওকে। গুলি খেয়ে মরা তবু ভাল, তার আগে অন্তত লাফ দিয়ে পানিতে পড়ার একটা সুযোগ থাকবে ওর, ডুব দিয়ে পাঁচিলের গায়ে সেঁটে থাকতে পারবে। কিন্তু না, স্পীড কমাবার ইচ্ছে বাতিল করে দিল রানা। বিশ্বাস করা যায় এমন লোক আশ্বাস দিলে তার ওপর নির্ভর করতে হয়। কোর্স ঠিক রাখল ও। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আয়ু ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

সুচের পিছনে যেমন ফুটো থাকে, ফাঁকটা ঠিক সেরকম মনে হলো। পাঁচিলের গায়ে। খুব বেশি হলে দু'মিটার চওড়া। ওই সরু ফাঁকের ভেতর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল তানাবু। রানার ভয় হলো প্রবেশমুখের দু'পাশে ওয়াটারক্রাফটের হ্যান্ডেলবার না ঘষা খায়। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, নির্বিঘ্নেই ঢুকে পড়ল রানা। ফাঁকের ভেতর সিলিং অনেক ওপরে, ইংরেজি হরফ ভি-র মত আকৃতি। ওর সামনে স্পীড কমিয়ে ওয়াটারক্রাফট থামিয়ে ফেলল তানাবু, লাফ দিয়ে একটা পাথরের ওপর নামল, কোট খুলে মরা কেল্প ভরছে ভেতরে। দেখতে দেখতে ফুলে উঠল কোট। কোন প্রশ্ন নয়, দেখাদেখি রানাও তাই করছে।

মুণ্ডুবিহীন ধড়ের মত দেখতে হলো কোট দুটো। গুহার মুখের কাছে ভাসছে ওগুলো। একটু পরই স্রোতের টানে বেরিয়ে গেল বাইরে। 'এভাবে কি ওদেরকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল রানা, গলায় সন্দেহ।

'বাজি ধরতে পারেন,' বলল তানাবু। 'পাহাড়ের পাঁচিল কাত হয়ে আছে, ফাঁকের মুখটা আকাশ থেকে দেখাই যায় না।' হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনার

জন্যে কান পাতল। মিনিট দশেক অপেক্ষা করবে ওরা, তারপর ক্যান্ডিতে ফিরে গিয়ে হল্টের কাছে রিপোর্ট করবে–পাথরে আছাড় খেয়ে আমাদের ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে।'

ঘটলও ঠিক তাই। মিনিট সাতেক পর দূরে মিলিয়ে গেল হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

রানা বলল, 'ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয়, আমরা সন্ধের পর এখান থেকে বেরুব। আপনি পথ চিনে ফিরতে পারবেন তো?'

'অবশ্যই।'

ধীরে ধীরে কমে গেল উত্তেজনা, দু'জনেই চুপচাপ থাকল কিছুক্ষণ। সন্দেহ নেই, নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে ওরা। ক্যানভাসে মোড়া হাফ গ্যালনের একটা ক্যানটিন বের করল তানাবু ওয়েটজেট থেকে। 'আপনার কি চলবে? আমাদের গ্রামে তৈরি মদ।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

'দ্বীপে যা পেতে চেয়েছিলেন তা কি পেয়েছেন?' খানিক পর জানতে চাইল তানাবু।

'পেয়েছি, এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক গোটা বাপার ব্যাখ্যা করেছেন আমাকে।'

'তাহলে ঝুঁকিটা নিয়ে আমরা ভুল করিনি।'

'তবে আপনাকে খুব চড়া মূল্য দিতে হলো,' বলল রানা। 'রডনির মাইনিং কোম্পানীতে আপনারা আর মাছ বেচতে পারবেন না।'

'তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কুক বলছিল, আর এক মাস পর খনি নাকি বন্ধ করে দেয়া হবে।'

'তবু আপনি সাহায্য করায় আমি কৃতজ্ঞ,' আন্তরিক সুরে বলল রানা।

'ভাল কাজে সব সময় পাবেন আমাকে,' বলল তানাবু। 'আপনি এখন কি করবেন?'

'ওয়াশিংটন গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে।' হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা, মলি বুমারের মলিন চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বেচারার দুই যমজ বাচ্চাকে জিম্মি করা হয়েছে, স্পাই হিসেবে কাজ করার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে নুমায় ঢুকতে। রডনি বুমার দেখা যাচ্ছে মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শয়তান। হৃদয়হীন পাষণ্ড না হলে নিজের মেয়ের সঙ্গে এই আচরণ কেউ করতে পারে!

***

হীরক সম্রাট-২
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

বহু বছর পর নুমা হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে অফিস করছে রানা। অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে সুসজ্জিত একটা কামরা দেয়া হয়েছে ওকে, বেশিরভাগ সময় তালা দেয়া থাকে সেটায়। আজ বিকেলে বিল্ডিঙে ঢুকেই নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করেছে ও, রিপোর্ট করার পর দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে। সাউন্ড ওয়েভ সম্পর্কে রানার ব্যাখ্যা শুনে ঘাবড়ে গেছেন অ্যাডমিরাল। রানা তাঁকে আরও জানিয়েছে যে রডনি বুমার এখন জানে যে তাঁর প্রতিপক্ষ শুধু রানা এজেন্সি নয়, নুমাও।

আর অ্যাডমিরাল রানাকে জানিয়েছেন, প্রশান্ত মহাসাগরে আবার ছোবল মেরেছে রডনির সাউন্ড ওয়েভ। এবার তাঁর শিকারে পরিণত হয়েছে একটা রাশিয়ান জাহাজ, নাবিক আর প্যাসেঞ্জার মিলিয়ে মারা গেছে দেড়শোর মত মানুষ।

উদ্বেগজনক আরও একটা খবর হলো, রডনির কোন দ্বীপেই সংশ্লিষ্ট দেশের পুলিসকে তদন্তের জন্যে পাঠানো যাচ্ছে না। নিমবাস, গুডউইল আর রেড স্যান্ড রডনির ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই তিনটে দ্বীপে কারও প্রবেশাধিকার নেই। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে আলাপ করেছেন হ্যামিলটন, অনুরোধ করেছেন জাতিসংঘের পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটির একটা টীমকে যেন পাঠানো হয় নিমবাসে, তারা তদন্ত করে দেখে আসুক সাউন্ড ওয়েভ তৈরি করার জন্যে কি ধরনের মেশিনারি ব্যবহার করছেন রডনি। পদক্ষেপ নিতে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছেন মহাসচিব, কিন্তু টীম পাঠানোর আগে মড়কের জন্যে রডনি বুমারের খনন পদ্ধতিই দায়ী কিনা তা স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নিরেট প্রমাণ চান তিনি। অথচ নুমার হাতে সেরকম কিছু নেই।

রডনির বাকি তিনটে দ্বীপ বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে লীজ নেয়া। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন লাভ হয়নি। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পার্লামেন্ট সদস্য থেকে শুরু করে মন্ত্রীসভার সদস্য, সবাই রডনির দয়া-দাক্ষিণ্য পেতে অভ্যস্ত, কেউ তাঁরা নুমাকে সাহায্য করতে রাজি নয়। আর রডনি খ্যাতিসম্পন্ন আইন ব্যবসায়ীদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন, দ্বীপগুলোয় তদন্ত টীম পাঠানোর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট থেকে আগাম নিষেধাজ্ঞা আদায় করে নিয়েছেন তাঁরা।

বাকি আছে শুধু মার্কিন সরকারের হস্তক্ষেপ। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলে সমস্ত আইনগত বাধা অগ্রাহ্য করে রডনির দ্বীপগুলোয় ফোর্স পাঠাবার নির্দেশ দিতে পারেন। সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো অভিযোগ করবে তাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। পরে যদি দেখা যায় যে তদন্ত করে কিছুই পাওয়া যায়নি, পরবর্তী নির্বাচনে পদপ্রার্থী হলে প্রেসিডেন্ট হেরে ভূত হয়ে যাবেন। সেজন্যেই ফোর্স পাঠাবার অনুরোধ করতে ইতস্তত করছেন অ্যাডমিরাল, শুধু ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্টের কাছে। উনি দেখতে চান

প্রেসিডেন্ট নিজে থেকে কিছু করেন কিনা।

নুমায় মলির কাজ করা নিয়েও রানার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। মেয়েটার প্রতি যতই সহানুভূতি থাকুক, সে যে সুযোগ পেলে নুমার গোপন তথ্য বাপের কাছে পাচার করবে, কথাটা অ্যাডমিরালকে জানিয়ে দিয়েছে রানা। 'এ ব্যাপারে যা করার তুমিই করো,' বলে রানার ওপর দায়িত্ব চাপিয়েছেন অ্যাডমিরাল। সাবধানের মার নেই ভেবে রানা এজেন্সির সিডনি শাখাকে জরুরী একটা মেসেজ পাঠিয়েছে রানা। তিনটে জাহাজ চার্টার করার নির্দেশ দিয়েছে, ওগুলোকে নিমবাস, রেড স্যান্ড আর গুডউইলের কাছাকাছি টহল দিতে হবে।

বায়োলজিস্ট থমাস কীলের সুপারিশে নুমায় যোগ দিয়েছে মলি, অবৈতনিক রিসার্চার হিসেবে। রানা প্রশ্ন করে জেনে নিল হেড অফিসের কোন সেকশনে কাজ করছে সে।

লোকজনের সামনে চেহারাটা হাসিখুশি রাখতে পারলেও, একা হলেই কান্না পাচ্ছে মলির। সন্ধের পর ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে নিজের অফিস কামরায় আসছে সে, হাতব্যাগটা নিয়ে জর্জটাউনের ফ্ল্যাটে ফিরবে। বাবার একজন ম্যানেজার ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দিয়েছে তাকে, জানালার ধারে একা বসে কাঁদার জন্যে আদর্শ জায়গা। ওয়াশিংটনে তার কোন বন্ধু নেই। থমাস কীল নানাভাবে সাহায্য করছে বটে, কিন্তু তারও তো স্ত্রী-পুত্র আছে, নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে তাকে বিড়ম্বিত করার কোন মানে হয় না। একজনকে হয়তো বলা যেত, তিনি হয়তো সাহায্যও করতে পারতেন, কিন্তু তাঁকে মলি পাবে কোথায়! নিমবাস দ্বীপে তার বাচ্চা দুটো কেমন আছে ভাবলেই আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে ডানায় ভর করে উড়ে যায়, ছোঁ দিয়ে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে আনে তাদেরকে। কিন্তু সে অসহায়। ওয়াশিংটন ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই তার। চোখে ধরা না পড়লেও জানে যে বাবার স্পাইরা সারাক্ষণ তার প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

কেন কে জানে, কান্না পায় আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাসুদ রানার চেহারাটা। ভাবতে ইচ্ছে করে, এই একজন মানুষই তাকে সাহায্য করতে পারত। মাত্র অল্প ক'টা দিন ওকে দেখেছে সে, তাতেই যেন চরিত্রটি ছবির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। এমন দৃঢ়চেতা সাহসী পুরুষ আর বোধহয় দেখেনি সে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা একটা নির্লিপ্ততাও লক্ষ করার মত, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আগ্রহী হয়ে ওঠার প্রবণতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভদ্রলোককে ভাল লেগে যাবার এটাও একটা কারণ। ভাল লেগে গেছে বলাটা কি ঠিক? নিজেকে প্রশ্ন করল মলি। বলা উচিত তার মনে কৌতূহল আর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে।

অফিসে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল মলি। 'আপনি?' ফিসফিস করল সে, নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কখন? কোত্থেকে? ওহ্ গড, আমি ভাবতেই পারিনি...'

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল রানা। 'অস্থির হবেন না, শান্ত হয়ে বসুন।' মলির একটা হাত ধরে টেনে আনল, বসিয়ে দিল ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায়, তারপর নিজে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল। 'আপনাকে খুব বিধ্বস্ত লাগছে।

কেন বলুন তো?'

'আপনাকে আমার কি যে দরকার বলে বোঝাতে পারব না।'

'বলতে হবে না, আমি জানি। আজ এখানে আমার আসার পিছনে সেটাও একটা কারণ। আরেকটা কারণ, ক্ষমা চাওয়া–সেদিন সী লায়ন থেকে চলে আসার সময় আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়া হয়নি।'

'আপনি জানেন? নাহ্, তা কি করে হয়!'

'পাউলার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, মলি। সে আমাকে সব বলেছে।'

'পাউলার সঙ্গে কথা হয়েছে? তা কিভাবে সম্ভব! সে তো ক্যান্ডিতে...'

মলিকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এ-সব বিষয়ে পরে কথা বলব আমরা, অন্য কোথাও–আপনিই বলুন, আমার ডেরায়, নাকি আপনার আস্তানায়?'

'আগে বলুন, আপনি আমার ছেলেদের কথাও জানেন?'

'কি যেন নাম ওদের?'

'মিরেজ আর ইকো।'

'আপনার বাবা ওদেরকে নিমবাস দ্বীপে জিম্মি করে রেখেছেন, আপনি যাতে নুমার গোপন তথ্য পাচার করতে বাধ্য হন।'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মলি।

'এই, না!' কোমল শব্দে হেসে উঠল রানা। 'আপনি কাঁদছেন জানতে পারলে ছেলেরা অভিমান করবে। ছেলেদের বিপদে মাকে শক্ত হতে হয়। আর তাছাড়া, আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না? বলুন তো আমি কে?'

কান্না ভুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মলি। 'কে আপনি?'

'আমি আপনার বন্ধু, আবার কে।' হাসছে রানা। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'চোখ মুছুন, তারপর ব্যাগটা হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন। অকৃত্রিম বন্ধুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি জানেন তো? বিপদ দেখলে সাহায্যের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বোকা বলুন আর যা-ই বলুন, আমি আপনার সেই জাতের বন্ধু। লেট'স গো।'

নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে একটা মার্সিডিজ সিক্স হানড্রেডে চড়ে বেরিয়ে এল ওরা। ওয়াশিংটনের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপার্টের কাছেই, মেঠো রাস্তার পাশে নিজস্ব ডেরায় পুরানো ও নতুন প্রাইভেট কার-এর একটা কালেকশন আছে রানার, রাজধানীতে এলে পছন্দমত একটা গাড়ি নিয়ে ব্যবহার করে।

'নুমার তথ্য কিভাবে পাচার করছেন আপনি?' একটু পরই জানতে চাইল রানা।

কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না মলি, রানার দিকে তাকাতেও পারল না। তারপর বলল, 'ড্যাডির এক লোক ফ্ল্যাটে দেখা করে আমার সঙ্গে, দেখে মনে হবে পিৎসা ডেলিভারি দিতে এসেছে।'

ভিউ মিররে চোখ পড়তে সাদা একটা ক্যাডিলাক দেখতে পেল রানা, সামনের সীটে একজন বসেছে, পিছনের সীটে দু'জন। কোন কারণ নেই, তবু রানার সন্দেহ হলো। 'আপনার ওপর কি নজর রাখা হচ্ছে?'

'বলা হয়েছে রাখা হবে। তবে আমি কাউকে দেখিনি।'

'আপনার দৃষ্টি তেমন তীক্ষ্ণ নয়। সাদা একটা ক্যাডিলাক পিছু নিয়েছে।'

খপ করে রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল মলি। 'আমার ভয় করছে। ওরা না আপনার কোন ক্ষতি করে।'

'শান্ত হোন,' বলল রানা। 'আমাকে ওরা চেনে না।'

'স্পীড বাড়িয়ে দিন, প্লীজ। যেভাবে পারেন ফেউ খসান।'

'স্পীড বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না,' বলল রানা। 'ওটা ক্যাডিলাক এসটিএস–থ্রী-হানড্রেড-প্লাস-হর্সপাওয়ার এঞ্জিন, ঘণ্টায় দুশো ষাট কিলোমিটার ছুটতে পারে।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় আছে, তবে আপনার পছন্দ হবে কিনা জানি না।'

ক্যাডিলাক একশো মিটার পিছনে রয়েছে। ঢাল বেয়ে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে রাস্তাটা। দুটো গাড়িই ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার স্পীডে ছুটছে। পাহাড়ের চূড়ায়, সমতল রাস্তায় পৌঁছেই, স্পীড হঠাৎ বাড়িয়ে দিল রানা। ঢাল বেয়ে নামার সময় দু'পাশের গাছগুলোকে হেডলাইটের আলোয় ঝাপসা প্রলেপের মত লাগছে, মনে হলো ওরা যেন একটা কুয়ার ভেতর খসে পড়ছে।

চূড়ায় উঠে এল ক্যাডিলাক, ইতিমধ্যে মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়ে আধ কিলোমিটার এগিয়ে এসেছে মার্সিডিজ। তা এলেও, আবার কাছে চলে আসতে ক্যাডিলাক চার মিনিটের বেশি সময় নেবে না।

এদিকের রাস্তা সরলরেখার মত। এলাকাটা ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটনের ঠিক বাইরে, দখল করে রেখেছে বড় বড় হর্স ফার্ম। সন্ধের পর এদিকে ট্রাফিক প্রায় থাকেই না। মন্থরগতি একজোড়া ভ্যানকে পাশ কাটাতে রানার কোন সমস্যা হলো না। স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনছে ক্যাডিলাক। স্টিয়ারিঙে রানার হাত আলগা ও শিথিল হয়ে আছে। ওর মনে কোন ভয় নেই। পিছু নেয়া গাড়ির আরোহীরা ওর বা মলির কোন ক্ষতি করতে চাইছে না। তবু গাড়ির গতি তুঙ্গে তুলে ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাবার মধ্যে রোমাঞ্চের উপাদান আছে। স্পীডোমিটারের দিকে তাকাল না। ঘণ্টায় একশো নব্বুই কিলোমিটার গতিতে ছুটছে মার্সিডিজ। এক পলকের জন্যে মলির দিকে তাকাল ও।

সীটে সেঁটে আছে মলি, যেন তীব্র বাতাস ওকে গেঁথে রেখেছে ওখানে। চোখ দুটো আধ বোজা, ঠোঁট জোড়া সামান্য খোলা। দেখে মনে হচ্ছে ভাবাবেগে কাতর এক নারী। এঞ্জিন আর বাতাসের আওয়াজ, গাড়ির গতি, অ্যাক্সিডেন্টের ভয়, থ্রিল–সব মিলিয়ে অবশ করে তুলেছে তাকে। এই অ্যাডভেঞ্চার আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে পাশে রানা থাকায়।

সেফটি বেল্টের ভেতর শরীর মোচড়াল মলি, পিছনে তাকিয়ে চিৎকার করল, 'ওরা কাছে চলে আসছে।'

রিয়ারভিউ মিররে আরেকবার তাকাল রানা। দুটো গাড়ির দূরত্ব এখন আবার একশো মিটারের মত।

ওরা এখন আবাসিক এলাকায় ঢুকছে। রাস্তার দু'পাশে বাড়ি-ঘর, দু'এক মিনিটের মধ্যে স্পীড কমাতে হবে। তবে এই মুহূর্তে রাস্তা খালি দেখে স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল রানা। একটা ওয়ার্নিং সাইন স্যাঁৎ করে পিছিয়ে পড়ল–সামনে কোথাও রাস্তা মেরামত

হচ্ছে। এদিকের এই রাস্তা সম্পর্কে ধারণা আছে রানার, একের পর এক অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে এগিয়েছে। এঁকেবেঁকে পাঁচ কিলোমিটার যাবার পর হাইওয়েতে পড়বে ওরা। ওই হাইওয়ের পাশে সিআইএ-র হেডকোয়ার্টার।

একের পর এক ছুটে আসছে বাঁকগুলো। ঘোরার সময় রানা ব্রেক করছে না, বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে রাস্তার মাঝখানে হড়কে যেতে দিচ্ছে চাকাগুলোকে, তারপর সরলরেখা তৈরি করে ছুটছে পরবর্তী বাঁকের দিকে। মার্সিডিজ যেন এক উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে। রানার ঠোঁটে টান-টান হাসি। ধাওয়া করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ক্যাডিলাকের ড্রাইভার, প্রতিটি বাঁকে পিছিয়ে পড়ছে সে।

হলুদ আলো মিটমিট করে জানিয়ে দিল সামনে ব্যারিকেড। রাস্তার পাশে একটা গভীর গর্ত দেখা যাচ্ছে, ভেতরে পাইপ বসানো হচ্ছে। স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করল রানা, রাস্তাটা পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি। সামনের একশো মিটার পাকা নয়, মেঠো পথে কাঁকর ছড়ানো হয়েছে। তবু স্পীড এতটুকু কমল না, পিছনে ধুলোর মেঘ তুলে ছুটে চলল মার্সিডিজ।

আরও দু'মিনিট পর সামনের দিকে আঙুল তাক করল মলি। এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা। 'ওদিকটায় আমি হেডলাইট দেখতে পাচ্ছি।'

'হাইওয়ে,' বলল রানা। 'এবার ওদেরকে খসাতে হয়।'

ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক নেই, দু'দিকেই আধ কিলোমিটার পর্যন্ত খালি। বাম দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক ঘোরার সময় রাবার পোড়াল রানা, শহরের উল্টোদিকে যাচ্ছে।

'ওদিকে কেন?' টায়ারের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল মলির গলা।

'দেখে শিখুন,' হুইল সিধে করে নিয়ে বলল রানা, হালকা ব্রেক কষে একটা ইউ টার্ন নিল, বিপরীত দিকে যাচ্ছে। জাংশনটা পেরুল ক্যাডিলাকের আলো দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসার আগেই। সামনে শহরের আলোকমালা, স্পীড আবার বাড়াচ্ছে রানা।

'আসলে কি ঘটল?' জানতে চাইল মলি।

'ওরা আমাদের টায়ার মার্ক অনুসরণ করে উল্টোদিকে ছুটবে।'

রানার বাহুতে মৃদু চাপ দিল মলি, আরেকটু গা ঘেঁষে বসল। 'আমরা কি আপনার ডেরায় যাচ্ছি?'

'কথা বলার জন্যে সেটাই তো নিরাপদ।'

'আমরা কি শুধু কথাই বলব?'

হেসে উঠল রানা। 'কি জানি।'

ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের পাশ ঘেঁষে মেঠো পথটা এঁকেবেঁকে একটা বিশাল কাঠামোর দিকে এগিয়েছে, দেখে মনে হলো প্রাচীন ও পরিত্যক্ত একটা হ্যাঙ্গার। কাছাকাছি অন্য কোন বাড়ি বা বিল্ডিং নেই। সামান্য হলেও অস্বস্তি বোধ করছে মলি। 'এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এলেন?' মার্সিডিজ থামার পর জিজ্ঞেস করল সে।

রানা এমনভাবে তাকাল যেন খুব মজা পাচ্ছে। 'কেন, আমার ডেরায়!'

নারীসুলভ অতুচ্ছিল্যের ভাব ফুটল মলির চেহারায়। 'এই পুরানো শেডে বাস করেন আপনি?'

'এটা একটা ঐতিহাসিক বিল্ডিং,' বলল রানা। 'উনিশশো ছত্রিশ সালে মেইনটেন্যান্স হ্যাঙ্গার হিসেবে তৈরি করা হয়।' কোটের পকেট থেকে রিমোট ট্র্যান্সমিটার বের করে চাপ দিল বোতামে। দরজা খুলে যাবার পর মলির মনে হলো বিশাল এক গুহা মুখ ব্যাদান করে আছে। ভেতরটা মিশমিশে কালো, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বোধহয় তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্যেই হেডলাইট অফ করে দিয়েছে রানা, অন্ধকারেই গাড়ি চালাচ্ছে। ভেতরে ঢোকার পর আবার চাপ দিল রিমোটে, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। গাড়িও থেমে আছে। সীটে বসে আছে রানা, নড়ছে না। 'কি মনে হচ্ছে বলুন।'

'বাঁচাও! বাঁচাও! চিৎকার করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি।' অস্বস্তিবোধ আরও বেড়েছে মলির।

'সরি।' আরেকটা বোতামে চাপ দিল রানা। সারি সারি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প জ্বলে উঠল, হ্যাঙ্গারের গম্বুজ আকৃতির সিলিঙে সাজানো।

ক্লাসিক অটোমোবাইলের অমূল্য সংগ্রহ দেখে ঝুলে পড়ল মলির চোয়াল। একজোড়া রোলস-রয়েস আর একটা প্রকাণ্ড ডিমলার চিনতে পারল সে। আমেরিকান কারগুলোর নাম তার জানা নেই। শুধু প্রাইভেট কার নয়, পুরানো হেলিকপ্টার আর অ্যান্টিক প্লেনও রয়েছে রানার সংগ্রহে। 'এ-সব আপনার?'

'শখের পিছনে টাকা ওড়াই, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না। এগুলোই আমার সঞ্চয়, যে দামে কিনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি দামে বেচতে পারব যখন খুশি।'

'শুনেছি বিয়ে করেননি,' বলল মলি। 'এই শখ কি তারই প্রতিক্রিয়া? ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে গেলে ক্ষমা করবেন–আমি জানতে চাইছি, আপনি কি প্রেমে ব্যর্থ?'

'হ্যাঁ, ব্যর্থ বৈকি,' দীর্ঘশ্বাস চেপে স্বীকার করল রানা। 'আমার পেশার ওপরই একটা অভিশাপ আছে–প্রেম সাধারণত পরিণয় পর্যন্ত গড়ায় না। যদি গড়ায়ও, পরিণতি শুভ হয় না।'

'ধ্যেত, কুসংস্কার!' নীল রঙের একটা ট্রেলার দেখাল মলি। 'ওটার ভেতর বাস করেন?'

হেসে উঠে প্যাঁচানো একটা লোহার সিঁড়ি দেখাল রানা। 'ওটার মাথায় আমার অ্যাপার্টমেন্ট। আপনি অলস হলে এলিভেটরে চড়তে পারেন।'

'না, একটু ব্যায়াম হয়ে যাক।'

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। প্রথম দরজা দিয়ে লিভিং রূমে ঢোকা যায়। দু'দিকের দেয়ালে বই ঠাসা শেলফ, আরেক দিকে ছোট বড় নানা আকৃতির শো-কেস, ভেতরে নুমার উদ্ধার করা প্রাচীন জাহাজের মডেল। ডান পাশের দরজা দিয়ে বেডরূমে ঢোকা যায়, এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে দেখে মনে হয় কোন ক্যাপটেনের কেবিন। লিভিং রূমের বাম দরজা দিয়ে কিচেন আর ডাইনিং এরিয়ায় ঢুকতে হয়।

জুতো খুলে লেদার কাউচে পা তুলে বসল মলি। 'অ্যাডভেঞ্চারার ভদ্রলোক তাহলে সাগর থেকে ফিরে এখানেই আত্মগোপন করেন?'

'নুমায় আমি যা-ই করি, সেটা আমার আসল পেশা নয়,' কোট আর টাই খুলতে খুলতে বলল রানা। 'আমি আসলে একজন সরকারী ইনভেস্টিগেটর।

আগেই জেনেছেন, আমি একজন বাংলাদেশী। কি নেবেন বলুন। সব আমি ছুঁই না, তবে রাখি।'

'ব্র্যান্ডি হলে মন্দ হত না,' বলল মলি, ঠোঁটে আড়ষ্ট হাসি, রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। 'আমার হাতে গ্লাস থাকলে পাশে বসতে আপত্তি করবেন?'

'কেন, না!' খুদে বার-এর দিকে এগোল রানা, একটা গ্লাসে খানিকটা রেমি মারটিন ঢালল, ফিরে এসে মলির হাতে ধরিয়ে দিল সেটা, তারপর তার পাশেই বসে পড়ল।

ব্যাকুল হয়ে রানাকে চাইছে মলি, ইচ্ছে হচ্ছে ওর আলিঙ্গনের ভেতর নিজেকে শিথিল করে দেয়। কোমল মনের অধিকারী, সাহসী ও দৃঢ়চেতা একজন পুরুষের স্পর্শ তার এখন বড় প্রয়োজন। তবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভ্রম বোধ। অকস্মাৎ প্রবল একটা অপরাধবোধ গ্রাস করল তাকে, কল্পনার চোখে দেখতে পেল যমজ দুই বাচ্চা নিষ্ঠুর জ্যাক টেসটারের হাতে নিপীড়িত হচ্ছে। শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছে। হাতের গ্লাস কফি টেবিলে নামিয়ে রেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল মলি। কাঁদছে সে।

'বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে গেছে?' তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

ফোঁপাচ্ছে মলি। 'সত্যি আমি দুঃখিত।'

'মাতৃস্নেহের বিজয় দেখে আমি বরং খুশি,' বলল রানা।

'রানা, নিজেকে আমি স্থির রাখতে পারছি না। যেভাবেই হোক আমি জেনেছি যে নিমবাস, রেড স্যান্ড আর গুডউইলে ইরাপ্‌শন্ হবে। শুধু আমার ছেলেরা নয়, মাইনাররাও কেউ বাঁচবে না...'

মলির মুখে হাতচাপা দিল রানা। 'মলি, এখানে আপনাকে নিয়ে আসার পিছনে বিছানা শেয়ার করার কোন মতলব আমার ছিল না। কিভাবে জানলেন, দ্বীপগুলোর আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হবে?'

'ড্যাডির একজন কর্মচারী সব আমাকে বলে দিয়েছে। তার নামটা আমি বলতে চাই না।'

'আমি একটা প্ল্যান করেছি। আপনার সাহায্য দরকার।'

'কি প্ল্যান?'

ভাব দেখে মনে হলো মলির প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে রানা। 'কি প্ল্যান মানে? চুপিচুপি নিমবাস দ্বীপে যাব আমরা। ছেলে দুটোকে ছিনিয়ে আনব। উদ্ধার করব পেভ লেবার চীনা আর বাংলাদেশীদের।'

'নিজের প্রাণের ওপর এত বড় ঝুঁকি নেবেন আপনি? কেন?'

'কেন আবার, আমি ছুটিতে আছি, তাই।' হাসছে রানা। 'একটা কিছু করা হবে।'

'আপনি তো দেখছি অদ্ভুত...,' ঝুঁকে রানার ঠোঁটে চুমো খেলো মলি। 'ধরা পড়ে যাবেন জানেন, তারপরও মিথ্যে কথা বলেন কেন?'

অসহায় দেখাল রানাকে। 'আল্লাই জানে মেয়েরা কিভাবে যেন আমার ভেতরটা দেখতে পায়।'

রডনি বুমারের বিশাল অট্টালিকা দুই আগ্নেয়গিরির ঠিক মাঝখানে। বাড়ির সামনে

থেকে লেগুনটা পরিষ্কার দেখা যায়। মাইনিং অপারেশনের কারণে ব্যস্ত পোর্টে পরিণত হয়েছে ওটা। বড় একটা এলাকা জুড়ে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সামনে খোলা উঠন, তারপর রেলিং ঘেরা উঁচু বারান্দা. বারান্দা থেকে ত্রিশটা ঘরে ঢোকার ত্রিশটা দরজা। বহুকাল আগে তৈরি বাড়িটা দুর্গের মত দেখতে হলেও, মাথার ওপর স্যাটেলাইট ডিশ থাকায় আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। বিশাল উঠানের মাঝখানেই বাগান আর সুইমিং পুল।

ফোন রেখে দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন রডনি বুমার, বারান্দা হয়ে বাগানে ঢুকলেন, বসলেন সুইমিং পুলের কিনারায় ফেলা একটা বেতের চেয়ারে। দু'জন চীনা কিশোরী হাসাহাসি করছিল, মনিবকে দেখেই জড়সড় হয়ে গেল। রডনি বুমারের দশ হাত পিছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে মাইকেল শেলফিন। 'এদিকে এসো,' ভারী গলায় বললেন বুমার।

পা বাড়াবার আগে চোখ বুলিয়ে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল শেলফিন।

'এইমাত্র ওয়াশিংটন থেকে ফোন পেলাম,' বুমার বললেন। 'মলি পালিয়েছে।'

হতচকিত দেখাল শেলফিনকে। 'আপনার সোর্স বিশ্বাসযোগ্য তো, স্যার? আমি সেরা ইনভেস্টিগেটরদের ভাড়া করেছি, তিনজনই সাবেক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে...'

'তথ্যে কোন ভুল নেই। মলি পালিয়েছে। তার সঙ্গে কেউ একজন ছিল।'

চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল শেলফিনের। 'কেউ মানে নিশ্চয়ই মাসুদ রানা।'

ঘাসে বুট ঘষছেন বুমার। 'লোকটা বড় বেশি তৎপর। কোথায় না তাকে দেখা যাচ্ছে। ক্যান্ডিতে পাউলা তাকে মুঠোয় ভরে ফেলেছিল, কিন্তু আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে।'

চীনা কিশোরীদের একজনকে ডেকে হুইস্কি দিতে বললেন বুমার।

'এই মাসুদ রানার একটা ব্যবস্থা না করলেই নয় আর,' বলল শেলফিন। 'কোন সন্দেহ নেই, মিস মলি অনুরোধ করেছেন রানা যেন তাঁর ছেলে দুটোকে উদ্ধার করে।'

'মাসুদ রানা উপদ্রব বটে, কিন্তু নিমবাসে সে ঢুকবে কিভাবে?'

'সঙ্গে মিস মলি থাকলে পথ চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়,' বলল শেলফিন।

'তীরে যদি নামতেও পারে,' উঠানের তোরণ আকৃতির প্রবেশ পথের দিকে আঙুল তুলে মাইন এলাকাটা দেখালেন বুমার, 'বাড়ির দুশো মিটারের মধ্যে কেউই আসতে পারবে না।'

'তাহলে একটা অভ্যর্থনা কমিটি তৈরি রাখি।'

'উঁহুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন বুমার। 'এখানে নয়। আমি জানি ওদেরকে কোথায় বাধা দিতে হবে।'

'টাইমটেবিল?'

'মলি ওয়াশিংটনের ফ্ল্যাটে ফেরেনি, রানাও দু'দিন ধরে নুমার অফিসে যাচ্ছে না, কাজেই ধরে নেয়া চলে ওরা একসঙ্গেই আছে, মিরেজ আর ইকোকে উদ্ধার করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে। আমাদের হাতে খুব বেশি হলে সময় আছে চব্বিশ

ঘণ্টা। নিউজিল্যান্ডের পশ্চিমে নুমার রিসার্চ শিপ বিগ ডলি থাকায় ভাবছি নিশ্চয়ই ওটায় চড়বে রানা, তারপর একটা হেলিকপ্টার নিয়ে এদিকে রওনা হবে।'

'এত খবর আপনি জানলেন কিভাবে, স্যার?'

'নুমায় আমার লোক আছে, সাগরের তলায় দামী পাথর পাওয়া গেলে আমাকে খবর দেয়।'

'আমরা তাহলে রানাকে সহ নুমার বিগ ডলিকে ডুবিয়ে দিই?'

'বোকার মত কথা বলছ। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, এই এলাকায় বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় ঘটলেই আমাদেরকে দায়ী করা হবে। কাজটা আমাদেরকে আরও সূক্ষ্মভাবে সারতে হবে।'

'চব্বিশ ঘণ্টা খুব বেশি সময় নয়।'

'কিভাবে কি করতে হবে সব আমি বলে দেব,' হাসলেন বুমার।

নুমার গালফস্ট্রীম জেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে ল্যান্ড করল ওরা। প্লেনটা চালিয়ে আনল ববি মুরল্যান্ড, কো-পাইলট হিসেবে ছিল রানা, একমাত্র প্যাসেঞ্জার মলি বুমার। লিখিত অনুমোদন দিয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, রেসকিউ অপারেশন নুমার রিসার্চ শিপটাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে রানা। তবে সেই সঙ্গে শর্তও জুড়ে দিয়েছেন, নুমার কোন লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে, এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

রানওয়ে থেকে বেরিয়ে এসে পার্কিং এলাকায় প্লেন থামাল মুরল্যান্ড, এখানে শুধু ব্যক্তিমালিকাধীন এয়ারক্রাফট পার্ক করতে পারে। 'নুমার কোন ভেহিকেল দেখতে পাচ্ছ?' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। ওদিকে মলির সঙ্গে কথা বলছে রানা।

'কই, না। আমরা বোধহয় আগেভাগে পৌঁছে গেছি।'

'হ্যাঁ, পনেরো মিনিট আগে।'

প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল রানা। ওর পিছু নিয়ে মলিও নামল। আড়মোড়া ভাঙছে সে, দীর্ঘ যাত্রায় খিল ধরে গেছে হাত-পায়ে। 'আমি ভেবেছিলাম জাহাজ থেকে কেউ নিতে আসবে আমাদের,' হাই তুলতে তুলতে বলল।

'নিশ্চয়ই পথে রয়েছে।'

ওদের হাতে যার যার ট্রাভেলিং ব্যাগ ধরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। একটু পরই ছোট একটা টয়োটা বাসকে ছুটে আসতে দেখা গেল, গায়ে লেখা 'হারবার শাটল'। ওদের পাশেই থামল, দরজা খুলে নিচে নামল হাসিখুশি এক লোক, বয়েস হবে ছাব্বিশ কি সাতাশ। 'আপনাদের মধ্যে মাসুদ রানা কে?'

'আমি।'

'কাটহিল, জেমস কাটহিল। দেরি হওয়ায় দুঃখিত। বিগ ডলির ভ্যান নষ্ট, হারবার মাস্টারের কাছ থেকে এটা ধার করে আনতে হলো।' বলতে হলো না, কাটহিল নিজেই ওদের ব্যাগগুলো বাসে তুলল। 'এয়ারপোর্ট থেকে ডক কাছেই, জার্নিটা আপনারা উপভোগ করুন।'

রানা আর মলি পাশাপাশি বসল, পরস্পরের হাত ধরে টিন এজারদের মত ফিসফিস করছে। ওদের সামনে, ড্রাইভারের সরাসরি পিছনের সীটে বসেছে মুরল্যান্ড। তার হাতে নিমবাস দ্বীপের এরিয়াল ফটোগ্রাফ, পেন্টাগন থেকে চেয়ে এনে ওদেরকে দিয়েছেন জর্জ হ্যামিলটন।

পাঁচ-সাত মিনিট পরই মেইন রোড থেকে বাঁক ঘুরে ডক এরিয়ায় ঢুকে পড়ল বাস। বিশাল সব স্টোরেজ বিল্ডিঙের ফাঁকে ফাঁকে একটা করে জেটি, প্রতিটি জেটির শেষ মাথায় একটা করে কার্গো ভেসেল নোঙর করা–বেশিরভাগই এশিয়ান শিপিং লাইন্স-এর। বিল্ডিং আর কার্গো ক্রেনগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিচ্ছে বাসের ড্রাইভার। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে আরোহীদের প্রতিটি নড়াচড়া খেয়াল করছে সে। 'আরেকটা ওয়্যারহাউস পার হলেই বিগ ডলিকে দেখতে পাব আমরা,' উইন্ডশীল্ডের দিকে হাত তুলে অস্পষ্ট কি যেন একটা দেখাল ওদেরকে।

'আমরা চড়লেই নোঙর তুলে রওনা হবে জাহাজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্রুরা আপনাদের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।'

ড্রাইভারের মাথার পিছনে তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ড, কপালে চিন্তার রেখা। 'জাহাজে আপনি কি ধরনের ডিউটি করেন?'

'আমি?' ঘাড় না ফিরিয়েই বলল কাটহিল। 'ফিল্ম ক্রুদের সঙ্গে আছি, ফটোগ্রাফার।'

'ক্যাপটেন জেমস হেনডারসনকে কেমন মনে হয়? ক্রুদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেমন?'

'পারফেক্ট ভদ্রলোক। সবার সঙ্গেই অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন।'

মুখ তুলল মুরল্যান্ড, দেখল রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে রয়েছে কাটহিল। হাসল মুরল্যান্ড, তবে কাটহিল ড্রাইভিঙে মন দিতে হাসিটা মুখ থেকে মুছে গেল। সীটের আড়ালে একটা কাগজে কিছু লিখল সে, কাগজটা গোল পাকাল, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল রানা। কাগজটায় মুরল্যান্ড লিখেছে, 'এই ব্যাটা ভুয়া।'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে ফিসফিস করল, 'কিভাবে বুঝছ?'

'ব্যাটা বিগ ডলি থেকে আসেনি,' নিচু গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'ওকে আমি কৌশলে বলিয়েছি যে বিগ ডলির ক্যাপটেন হেনডারসন। আসল বিগ ডলির ক্যাপটেন ফ্রান্সিস বেকন।'

'বিপদ।'

'তাছাড়া, বিগ ডলিতে শুধু সোনার টেকনিশিয়ান আর জিওফিজিসিস্টদের টীম আছে, কোন ফটোগ্রাফার নেই।'

'ড্রাইভার তাহলে আমাদেরকে সোজা নরকে নিয়ে যাচ্ছে,' ফিসফিস করল রানা।

আলোচনায় সময় নষ্ট করার ফল হাতে-নাতে পেল ওরা। একটা হাঁ করা দরজার ভেতর ঢুকে পড়ল বাস, দরজার দু'পাশে বুম'ব্ব মাইনিং কোম্পানীর ইউনিফর্ম পরা দু'জন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে। বাসটাকে অনুসরণ করল তারা, রিমোটের বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল দরজা।

'সব কি তাহলে ভেস্তে গেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এটা ঠাট্টা করার সময় না,' তিরস্কার করল মুরল্যান্ড, নিচু গলায় কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। 'অ্যাটাকের প্ল্যান দাও।'

বৈঠকে বসে প্ল্যান তৈরি করার সময় কোথায়। অন্ধকার ওয়্যারহাউসের আরও গভীরে ঢুকে পড়ছে বাস। 'বন্ধু কাটহিলকে ছাঁটাই করো, তারপর চলো বাস নিয়ে বেরিয়ে যাই।'

কাউন্টডাউনের অপেক্ষায় থাকল না, দু'পা এগিয়েই সীট থেকে ড্রাইভারকে শূন্যে তুলে ফেলল মুরল্যান্ড, একটা হাত দিয়ে এন্ট্রি ডোর খুলে বস্তার মত ছুঁড়ে দিল বাইরে। যেন আগেই রিহার্সেল দেয়া আছে, লাফ দিয়ে ড্রাইভারের সীটে বসে পড়েছে রানা, কার্পেট মোড়া ফ্লোরবোর্ডে চেপে ধরেছে অ্যাকসেলারেটার। সশস্ত্র একদল লোকের মাঝখান দিয়ে ছুটল বাস, ছিটকে সরে গেল তারা। সামনে জাপান থেকে আমদানি করা ইলেকট্রিক্যাল কিচেন সরঞ্জাম ভরা কার্ডবোর্ড বক্সের দুটো স্তূপ। আসন্ন সংঘর্ষ সম্পর্কে রানা যেন সচেতন নয়। বাক্স, টোস্টার, ব্লেন্ডার আর কফিমেকার, সব একযোগে বিস্ফোরিত হলো।

চওড়া একটা প্যাসেজে ঢুকে অকস্মাৎ ব্রেক কষে বাসের চাকাগুলোকে হড়কাবার সুযোগ দিল রানা, বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে; তারপরই একটা মেটাল ডোর লক্ষ করে ছুটল বাস, স্টিয়ারিঙ হুইলের নিচে মাথাটা নামিয়ে রেখেছে ও। কব্জা ভেঙে উড়ে গেল দরজার কবাট, ওয়্যারহাউস থেকে সগর্জনে লোডিং ডকে বেরিয়ে এল ওদের বাহন।

এদিকের ডকইয়ার্ড খালি। কিনারায় কোন জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। একদল শ্রমিক জেটি মেরামত করছিল, এক ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে এই মুহূর্তে, সামনেই ব্যারিকেড। হর্ন দিল রানা, শ্রমিকদের এড়াবার জন্যে আবার বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে। ব্যারিকেডের শেষ প্রান্ত ঘেঁষে ছুটল বাস, শুধু পিছনের বাম্পারে ব্যারিকেডের একটা অবলম্বন আঘাত করল।

কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে রানার কোন ধারণা নেই। রাস্তা পেলে হাইওয়েতে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তার আগে ডক এরিয়া থেকে বেরুতে তো হবে। হঠাৎ সামনে পড়ল লম্বা একটা ট্রাক, পিছনে ট্রেলার। এড়াবার চেষ্টা করল রানা, সফল হলো আংশিক। ট্রেলারের পিছনটা চুরমার করে দিল বাস।

'সামনে যা পড়বে তাই ভাঙতে হবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, রাগ চেপে রাখতে পারছে না। বাসের মেঝেতে বসে আছে সে, এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে মলিকে।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'কেউ আহত হয়েছে?'

'এত জায়গায় চামড়া ছড়ে গেছে, কেস করলে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আপনাকে,' বলল মলি, ভয়ে চেহারাটা নীল হয়ে গেলেও কৌতুক করতে পারায় নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল সে।

কপালে সদ্য তৈরি আলুটার দিকে মলির দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুরল্যান্ড। 'মানতেই হবে যে আপনার বাবার রসবোধ আছে। আমরা আসব জেনেই তাঁর এই সারপ্রাইজ দেয়ার চেষ্টা।'

'নুমায় নিশ্চয়ই কেউ তাঁর ঘুষ খায়,' চট করে একবার মলির দিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'নাকি আপনিই তাঁকে জানিয়েছেন?'

'আমি না,' জোর দিয়ে বলল মলি।

ঘাড় ফিরিয়ে বাসের পিছন দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'একজোড়া কালো ভ্যান, রানা। পিছু নিয়েছে।'

'পুলিস নয় তো?'

'না।'

একটা প্যাসেজ দেখে ভেতরে ঢুকল রানা। ঢোকার পর বুঝতে পারল ভুল হয়ে গেছে। প্যাসেজটার শেষ মাথায় পরিত্যক্ত একটা জেটি। 'আমরা ফাঁদে পড়েছি!'

'ওরাও জানে,' বলল মুরল্যান্ড। 'ভ্যান দুটো দাঁড়িয়ে পড়েছে প্যাসেজের মুখে। যে-কোন মুহূর্তে নিচে নেমে বিজয়ীরা উল্লাসে ফেটে পড়বে।'

'মলি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, বলুন।' বাসের সামনে চলে এল সে।

'আপনি দম আটকে কতক্ষণ থাকতে পারেন?'

'ঠিক জানি না, সম্ভবত এক মিনিট।'

'ববি, কি করছে ওরা?'

'হেঁটে এদিকে আসছে, হাতে হকিস্টিক।'

'ওরা আমাদেরকে জ্যান্ত ধরতে চায়,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, গ্যাং, শক্ত হয়ে বসে পড়ো সীটে।'

'কি করতে চান আপনি?' ব্যাকুলসুরে জানতে চাইল মলি।

'ববি,' বলল রানা, 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও। আমি চাই বাস যেন পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায়, একটা ইঁটের মত।' মলির দিকে তাকাল ও। 'আমরা ডুব সাঁতার দেব।'

'পানি কি গরম?' জিজ্ঞেস করল মলি। 'ঠাণ্ডা পানিকে আমি সাপের মত ভয় পাই।'

'বড় বড় শ্বাস টেনে ব্লাডস্ট্রীমে বেশি করে অক্সিজেন জমা করুন,' বলল রানা। 'ডাইভ দেয়ার সময় ফুসফুস ভরে নেবেন।'

'ডুব সাঁতারে আপনাকে আমি হারিয়ে দেব,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল মলি।

ওভারনাইট ব্যাগ খুলে একটা নাইলন প্যাকেট বের করল রানা, প্যান্টের পকেটে ঢোকাল।

'ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে,' শান্ত গলায় সতর্ক করল মুরল্যান্ড।

একটা লেদার কোট পরল রানা, গলা পর্যন্ত চেইন টেনে ঘুরল, দু'হাত শক্ত করে ধরল স্টিয়ারিং হুইল। 'তৈরি হও তোমরা।' জেটির ওপর দিয়ে এগোল বাস। শেষ মাথায় পৌঁছে নিখুঁত ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল।

একবার ভেসে উঠল টয়োটা, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার ডুবে গেল। ডকের কিনারায় ছুটে এসে বুমারের সিকিউরিটি গার্ডরা দেখল পানি থেকে বুদ্বুদ আর বাষ্প উঠছে, বাস বা আরোহীদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা, পানির ওপর যদি কিছু ভেসে ওঠে। ঘোলা পানি এক সময়

শান্ত হয়ে এল। জেটিতে না উঠে ডক থেকেই ফিরে গেল লোকগুলো।

রানার অনুমান, ডকে যখন বড় কার্গো শিপ ভেড়ে, পানির গভীরতা এখানে পনেরো মিটারের কম হবে না। হারবারের তলায় নরম কাদায় ডুবে গেল বাস, ঘন মেঘের মত চারদিক থেকে উথলে উঠল পলি। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে পিছু হটল রানা, ঘুরে বাসের পিছন দিকে চলে আসছে মলি আর মুরল্যান্ড জখম না হয়ে জানালা গলে বেরুতে পেরেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে। ওরা পালিয়েছে বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উঠল মন, একটা জানালা গলে ঘন কাদা ঘোলা পানিতে বেরিয়ে এল, পা ছুঁড়ছে অনবরত।

খানিকটা পরিষ্কার পানিতে এসে পাইলিং আর জেটি দেখতে পেল রানা, দৃষ্টিসীমা এখন প্রায় বিশ মিটার। চার মিটার সামনে এক জোড়া মূর্তি দেখা গেল, ঘোলা পানিতে দ্রুত সাঁতার কাটছে। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল রানা, মেঘ ঢাকা আকাশের আলো ভাঙাচোরা আর ঝাপসা লাগল চোখে। সাঁতরে পাইলিং আর জেটির ডগায় চলে আসতে পানি হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠল। গভীর ছায়ার ভেতর মূর্তি দুটোকে আপাতত হারিয়ে ফেলেছে। ফুসফুসে বাতাসের অভাব, ব্যথা করছে বুক। বাধ্য হয়েই সারফেসের দিকে উঠতে হচ্ছে ওকে। একটা হাত মাথার ওপর তুলে রেখেছে, ধারাল কিছু যাতে খুলিতে না লাগে। ভাসমান আবর্জনার মাঝখানে মাথা তুলল ও। ঘন ঘন শ্বাস নিল বার কয়েক, তারপর মলি আর মুরল্যান্ডের খোঁজে আধ পাক ঘুরল। ওর ঠিক পিছনে, খানিকটা দূরে, হাবুডুবু খাচ্ছে তারা।

কাছে চলে এল রানা, লক্ষ করল ওকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মলির চেহারা। 'বলিনি, ডুব সাঁতারে আপনাকে আমি হারিয়ে দেব?' ফিসফিস করল সে।

রানাও নিচু গলায় কথা বলছে, 'আমি দেরি করে স্টার্ট নিই।'

'মনে হয় না কেউ আমাদেরকে দেখেছে,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড। 'ঘোলা পানি থেকে বেরুবার আগেই আমি ডকের তলায় পৌঁছে যাই।'

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল মলি।

রানার দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'বলো।'

'ডুব সাঁতার দিয়ে এক জেটি থেকে আরেক জেটিতে যেতে হবে,' বলল রানা। 'যতক্ষণ না ওঠার জন্যে নিরাপদ কোন জায়গা পাই।'

'কাছাকাছি যদি কোন জাহাজ পাই, উঠতে অসুবিধে কি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

মলিকে সন্দিহান দেখাল। 'ড্যাডির গুণ্ডারা টের পেলে ক্রুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে আমাদের।'

'লোকাল অথরিটি আমাদেরকে সাহায্য করবে না?' মলির দিকে তাকাল মুরল্যান্ড।

মাথা নাড়ল রানা, চুলের ডগা থেকে এক পশলা বৃষ্টি হলো। 'একটা জাহাজের ক্যাপটেন বা ডক পুলিস কার কথা বিশ্বাস করবে–কাদামাখা তিনটে ইঁদুরের, নাকি যারা রডনি বুমারের প্রতিনিধিত্ব করছে?'

'আমাদেরকে পাত্তাই দেবে না,' স্বীকার করল মুরল্যান্ড।

'একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় বিগ ডলি।'

'কিন্তু,' মলি বলল, 'ওরা আশা করবে ওখানেই আমরা যাব।'

'বিগ-ডলি থেকে ওরা আমাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এত সহজ?'

'বাজে তর্ক,' বলল মুরল্যান্ড। 'বিগ ডলি কোথায় নোঙর ফেলেছে তাই তো আমরা জানি না।'

বন্ধুর দিকে তাকাল রানা, চোখে তিরস্কার। 'তুমি দেখছি মানুষকে শুধু হতাশ করতে জানো।'

'বিগ ডলির খোল কি আসমানী রঙের? সী লায়নের মত, কেবিনগুলো সাদা?' জানতে চাইল মলি।

'নুমার সব জাহাজের কালার স্কীম একই রকম,' জবাব দিল মুরল্যান্ড।

'তাহলে আমি ওটাকে দেখেছি। ষোলো নম্বর জেটিতে বাঁধা আছে।'

'হার মানলাম। ষোলো নম্বর জেটি কোন দিকে?'

'উত্তর দিকে, চার নম্বরটা,' জবাব দিল রানা।

'কিভাবে জানলে?'

'ওয়্যারহাউসের গায়ে সাইন দেখে। আমরা উনিশ নম্বর জেটি ছাড়িয়ে বিশ নম্বরে ঢুকেছিলাম।'

'তাহলে দেরি করছি কেন?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'ওদের মাথায় ঘিলু থাকলে ডাইভার নামিয়ে লাশ খুঁজতে আসবে-যে-কোন মুহূর্তে।'

পাইলিঙের ভেতর দিয়ে সাবধানে সাঁতার কাটছে ওরা। ডকে যদি রডনি বুমারের লোকজন থাকেও, তাদেরকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না। বিশ নম্বর জেটির গোড়ায় পৌঁছুল তিনজন, তারপর ডক ইয়ার্ডের দু'মুখ খোলা মূল পথের নিচেটা পার হলো-এই পথ সমস্ত লোডিং ডককে ছুঁয়ে গেছে-বাঁক ঘুরল ষোলো নম্বর জেটির দিকে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পার করে দিয়ে জেটির নিচে পানিতে প্রতিবিম্বিত আসমানী রঙের খোল দেখতে পেল মলি। 'পেয়েছি! পেয়েছি!' আনন্দে উল্লসিত হলো সে।

'প্রাইজ মানির আশায় থাকলে ঠকতে হতে পারে,' সাবধান করল রানা। 'দেখেন হয়তো আপনার ড্যাডির লোকজন ডকে গিজগিজ করছে।'

পাইলিং থেকে জাহাজটার খোল মাত্র দু'মিটার দূরে। পানি কেটে বিগ ডলির বোর্ডিং র‍্যাম্পের সরাসরি নিচে পৌঁছুল রানা। জাহাজে ওঠার আগে পাইলিং ধরে শরীরটা পানির ওপরে তুলল, উঁকি দিল ডকে।

বোর্ডিং র‍্যাম্পের চারদিক একদম খালি, তবে রডনি বুমারের একটা সিকিউরিটি ভ্যান জেটির সবচেয়ে কাছাকাছি এন্ট্রির মুখে পার্ক করা রয়েছে। চারজন লোককে দেখা যাচ্ছে, বিগ ডলির উল্টোদিকে নোঙর ফেলা একটা জাহাজের পাশে কয়েকটা কার আর কার্গো কন্টেইনারের মাঝখানে। ডকের কিনারা থেকে মাথা নামিয়ে নিচু স্বরে কথা বলল ও, 'প্রায় আশি মিটার দূরে জেটির মুখে পাহারা বসিয়েছে ওরা। বাধা দেয়ার আগেই জাহাজে উঠে পড়ব আমরা।'

কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না, বোর্ডিং র‍্যাম্প বেয়ে বিগ ডলির ডেকে উঠে এল ওরা। প্রথমে উঠল মলি, পিছু নিয়ে মুরল্যান্ড আর রানা। খোলা ডেকে ওঠার পর অস্বস্তিবোধ করল রানা, মনটা কেন যেন খুঁত খুঁত করছে। জেটির মুখ

থেকে লোকগুলো অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে দেখে সন্দেহ আরও বাড়ল ওর। কোন তাড়া নেই, চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, ওরা যেন জানত যে পানি থেকে সরাসরি বিগ ডলিতেই উঠবে প্রতিপক্ষ। ডেক পুরোপুরি খালি কেন? রানার মনে বিপদ সঙ্কেত বাজছে। কোথাও মারাত্মক একটা গোলমাল আছে। একটা ওয়ার্কিং শিপের ডেকে ক্রুরা কেউ একজন থাকতে বাধ্য। রোবোটিক সাবমারসিবল, সোনার ইকুইপমেন্ট, পানির গভীরে সার্ভে সিস্টেম নামানোর জন্যে প্রকাণ্ড উইঞ্চ, সবই নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে। এ-সব দুর্লভ সরঞ্জাম বিজ্ঞানী বা এঞ্জিনিয়াররা নাড়াচাড়া করছে না, এ অবিশ্বাস্য। অসহায় বোধ করছে রানা, জানে না পালাবার সময় পাবে কিনা, এই সময় কম্পানিয়নওয়ের একটা দরজা খুলে গেল, ডেকে বেরিয়ে এল পরিচিত একটা মূর্তি। 'আবার আমাদের দেখা হলো, মি. রানা,' ভুরু ও চোখ কুঁচকে বলল রবার্ট হল্ট। 'আপনি দেখছি হাল ছাড়ার পাত্র নন।'

দুই

ইউনিফর্ম পরা একদল সশস্ত্র লোক লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। চেহারা দেখে কিছু বোঝা না গেলেও, প্রবল হতাশা গ্রাস করল রানাকে, উপলব্ধি করল মেয়েকে হাতে পাবার পর রডনি বুমার এখন ওকে আর মুরল্যান্ডকে খুন করবেন। এখানে তিনি উপস্থিত না থাকলেও, ওরা ধরা পড়লে কি করতে হবে তা নিশ্চয়ই হল্টকে তাঁর বলা আছে। কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেখার জন্যে আড়চোখে মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। না, বন্ধুর চেহারায় কোন ভাবই ফোটেনি। মুরল্যান্ড হল্টের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন একটা কফিন দেখছে। হল্টও মাপছে মুরল্যান্ডকে, ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি।

মলির কাঁধে একটা হাত তুলল রানা। চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও, মলি তা পারছে না। মাথাটা কাত করল সে, রানার কাঁধে ঠেকাল। মলি নিজের জন্যে ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে রানা আর মুরল্যান্ডের কথা ভেবে, কারণ জানে ওদেরকে নিয়ে তার বাবা কি করবেন।

'ক্রুরা কোথায়?' হল্টকে জিজ্ঞেস করল রানা, লক্ষ করল লোকটার হাতের উল্টোদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। 'ওদেরকে আপনি কোথায় রেখেছেন?'

'জাহাজে ছিল মাত্র পাঁচজন, যার যার কোয়ার্টারে আটকে রেখেছি।'

'পাঁচজন মানে?'

'পাঁচজনই। বাকি সবাই মি. বুমারের দেয়া পার্টিতে যোগ দিতে গেছে। বিগ ডলির ক্রুদের সম্মানেই পার্টিটা, ওয়েলিংটনে সবচেয়ে দামী হোটেলে। মাইনিং কোম্পানী হিসেবে বুমার কনসোলিডেটেড-এর সুনাম আছে না, তার মালিক দাওয়াত দিলে কে না যেতে চাইবে।'

'তারমানে সব রকম প্রস্তুতিই নেয়া ছিল। নুমার কে আপনাদের জানিয়েছে যে আমরা এখানে আসছি?'

'একজন জিওলজিস্ট। আমি তার নাম জানি না। নুমার আন্ডারওয়াটার

মাইনিং প্রজেক্ট সম্পর্কে সে-ই মি. বুমারকে তথ্য দেয়। সারা দুনিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর সরকারের ভেতর এ-ধরনের বহু লোক রাখতে হয় আমাদেরকে।'

'করপোরেট স্পাই নেটওঅর্ক।'

'খুব দক্ষও। আপনি ওয়াশিংটনের ল্যাংলি থেকে কখন প্লেনে উঠেছেন তা-ও আমরা জানি।'

সশস্ত্র গার্ডরা ওদের তিনজনের কাছাকাছি আসছে না। 'লোহার শেকল, হাতকড়া, এ-সব কই?'

'মিস পার্কার হুকুম দিয়েছেন, জখম করা যাবে শুধু যদি আপনারা পালাতে চেষ্টা করেন।'

'হ্যাঁ, বাবা, মেয়ে বটে একখানা,' কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রানা। 'আমার ধারণা, ছোটবেলায় পাউলা তার পুতুলদেরও টরচার করত।'

'তা সে যাই হোক, আপনাদের জন্যে খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্ল্যান করেছেন মিস পার্কার।'

'আপনার খুলির কি অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'অবস্থা খারাপ হলে কি আপনাকে ধরার জন্যে এত দূর আসতে পারতাম?'

'কৌতূহল আর সাসপেন্স ধরে রাখতে পারছি না। এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'মিস পার্কার এখুনি চলে আসবেন। আপনাদেরকে ইয়টে তোলা হবে।'

'ফ্লোটিং ভিলাটার তো ক্যান্ডি দ্বীপে থাকার কথা,' বলল রানা।

'ছিল, ক'দিন আগে।' হাসল হল্ট। 'মি. বুমারের এই ইয়টে চারটে টার্বোচার্জড ডিজেল এঞ্জিন আছে, সব মিলিয়ে আঠারো হাজার হর্স পাওয়ার। আশি টন ওজন, ঘণ্টায় একশো বিশ কিলোমিটার স্পীড। মি. বুমার ইয়টটা মিস পার্কারকে দান করেছেন, মিস পার্কার ওটার সাহায্যে কোম্পানীর ছোটখাট স্বার্থ উদ্ধার করেন।'

'পাউলা সম্পর্কে আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই,' হঠাৎ মুখ খুলল মুরল্যান্ড। 'আমি মি. বুমার সম্পর্কে জানতে চাই। মন-খুশির জন্যে হীরে গোণা ছাড়া আর কি করেন তিনি?'

দপ করে জ্বলে উঠল হল্টের চোখ দুটো, নিভে গেল মুখের হাসি। 'আপনাদের এসব কৌতুক মি. বুমারকে স্পর্শ করবে না,' বলল সে। 'তার আগে মিস পার্কারই আপনাদের ব্যবস্থা করবেন।'

অবিশ্বাস্য গতিতে এক টানা ত্রিশ ঘণ্টা ছোটার পর শক্তিশালী টার্বোডিজেল এখন ভোঁতা আওয়াজ করছে, গতি হারিয়ে শান্ত ঢেউ আর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ইয়ট। নিউজিল্যান্ডের তীররেখা অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। উত্তর আর পশ্চিমে কালো মেঘ জমেছে, কিনারায় মাঝে মধ্যেই ঝলসে উঠছে বৈদ্যুতিক নকশা, ঢাকের বাদ্যির মত গুরু-গুরু আওয়াজ ভেসে আসছে। দক্ষিণ আর পুব দিকে কোন মেঘ নেই, স্বচ্ছ নীল পরিষ্কার আকাশ।

রানা আর মুরল্যান্ড রাতটুকু, তারপর আজ দুপুর পর্যন্ত, এঞ্জিন রূমের পিছনে

ছোট একটা সাপ্লাই কমপার্টমেন্টে কাটিয়েছে। কামরাটা এত ছোট যে ডেকে হাঁটু ভাঁজ করে বসতে হয়েছে। বেশির ভাগ সময় জেগেই ছিল রানা, মনটাকে শক্ত আর মগজটাকে সচেতন রেখেছে। হার মানতে রাজি নই, এরকম একটা মনোভাব নিয়ে কামরাটার দরজা ফ্রেম থেকে কব্জা সহ ভেঙে ফেলেছিল মুরল্যান্ড। যদিও তাতে কোন লাভ হয়নি। দরজা ভাঙার পর চারজন গার্ডের সামনে পড়তে হয় তাকে, একজন অটোমেটিক রাইফেল্ ঠেকায় তার নাভিতে। ব্যর্থ হয়ে ডেকে কুণ্ডলী পাকায় সে, দরজাটা মেরামত করার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

রানা ভাবছে, এখনও ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কারণ কি? যেন ওর প্রশ্নের জবাব দিতেই দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল রবার্ট হল্ট। হাসিখুশি লাগছে তাকে। 'এবার অন্য একটা ভেসেলে উঠতে হয় আপনাদের।'

'বোট বদলাতে হবে? কেন?'

'কেন? হাহ্। একটু পরই বুঝতে পারবেন।'

মুরল্যান্ড বলল, 'আশা করি এটার চেয়ে ভাল সার্ভিস পাব ওখানে। নতুন বোটে আমাদের লাগেজগুলো যেন পাই।'

মুরল্যান্ডের কথায় কান দিল না হল্ট। 'তাড়াতাড়ি করুন, প্লীজ। অপেক্ষা করিয়ে রাখলে মিস পার্কার আবার রেগে যান।'

স্টার্ন ডেকে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে। গার্ডদের ছোট একটা দল পাহারায় রয়েছে। অটোমেটিক রাইফেল তো আছেই, তবে কয়েকজনের হাতে হকিস্টিকও দেখা যাচ্ছে। রানা ধারণা করল, আয়োজনটা খুন করার নয়। হাতঘড়ি দেখল, এগারোটা বাজে। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ও, তবে মাথার ওপরের মেঘ থেকে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরল গায়ে।

একটা ওভারহ্যাঙ-এর নিচে বসে রয়েছে পাউলা, সামনে টেবিল। টেবিলের ওপর সুস্বাদু খাবারদাবার, প্রতিটি ডিশ উপচে পড়ার অবস্থা। তার দুই কনুইয়ের পিছনে ইউনিফর্ম পরা দু'জন অ্যাটেনড্যান্ট দাঁড়িয়ে–একজন ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ওয়াইনগ্লাস ভরছে, আরেকজন ব্যবহৃত ডিশ বদলাচ্ছে। দশজনের খাবার নিয়ে একাই বসেছে পাউলা। মলিকে খুঁজল রানা, কিন্তু দেখতে পেল না কোথাও।

'বিদায় জানাতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,' ক্যাভিয়ার ভরা টোস্টে কামড় দিয়ে বলল পাউলা। 'আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনাদের দু'জনকে নিয়ে একটু খেলি, কিন্তু রডনি তাগাদা দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপদ দূর করতে হবে।'

'তুমি জানো না, ক্যাভিয়ার বয়কট করা উচিত?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'পোচারদের কল্যাণে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে...'

'সেজন্যেই শুধু ধনী লোকজন কেনার সামর্থ্য রাখে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ফাঁকা সাগরের দিকে তাকাল রানা, আসন্ন ঝড়ের মুখে ভয়ঙ্কর আর কুৎসিত লাগছে। 'শুনলাম অন্য একটা বোটে উঠব আমরা?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সেটা?'

'ইয়টের পাশে ভাসছে।'

'ও।' রানা একদম শান্ত। 'ও, আচ্ছা। তোমার প্ল্যান তাহলে আমাদেরকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া?'

ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁটের কোণ মুছল পাউলা। 'এঞ্জিন ছাড়া খুব ছোট একটা বোট যোগাড় করা গেছে, সেজন্যে দুঃখিত। তবে আইডিয়াটা আমার নয়—রডনির।'

চোখ তুলে একজোড়া হাই-পারফরম্যান্স পাওয়ারবোটের দিকে তাকাল মুরল্যান্ড, ইয়টের আপার ডেকে ঝুলছে। 'তোমার উদারতায় আমরা মুগ্ধ।'

'রডনির জায়গায় আমি হলে মৃত্যুদণ্ড দিতাম,' বলল পাউলা। 'কি কারণে জানি না, সে আপনাদেরকে বাঁচার একটা সুযোগ দিচ্ছে।'

'এটাকে বাঁচার সুযোগ বলে?' তিক্ত হাসল রানা। 'সাগরের এদিকে কোন জাহাজ চলাচল করে না। তাছাড়া, বড় একটা ঝড় আসছে। আর কিছু না হোক, কিছু কাগজ-কলম দিতে পারতে, আপনজনদের শুভেচ্ছা জানাতাম।'

'আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। গুড বাই, মি. রানা। গুড বাই, মি. মুরল্যান্ড। বন ভয়েজ।' হল্টের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল পাউলা। 'ওদেরকে বোটে নিয়ে যাও।'

রেইলিং-এ বসানো গেট দেখাল হল্ট।

এগিয়ে এসে ডেকের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল রানা। ইয়টের পাশে একটা সেমি-ইনফ্লোটেবল বোট ঢেউয়ের তালে তালে ওঠা-নামা করছে। তিন মিটার লম্বা, দুই মিটার চওড়া, ফাইবারগ্লাস ভি-হাল। সেন্ট্রাল কমপার্টমেন্টে কোন রকমে চারজনের জায়গা হতে পারে—আউটার ফ্লোটেশন টিউব বোটের অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে। এক সময় বোটে একটা আউটবোর্ড এঞ্জিন ফিট করা ছিল, সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেন্ট্রাল কনসোল থেকে এখনও কন্ট্রোল কেবল ঝুলছে। ভেতরটা ফাঁকা, শুধু রানার লেদার জ্যাকেটে মোড়া একটা মূর্তি এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

রানার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। হল্টের ইয়টিং জ্যাকেটের কলারটা মুঠোয় চেপে ধরল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরিয়ে আনল, রোগা-পাতলা হল্ট যেন একটা কাকতাড়ুয়া। ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিল ও, কেউ বাধা দেয়ার আগেই ডাইনিং টেবিলের দিকে ছুটে এল। চিৎকার করে বলল, 'মলি কেন?'

গার্ডদের দিকে তাকাল পাউলা। সবাই যে যার অস্ত্র রানার দিকে তাক করে রেখেছে, পাউলা হুকুম দিলেই ঝাঁঝরা করে দেবে। ঠোঁটে পিশাচিনীর হাসি। 'মলি কেন মানে? আমি চাইছি, তাই।'

'রডনি বুমার তাঁর একমাত্র মেয়েকে এভাবে সাগরে ভাসিয়ে দেবেন? এ আমি বিশ্বাস করি না!' রানা হতভম্ব, দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'রডনির এখানে কোন ভূমিকা নেই,' বলল পাউলা। 'তাকে বলা হবে, ডাইনীটা স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে গেছে।'

'তারমানে মলি আর তার ড্যাডির বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র।'

'আমি স্রেফ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি,' বলল পাউলা, সারা মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'মলি না থাকলে রডনির সমস্ত সয়-সম্পত্তির মালিক এক

সময় একা আমি হব।' রানা লাফ দেবে বুঝতে পেরে চিৎকার করল সে. 'মারো ওকে! সামলাও!'

সত্যি সত্যি লাফ দিয়েছে রানা, কিন্তু ও শূন্যে থাকতেই একজন গার্ড রাইফেলের বাঁট দিয়ে কাঁধের ওপর প্রচণ্ড বাড়ি মারল।

টেবিলের সামনে ভারী বস্তার মত পড়ল রানা, ব্যথায় গোঙাচ্ছে, সর্ষে ফুল দেখছে চোখে। যেন পো মোশনে নড়ছে ও, ডেক থেকে হাত লম্বা করে টেবিল ক্লদের ঝুল ধরে টান দিল। গ্লাস, ছুরি, ফর্ক, চামচ, সার্ভিং ডিশ আর প্লেট, সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভাঙচুরের আওয়াজ থামেনি, ডেকের ওপর সিধে হলো রানা। লাফ দেয়ায় অতিকায় দৈত্যের মত লাগছে ওকে। টেবিলের মাঝখানে পড়ল। ব্যথায় এখনও কাতর আওয়াজ করছে ও। হাত বাড়িয়ে নাগাল পেয়ে গেল পাউলার সরু গলাটা। পাউলা তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে, রানার চোখে লম্বা নখ ঢোকাবার চেষ্টা করছে। রানার হাত তার গলায় চেপে বসল। আরেকটু জোরে, আরেকটু জোরে, মনে মনে বলছে রানা। বুঝতে পারছে, হাতে তেমন জোর পাচ্ছে না। কাঁধের ব্যথাটা অসম্ভব দুর্বল করে ফেলছে ওকে। পরমুহূর্তে অনুভব করল পাথর বৃষ্টির মত ঘুসি পড়ছে শরীরে, কয়েকজন মিলে মারছে—প্রতিটি হাড় যেন ভেঙে ফেলবে। সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল রানা. তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

সজাগ হবার পর রানা ভাবল, ও বোধহয় মাটির তলায় পাতালে রয়েছে, কিংবা কোন গুহায়। এখানে শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার. কিংবা সে অন্ধ হয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে একটা পথ খুঁজছে, কিন্তু মনে হলো গোলকধাঁধার ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছে। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না, হঠাৎ ঠিক এক পলকের জন্যে অনেক দূরে সামনে ক্ষীণ একটু আলো দেখতে পেল। হাত বাড়িয়ে নাগাল পেতে চাইল রানা, দেখল আকাশের গায়ে কালো মেঘে পরিণত হলো সেটা।

'সকল প্রশংসা তাঁর, তিনি পরম করুণাময়—মৃত্যুর পর প্রাণ ফিরে পাবার দ্বিতীয় ঘটনা এটা,' যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল মুরল্যান্ডের গলা। 'তবে আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যু আবার ওকে ছিনিয়ে নেবে. এবার ওর সঙ্গে আমাদেরকেও।'

ধীরে ধীরে যতই সচেতন হচ্ছে রানা ততই ইচ্ছে হচ্ছে অভিশপ্ত গোলকধাঁধায় আবার ফিরে যায়। শরীরের প্রতি সেন্টিমিটার প্রচণ্ড ব্যথায় দপ-দপ করছে। খুলি থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রতিটি হাড় যেন ভাঙা। বসার চেষ্টা করল রানা, তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠে বাদ দিল চেষ্টাটা। ওর মুখ আর গলায় হাত বুলাল মলি। 'রানা! রানা, আমি মলি। নড়বে না, প্লীজ। লক্ষ্মী, নড়লে তুমি কষ্ট পাবে।'

মলির চোখে তাকাল রানা। সেখানে রাজ্যের উদ্বেগ আর কাতরতা। কি ঘটছে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল ও। প্রথমে ওর কপালে, তারপর ওর চোখে, সবশেষে ওর ঠোঁটে হালকা চুমো খাচ্ছে মেয়েটা। তীব্র যন্ত্রণা একদম হালকা হয়ে গেল। 'আমারই বোকামি, তাই না?' বিড়বিড় করল ও। 'সবার জন্যে বিপদ ডেকে আনলাম।'

'না-না! এ সত্যি নয়। দায়ী আসলে আমি। আমার কারণেই তোমরা আজ এখানে।'

'প্রথমে তোমাকে আচ্ছামত ধোলাই দেয় হল্টের লোকজন, তারপর ধাক্কা মেরে ইয়ট থেকে বোটে ফেলে দেয়,' বলল মুরল্যান্ড। 'দুঃখিত, আমি কাঁদিনি। সময় পেলাম কোথায়, তোমার সেবায় ব্যস্ত ছিলাম না!'

মলির কাঁধে ভর দিয়ে বসল রানা। 'পাউলা?'

'তার একটা চোখে রক্ত দেখেছি, ওটা বোধহয় নষ্টই হয়ে গেছে।'

'তোমাকে যখন গার্ডরা মারধর করছিল, হল্ট আর একজন গার্ড ধরাধরি করে কেবিনে নিয়ে যায় তাকে,' বলল মলি। 'পাউলার জখম কতটা সিরিয়াস হল্ট সম্ভবত তা বুঝতে পারেনি, তা পারলে তোমাকে হয়তো মেরেই ফেলত।'

রানার চোখ দুটো ফুলে আছে, গোমড়ামুখো খালি সাগরের ওপর দৃষ্টি বুলাল। 'ওরা চলে গেছে?'

'ইয়টটা আমাদেরকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিল,' বলল মুরল্যান্ড। 'ঝড় আসছে দেখে পালিয়ে গেল। তবে বেঁচে গেছি আমাদের এই ভেলায় রাবার ফ্লোট থাকায়। এঞ্জিন ছাড়া এটাকে ভেলাই বলতে হয়। ইয়টের বোতে ধাক্কা খেয়ে ফুটবলের মত ফিরে এসেছে বারবার। একবার উল্টে গেলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।'

'এই মুহূর্তে আমরা তাহলে অসহায়?' আবার সাগরের ওপর চোখ বুলাল রানা। 'ঠিক কি আশঙ্কা করছি?'

'আবহাওয়া সম্পর্কে আমার শিক্ষা বলছে,' আঙুল তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকটা দেখাল মুরল্যান্ড, 'টাইফুন বা সাইক্লোন যে পথে আসবে সেই পথের ওপর বসে আছি আমরা—নির্ভর করে ভারত মহাসাগরের কত কাছাকাছি রয়েছি তার ওপর।'

কুৎসিতদর্শন কালো মেঘ, ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের পিছু ধেয়ে আসা গুরুগম্ভীর গর্জন, আর প্রতি মুহূর্তে প্রবল বাতাসের গতিবৃদ্ধি রানার মনটাকে শঙ্কিত করে তুলছে। জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধান পিঁয়াজ-রসুনের খোসার চেয়ে বেশি পুরু নয়। এরইমধ্যে আকাশ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে সূর্যকে, সাগর যেন ছাই মেখেছে। মনে হলো তুমুল আলোড়ন খুদে বোটটাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রাস করে ফেলবে।

রানার মধ্যে এখন আর কোন ইতস্তত ভাব নেই। 'প্রথমে একটা সী অ্যাংকার দরকার,' তাগাদার সুরে বলল। 'মলি, আমার লেদার জ্যাকেটটা দাও। ববি, দেখো রশি আর ভারী কিছু পাও কিনা। বোটকে টেনে রাখে এমন কিছু একটা তৈরি করতে হবে, ঝড় উঠলে যাতে উল্টে না যায়।'

কথা না বলে গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে দিল মলি। সীটের নিচে ছোট একটা স্টোরেজ লকার খুলে ভেতরটা হাতড়াচ্ছে মুরল্যান্ড। মরচে ধরা গ্র্যাপলিং হুক লাগানো দুই প্রস্থ নাইলন রশি পেল সে, একটা পাঁচ মিটার লম্বা, আরেকটা তিন মিটার। জ্যাকেটটা মেলল রানা, ভেতরে ভরল সবার জুতো, গ্র্যাপলিং হুক, পুরানো কিছু এঞ্জিন পার্টস, আর স্টোরেজ লকার থেকে মুরল্যান্ডের উদ্ধার করা ভারী কিছু টুলস। ভারী একটা বান্ডিল তৈরি হলো, ছোট রশিতে বেঁধে ফেলে দেয়া হলো পানিতে। বান্ডিলের সঙ্গে জোড়া লাগানো হয়েছে দ্বিতীয় রশিটাও, সেটা খুলে নেয়া আউটবোর্ড এঞ্জিনের অকেজো কন্ট্রোলের সঙ্গে জড়ানো হলো। 'বোটের মেঝেতে শুয়ে পড়ো সবাই,' নির্দেশ দিল রানা, লাইনের বাকি অংশ সেন্ট্রাল কনসোলের সঙ্গে

শক্ত করে বাঁধল। 'লূপ বানিয়ে কোমরে জড়াও লাইনটা, বোট উল্টে গেলেও আমরা যাতে ভেসে না যাই।'

বয়ান্সি টিউবের ওপর দিয়ে দিগন্ত থেকে ছুটে আসা রোমহর্ষক ঢেউগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল রানা, সাপের মত ফণা তুলে আবার নত হচ্ছে। সাগর একই সঙ্গে কুৎসিত ও সুন্দর। মিশমিশে কালো আকাশে ছুটোছুটি করছে অগুনতি বিদ্যুৎ রেখা, এক হাজার ঢাক পেটানোর মত বিরতিহীন গর্জন করছে মেঘ। নির্মম কশাঘাতের মত তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। দশ মিনিট পর বাতাসের উন্মত্ততা তুঙ্গে উঠে গেল। সাগর উথলে উঠল, ফেনা যেন টগবগ করে ফুটছে। খেপে গিয়ে বাতাস শুরু করল প্রলয় নৃত্য, এমন গজরাচ্ছে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে এক লাখ পেত্নী।

ঢেউয়ের মাথা থেকে তিন মিটার ওপরে লাফ দিচ্ছে পানির ছিটে। প্রায় অকস্মাৎই সাত মিটার উঁচু হলো একেকটা ঢেউ, ভাঙাচোরা আর দিকভ্রান্ত, এই এখন আঘাত করছে এদিক থেকে, তো তারপরই আরেক দিক থেকে। ভঙ্গুর বোটের বিরুদ্ধে সাগরের হামলা ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের আহাজারি। ঢেউয়ের মাথা থেকে নিচে গোত্তা খেয়ে নামার সময় বোটটা লাটিমের মত পাক খাচ্ছে। সাগর আর আকাশকে আলাদা করবে এমন কোন স্পষ্ট রেখা কোথাও নেই। ওরা বলতে পারবে না কোথায় কোনটার শুরু বা শেষ।

আশ্চর্যই বলতে হবে যে সী অ্যাংকার ছিঁড়ে যায়নি। টান বজায় রেখে বোটটাকে উল্টে যেতে না দেয়ার দায়িত্ব ঠিকই পালন করে যাচ্ছে ওটা। ধূসর ঢেউ ফণার মত বাঁকা হয়ে গ্রাস করে ফেলছে ওদেরকে, বোটের ভেতরটা ভরে দিচ্ছে ফুটন্ত ফেনায়, ভিজে গোসল হয়ে যাচ্ছে ওরা, তবে বোটের মাঝখানে পানি জমায় খানিকটা হলেও ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে।

এক অর্থে বোটের খুদে আকৃতি আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। চারদিকের কিনারায় রাবারের টিউব একটা কর্কের মত ভাসিয়ে রেখেছে ওটাকে। সাগর যতই মারমুখো হয়ে উঠুক, রাবারের খোল বিস্ফোরিত হবে না, আর যদি সী অ্যাংকার টিকে থাকে, উল্টেও যাবে না। পরবর্তী চব্বিশ মিনিটকে মনে হলো চব্বিশটা ঘণ্টা। বেঁচে থাকার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করছে ওরা, রানার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে ঝড়টা ওদেরকে কাবু করতে পারছে না।

পানির সীমাহীন পাঁচিল ঢলে পড়ছে বোটে, হাঁপিয়ে উঠছে ওরা, বিষম খাচ্ছে, যতক্ষণ না বোট আবার পরবর্তী ঢেউয়ের মাথায় চড়ে। পানি সেঁচার কোন প্রয়োজন হলো না। জমে ওঠা পানির ওজনই উল্টে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে বোটকে।

মলিকে মাঝখানে রেখেছে ওরা, দু'জনের একটা করে হাত জড়িয়ে রেখেছে তাকে। রানা ও মুরল্যান্ড বোটের এক পাশে পা বাধিয়েছে সাপোর্ট পাবার জন্যে। কেউ একজন যদি বোটের বাইরে ছিটকে পড়ে, উদ্ধার করার কোন সুযোগই থাকবে না। মোচড়রত এই সাগরে একা কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রবল বর্ষণ দৃষ্টিসীমা মাত্র কয়েক মিটারে কমিয়ে এনেছে, বোট থেকে কেউ পড়ে গেলে তাকে আর দেখাই যাবে না।

বিদ্যুচ্চমকের সময় মলিকে দেখল রানা। এমন করুণ চেহারা খুব কমই

দেখেছে ও। এই নরকতুল্য দুর্দশার মধ্যে মেয়েটাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারলে খুশি হত, কিন্তু জানে বাতাসের গর্জনে ওর কোন কথাই তার কানে পৌঁছুবে না। রডনি বুমারকে মনে মনে অভিশাপ দিল ও। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে, এ কেমন পাষণ্ড বাপ! অপরাধ সমর্থন করে না বলে লোকটা নিজের মেয়েকে মেরে ফেলতে চাইছে!

কিন্তু এত বড় অন্যায় রানা ঘটতে দেবে না। ও যদি বেঁচে থাকে, মলিও বেঁচে থাকবে। তার কাঁধে সস্নেহে একটু চাপ দিল ও। তারপর মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল।

যেন মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ একটা পাথুরে মূর্তি। বসে আছে নির্লিপ্ত। শুধু তার চোখের ভাষায় লেখা আছে, যা ঘটে ঘটুক। এ এমন একজন মানুষ যার সহ্যক্ষমতার কোন শেষ নেই। রানা জানে, সচেতনতার কিনারা থেকে খসে পড়ে চৈতন্যহীনতার অতল তলে হারিয়ে যাবে মুরল্যান্ড, এমনকি মারাও যাবে, তবু বোট আর মলিকে ধরে রাখা তার হাতের মুঠো এতটুকু আলগা হবে না। কোন অবস্থাতেই সাগরের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না সে।

অন্ধকার ঘনাল এবং আবার তা কেটেও গেল। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে ওরা, সারাক্ষণ ভিজছে। আতঙ্ক ভরা রাতটা কিভাবে যে কাটল বলতে পারবে না ওরা। ভোরের আলো খানিকটা স্বস্তিকর ঠেকল এই জন্যে যে হিংস্র সাগরকে তবু দেখা যাচ্ছে।

ফ্লোটেশন টিউবের তলায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে মলি, তবে জ্ঞান হারায়নি। ঈশ্বরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে সে, বেঁচে থাকতে চাইছে ছেলে দুটোর কথা ভেবে। উন্মাদ ড্যাডির কবল থেকে ওদেরকে তার উদ্ধার করতে হবে। বাঁচার কোন আশা নেই, জানে মলি, তবে সঙ্গী দুই পুরুষের আচরণ আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে তাকে। ওদের আত্মনিয়ন্ত্রণ তুলনাবিহীন, অসাধারণ; ওদের সাহস আর শক্তি তার ভেতরও সংক্রমিত হচ্ছে। নিজেকে তার অসম্ভব ভাগ্যবতী মনে হলো, ঈশ্বর এদের চেয়ে যোগ্য কোন লোকের হাতে তাকে তুলে দিতে পারতেন বলে মনে হয় না। মলির ধারণা, ওরা তাকে ঠিকই বাঁচাবে।

রানা অবশ্য অতটা আশাবাদী নয়। ও সচেতন, ওর আর মুরল্যান্ডের শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। ওদের প্রবল দুই শত্রু ক্লান্তি আর হাইপথারমিয়া। একটাকে পরাজয় মানতে হবে—হয় ওদের টিকে থাকার ক্ষমতাকে, নয়তো ঝড়ের তীব্রতাকে। সলিল সমাধি ঠেকাতে ওদের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা অসম যুদ্ধ, মনোবল অটুট থাকা সত্ত্বেও শারীরিক ক্ষমতা ফুরিয়ে যেতে পারে। তবু নিয়তির নির্দয় বিধান মেনে নিতে রাজি নয় রানা, জীবনকে আঁকড়ে ধরে ঝুলে আছে। মৃত্যু যদি আসে তো আসুক, তাকে ফিরিয়ে দেয়ার সব চেষ্টাই করা হবে।

পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ বাতাসের দাপট কমে এল, তার খানিক পর সাগরও একটু শান্ত হলো। ওরা জানে না, উত্তর-পশ্চিম মুখো যাত্রাপথ ছেড়ে টাইফুনটা হঠাৎ দক্ষিণ-পুবে বাঁক নিয়ে অ্যান্টার্কটিকার দিকে রওনা হয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার, সেটা শুধু ষাটে নেমে এল। সাগরের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে পড়ল, ঢেউগুলো এখন আর তিন মিটারের বেশি উঁচু হচ্ছে না। বৃষ্টি

থামেনি, তবে ফোঁটাগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে, জলকণায় ঢাকা পড়েছে গোটা সাগর। মাথার ওপর কোত্থেকে কে জানে নিঃসঙ্গ একটা গাঙচিল উদয় হলো, বোটটাকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময় চিৎকার করছে, যেন এখনও ওটাকে ভেসে থাকতে দেখে তার বিস্ময় বাধ মানছে না।

এক ঘণ্টা পর আকাশ খালি হয়ে গেল। মেঘ নেই, তেমন বাতাসও নেই। আক্রোশে ফুঁসে ওঠা সাগর আর অপ্রকৃতিস্থ বাতাস ওদেরকে ডুবিয়ে মারতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ওরা, কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না। রাতটা কাটল তন্দ্রা আর ঘোরের মধ্যে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আবার সূর্যের মুখ দেখল ওরা। কিন্তু রোদ এত গরম যে নতুন একটা উপদ্রব হয়ে দেখা দিল। উঠে বসতে গিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা। হল্টের লোকজন তো মেরেছেই, তারপর বোটে অনবরত বাড়ি খেয়ে খেয়ে থেঁতলে গেছে শরীরটা। পানিতে রোদের প্রতিফলন ধাঁধিয়ে দিল চোখ দুটোকে। শুয়ে-বসে থাকা আর অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই ওদের করার নেই। কিন্তু অপেক্ষাই বা কিসের জন্যে? কোনও জাহাজ এ পথে আসবে, দেখতে পাবে ওদেরকে, এই আশায়? কিন্তু না, ওরা সাগরের প্রবেশ নিষিদ্ধ একটা এলাকায় রয়েছে, এদিকে কোন জাহাজ চলাচল করে না।

হল্ট ওদেরকে ভাল জায়গাতেই ভাসিয়ে দিয়েছে। সে জানত, টাইফুন থেকে ওরা যদি কোন রকমে বেঁচে যায়ও, পানি আর খাবারের অভাবে নির্ঘাত মারা যাবে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রানা, অন্তত প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে ওকে। মলির এই অবস্থার জন্যে পাউলা দায়ী, তাকে সাহায্য করেছে হল্ট; এই দু'জনকে ছাড়বে না ও।

রানাকে ধরে ঝুলে আছে মলি, তার কাঁপুনি অনুভব করছে রানা। 'সব কি রকম শান্ত হয়ে গেছে, তাই না? অথচ আমার মাথার ভেতর এখনও যেন ঝড়টা থামেনি।'

হাত দিয়ে ঘষে চোখের জমাট বাঁধা লবণ সরাল রানা, মলির চোখে তাকাল। খিদে আর অনিদ্রা কাহিল করে ফেলেছে মেয়েটাকে, তবে নির্দয় সাগরের গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ায় ক্লান্ত চোখের মণিতে উল্লাস আর আনন্দের মাতামাতি লক্ষ করার মত। সারাটা রাত, তারপর সকাল থেকেও, ঠিক এভাবেই ওর বুকে লেপ্টে রয়েছে মলি, নিরাপদ আশ্রয় মনে করে ভুলেও ঢিল দেয়নি আলিঙ্গনে। 'ঢেউয়ের মাঝখানে বসে আছ, তুমি যেন ঠিক ভেনাস।'

রানাকে ছেড়ে সিধে হয়ে বসল মলি, লবণ লেগে থাকা চুল ঝাড়ল। 'বললেই হলো!' লালচে হলো চেহারা। 'অত সুন্দর নই আমি।' সোয়েটার ওপরে তুলে কোমর পেঁচিয়ে থাকা লাল দাগটা পরীক্ষা করল, রশির কামড়ে তৈরি হয়েছে।

এক চোখ খুলে তাকাল মুরল্যান্ড। 'খেয়াল রাখা দরকার এখানে একজন ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন। তোমরা দু'জন এভাবে যদি ডিসটার্ব করতে থাকো, হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে কমপ্লেন করতে বাধ্য হব আমি।'

'সুইমিং পুলে ডুব দিতে যাচ্ছি আমরা, তারপর লনে বসে ব্রেকফাস্ট সারব,' মলির চেহারায় কৃত্রিম হাসি। 'আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না।'

'আমি রূম সার্ভিসকে ডাকব,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড।

'সবাই যখন এত হাসি-খুশি,' বলল রানা, 'এসো অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কি করা

যায় আলোচনা করি।'

'কেউ এসে উদ্ধার করবে আমাদের, এরকম সম্ভাবনা কতটুকু?' জানতে চাইল মলি।

'শূন্য,' জবাব দিল রানা। 'এদিকে কোন জাহাজ চলাচল করে না। আর নুমা জানে না আমরা কোথায় আছি। জানলেও কোথায় খুঁজতে হবে বুঝতে পারত না। বাঁচতে হলে নিজেদের চেষ্টায় বাঁচতে হবে।'

সী অ্যাংকার পানি থেকে তুলে রানার জ্যাকেট খোলা হলো। নিজেদের জুতো, টুলস আর অন্যান্য জিনিস বের করল রানা। তারপর একটা হিসাব নেয়া হলো, কি কি আছে বোটে। যত নগণ্যই হোক, কোন আইটেম বাদ দেয়া হলো না। সামনে দীর্ঘ পথ, কখন কোনটা কাজে লাগে বলা যায় না। সব শেষে একটা প্যাকেট বের করল রানা, বাস নিয়ে পানিতে পড়ার আগে প্যান্টের পকেটে রেখেছিল। 'বোটে কি কি পাওয়া গেল?' মুরল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল ও।

'স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে তিন সাইজের তিনটে রেঞ্চ, একটা স্ক্রুড্রাইভার, একটা ফুয়েল পাম্প, চারটে স্পার্ক প্লাগ, কিছু নাট-বল্টু, একজোড়া কম্বল, কাঠের একটা বৈঠা, নাইলনের বোট কাভার—এই সবই শুধু।'

'এই সবই মানে কি আরও কিছু?'

ছোট একটা হ্যান্ড পাম্প উঁচু করে দেখাল মুরল্যান্ড। 'হ্যাঁ। এই যেমন এটা, ফ্লোটেশন টিউবে বাতাস ভরার কাজে লাগবে।'

'বৈঠাটা কত লম্বা?'

'এক মিটারের কিছু বেশি।'

'পাল তোলার জন্যে ব্যবহার করা যাবে না।'

'তা না গেলেও, কনসোলে বাঁধতে পারলে তাঁবুর খুঁটি হিসেবে কাজে লাগবে। বোট কাভারটা চাঁদোয়া হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব, ছায়া পাওয়া যাবে।'

মলি মনে করিয়ে দিল, 'আবার বৃষ্টি এলে ওই কাভারে পানি ধরা যেতে পারে।'

তার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার সঙ্গে এমন কিছু আছে, কাজে লাগতে পারে?'

মাথা নাড়ল মলি। 'শুধু কাপড়চোপড়। পাউলা আমাকে লিপিস্টিক পর্যন্ত নিতে দেয়নি, তার আগেই ধাক্কা দিয়ে ভেলায় ফেলে দিল।'

ছোট ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটটা খুলল রানা। ভেতর থেকে বেরুল সুইস আর্মি নাইফ, বয় স্কাউট কম্পাস, দেশলাই, খুদে ফার্স্ট এইড কিট, আর একটা .২৫ ক্যালিবার মাউজার অটোমেটিক পিস্তল, সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ক্লিপ।

খুদে অস্ত্রটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মলি। 'হন্ট আর পাউলাকে তুমি গুলি করতে পারতে।'

'পারতাম, কিন্তু তারপর অতগুলো সিকিউরিটি গার্ডকে সামলাতে পারতাম কি?'

'তুমি কি সব সময় সঙ্গে একটা সারভাইভাল কিট রাখো?'

'স্কুল লাইফ থেকে।'

'এই অথৈ সাগরের মাঝখানে কাকে তুমি গুলি করতে চাও?'

'এই ধরো একটা পাখিকে, মানে যদি নাগালের মধ্যে পেয়ে যাই।'

মুরল্যান্ড ফ্লোটেশন টিউবগুলোয় নতুন করে বাতাস ভরল। টিউবে কোন লিক নেই, নিশ্চিত হবার পর ফাইভারগ্লাস খোলটা পরীক্ষা করল রানা। কোথাও কোন মেরামত প্রয়োজন নেই দেখে স্বস্তিবোধ করল। সারাটা দিন এটা-সেটা নানা কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখল মুরল্যান্ড আর মলিকে, ওরা যাতে খিদে আর পিপাসা ভুলে থাকতে পারে। মুরল্যান্ড বোট কাভার টাঙিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করেছে। চাঁদোয়ার একটা প্রান্ত ঢালু করে রেখেছে সে, নিচে পেতে দিয়েছে একটা আইস চেস্ট, বৃষ্টি হলে ওটায় পানি জমবে। এক প্রস্থ নাইলন রশি কেটে ফিশিং লাইন তৈরি করে ফেলল রানা।

দুই হাজার কিলোমিটারের মধ্যে খাবার জিনিস বলতে আছে শুধু এক মাছ। দু'একটা ধরতে না পারলে অভুক্ত থাকতে হবে ওদেরকে। বেল্ট বাকল থেকে একটা কাঁটা খুলে হুক বানাল রানা, হুক বা বড়শিটা লাইনে বাঁধল। লাইনের অপর প্রান্তটা জড়িয়েছে একটা রেঞ্চের হাতলে, ধরতে সুবিধে হবে। কেঁচো বা প্রজাপতি নেই, নেই পনিরের টুকরো বা পাউরুটি। কিন্তু টোপ না থাকলে মাছ খাবেটা কি? ফ্লোটেশন টিউবের ওপর ঝুঁকল রানা, চোখের চারপাশে হাতের ছায়া তৈরি করল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পানিতে।

এরইমধ্যে অনুসন্ধানী অতিথিরা বোটের নিচের ছায়ায় ভিড় জমাতে শুরু করেছে। বড় এঞ্জিন বিশিষ্ট বোট বা শিপে যারা থাকে, প্রায়ই তারা অভিযোগ করে যে খোলা সাগরে প্রাণের কোন অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। কি করে ধরা পড়বে, এঞ্জিনের আওয়াজ আর প্রপেলারের তৈরি আলোড়ন মৎস্যকুলকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করে। নিচু বোটের সুবিধে হলো, ওখান থেকে পানির গভীরে তাকানো যায়।

এক ঝাঁক অচেনা মাছ দেখল রানা, কোনটাই আঙুলের চেয়ে লম্বা নয়, বোটের চারপাশে ছুটোছুটি করছে। ডলফিন আর শুশুকগুলোকে চিনতে পারল। এক জোড়া বড় আকৃতির ম্যাকেরালও চক্কর দিচ্ছে, সুযোগ পেলেই ঠোকর মারছে ছোট মাছগুলোকে। ছোট একটা হাঙরও দেখতে পেল রানা—হ্যামারহেড।

'টোপ হিসেবে কি ব্যবহার করবে?' জিজ্ঞেস করল মলি। রানার কাণ্ড দেখে কৌতুক বোধ করছে সে।

'মাংস,' বলল রানা। 'খুদে মাছগুলোর সুস্বাদু খোরাক হতে যাচ্ছি আমি।'

'বুঝলাম না। কি বলতে চাইছ?'

'দেখে শেখো।'

রানাকে ছুরি হাতে নিতে দেখে আঁতকে উঠল মলি। প্যান্টের একটা পায়া গুটাল রানা, শান্ত ভাবে উরুর পিছন থেকে ছোট্ট এক টুকরো মাংস কেটে নিল, তারপর বড়শিতে গাঁথল সেটা। ব্যাপারটা এত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করা হলো যে বোটের মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্ত না দেখার আগে কিছুই টের পেল না মুরল্যান্ড।

'এর মধ্যে মজা পাবার কিছু আছে কি?' জানতে চাইল সে।

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'হাতের কাছে স্ক্রুড্রাইভারটা থাকলে দাও?'

সেটা উঁচু করে ধরল মুরল্যান্ড। 'তুমি চাও আমিও তোমার অপারেশন করি?'

'বোটের তলায় ছোট একটা হাঙর আছে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'লোভ দেখিয়ে আমি ওটাকে সারফেসে তুলে আনব। আমি ধরার পর স্ক্রুড্রাইভারটা তুমি ওর

দু'চোখের মাঝখানে মাথায় গাঁথবে।'

মলি ব্যাপারটায় জড়াতে চাইছে না। 'আমি ঠিক বুঝছি না, তুমি কি বোটে একটা হাঙর তুলতে চাইছ?'

'দোয়া করো যেন পারি,' বলল রানা, টি-শার্ট ছিঁড়ে একটা ফালি নিল হাতে, রক্ত বন্ধ করার জন্যে ছোট্ট ক্ষতটা বেঁধে ফেলল।

হামাগুড়ি দিয়ে বোটের পিছন দিকে সরে গেল মলি, লুকিয়ে পড়ল কনসোলের পিছনে। নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে পারায় হাসছে। 'দেখো কামড়ে না দেয়।'

পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মুরল্যান্ড, নরমাংসের টোপটা ধীরে ধীরে পানিতে নামাল রানা। ম্যাকরাল দুটো ছুটে এল, লাইন ঝাঁকিয়ে ওগুলোকে নিরুৎসাহিত করল ও। দ্রুত ঠোকর দিয়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে খুদে মাছগুলোও ছুটে এল, কিন্তু রক্তের গন্ধে হাঙরটা এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি এলাকা ছেড়ে সরে গেল তারা। যতবার কাছে এসে পড়ে হাঙর ততবার লাইনটায় টান দেয় রানা।

একটু একটু করে বড়শি আর টোপ বোটের কাছাকাছি সরিয়ে আনছে ও, আর ওদিকে ছোরা উঁচিয়ে ধরার ভঙ্গিতে স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে অপেক্ষা করছে মুরল্যান্ড, তাকিয়ে আছে পানির তলায়। এক সময় বোটের পাশে চলে এল হাঙরটা–পিঠটা ছাই রঙা, ক্রমশ হালকা হয়ে পেটটা ধবধবে সাদা। ওটার ডরসাল ফিন সাগর থেকে এমন ভঙ্গিতে মাথাচাড়া দিচ্ছে, ঠিক যেন একটা সাবমেরিন থেকে পেরিস্কোপ বেরিয়ে আসছে। ফ্লোটেশন টিউবে গা ঘষছে হাঙর, ধনুকের মত বাঁকা পথ ধরে ছুটে এসে শক্ত মাথায় আঘাত করল স্ক্রুড্রাইভার। খুব কম মানুষই শাফটটা দিয়ে হাঙরের খুলি ভেদ করতে পারত, মুরল্যান্ড হাতল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল।

বোটের বাইরে ঝুঁকল রানা, হাঙরের ফুলকার নিচে পেটে হাত বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল, ঠিক যখন আবার ঘা মেরেছে মুরল্যান্ড। বোটে পিঠ দিয়ে পড়ল রানা, দেড় মিটার হ্যামারহেড হাঙরকে শিশুর মত দু'হাতের ভেতর আটকে রেখেছে। ডরসাল ফিনটা মুঠোয় ভরল ও, লেজটা দু'পায়ের মাঝখানে চেপে ধরল।

ভীতিকর চোয়াল খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, তবে কামড়াবার জন্যে বাতাস ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না। মুরল্যান্ডকে দেখে মনে হলো একটা কুমীরের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে, শরীরের সমস্ত ভার দিয়ে বোটের মেঝেতে চেপে ধরল হাঙরকে।

জখম খুব গুরুতর হলেও, হ্যামারহেডটা অবিশ্বাস্য শক্তিতে তড়পাচ্ছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, খানিক পরপরই হঠাৎ আক্রমণে ঢিল দিয়ে নেতিয়ে পড়ছে। প্রায় মিনিট দশেক পর হাল ছেড়ে দিল ওটা। ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা, ব্যথায় দপ দপ করছে সারা শরীর। 'তুমি কাটো, ববি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'আমি জোর পাব না।'

'এখনও যে তুমি জ্ঞান হারাওনি, সেটাই আশ্চর্য,' বলল মুরল্যান্ড। 'বিশ্রাম নাও।'

এতক্ষণে কনসোলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মলি। প্রফেশন্যাল মেরিন জুলজিস্ট সে, হাঙরটাকে কাটার সময় মুরল্যান্ডকে পরামর্শ দিতে পারল। লিভারটা নিখুঁতভাবে বের করল ওরা, সদ্য খাওয়া একটা ডোরাডো আর কয়েকটা হেরিং মাছ পাওয়া গেল পেট থেকে। চামড়ার ভেতর মাংস কিভাবে ফালি করতে হবে

মুরল্যান্ডকে দেখিয়ে দিল মলি। 'প্রথমেই লিভারটা খেয়ে ফেলা দরকার,' বলল সে। 'এখন থেকেই এটায় পচন ধরবে। মাছের এই অংশটাই সবচেয়ে পুষ্টিকর।'

'বাকিটুকু কি করব? এই গরমে সবই তো পচে যাবে।'

'না। এক সাগর লবণ আছে আমাদের। মাংস ফালি করে ফেলুন, তারপর বোটের চারধারে শুকোতে দিন খানিক পর চাঁদোয়ায় জমে থাকা লবণ নিয়ে মাখিয়ে দিলেই হবে।'

'লিভার আমি ছোটবেলা থেকে ঘৃণা করি,' বলল মুরল্যান্ড। 'তাছাড়া, এত খিদে পায়নি যে কাঁচা খেতে পারব।'

'নিজেকে বাধ্য করো,' বলল রানা। 'ফিজিকালি ফিট থাকাটা জরুরী। আমরা প্রমাণ করেছি পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব। পানিই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা।'

তিন

সাগরের নীল গভীরতায় সাঁতার কাটছে ল্যারি কিং, বিপুল জলরাশি পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে ছুটছে আলোর একটা ঝলকের মত, সে যেন রঙিন মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটন্ত একটা জেট প্লেনে রয়েছে। মনে হলো তলাবিহীন গহ্বরগুলোর কিনারা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে, বিশাল সব পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী উপত্যকা ধরে ছুটছে, আবার কখনও অন্ধকার গভীর পাতাল থেকে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে রোদ চকচকে সারফেসে। সাগরের অতলতল একাধারে ভীতিকর, আবার সৌন্দর্যের আধারও বটে।

দিনটা রোববার, ফাঁকা নুমা বিল্ডিঙের দশতলায় একা কাজ করছে সে। একটানা নয় ঘণ্টা কমপিউটর মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ক্লান্ত চোখ দুটোকে বিশ্রাম দিল কিং। জটিল একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছে সে, সেটাকে নিখুঁত করার বা ফিনিশিং টাচ দেয়ার কাজ এই মাত্র শেষ হলো। প্রোগ্রামটা তৈরি করতে ইমেজ-সিনথেসিস অ্যালগারিদম ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে, সাগরের তলায় সাউন্ড ওয়েভের থ্রী-ডাইমেনশনাল প্রপাগেশন পাবার জন্যে। কমপিউটর গ্রাফিক্সের তুলনাবিহীন টেকনোলজির সাহায্যে এমন একটা জগতে প্রবেশ করেছে সে, আগে যেখানে খুব কম লোকই ঢুকতে পেরেছে। কমপিউটর পরিচালিত এই নাটকে দেখানো হয়েছে পানির তলা দিয়ে হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ড কিভাবে ভ্রমণ করে, হিসাব কষে প্রোগ্রামটা তৈরি করতে কিং আর তার গোটা স্টাফের পুরো এক হপ্তা লেগে গেছে। কাজে লাগাতে হয়েছে স্পেশাল-পারপাস হার্ডওয়্যার, সাথে ছিল গোটা প্যাসিফিকের সাউন্ড স্পীডের বিভিন্ন মাত্রা পাবার জন্যে বিশাল একটা ডাটাবেস। অবশেষে তারা একটা ফটোরিয়্যালিস্টিক মডেল নিখুঁত করতে পেরেছে। ওই মডেল এখন সাউন্ড রে ট্রেস করে দেখিয়ে দেবে প্যাসিফিক জুড়ে কখন কোথায় কনভারজেন্স জোন সৃষ্টি হবে।

থ্রী-ডাইমেনশনাল সাউন্ড-স্পীড কনট্যুর ম্যাপে সাগরতলের দৃশ্যাবলী অত্যন্ত

ক্ষিপ্র সিকোয়েন্সে দেখানো হয়েছে, গতির ফলে দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, বাস্তবে ঠিক যেমনটি দেখাবার কথা। এই ম্যাপ তৈরি করতে ত্রিশ বছরের সংগৃহীত ওশেনোগ্রাফিক ডাটা কাজে লাগানো হয়েছে।

এক ঝাঁক আলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিং, শুরুতে ওগুলো হলুদ, ক্রমশ কমলা হয়ে শেষ দিকে গাঢ় লাল। ক্রম অনুসারে মিটমিট করছে ওগুলো, তাকে জানিয়ে দিচ্ছে সাউন্ড রে যেখানে কনভার্জ করবে বা মিলিত হবে তার কত কাছে চলে আসছে সে। আলাদা একটা ডিজিটাল রিডআউট থেকে আসছে ল্যাটিচিউড আর লংগিচিউড-এর হিসাব। তার খেলার সরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো ডায়নামিক কনভারজেন্স-জোন ডিসপ্লে। সে এমনকি দৃশ্যগুলোকে পানির সারফেসে তুলে আনতে পারে, জেনে নিতে পারে যে-সব জাহাজের কোর্স জানা আছে সেগুলো নির্দিষ্ট একটা সময়ে ওই এলাকা দিয়ে যাবে কিনা।

তার ডান দিকের দূরবর্তী লাল আলোটা ফ্ল্যাশ করছে, বোতাম টিপে ইমেজটা পানি থেকে তুলে আনল কিং, কনভারজান্স পয়েন্টের একটা সারফেস ভিউ বা পানির ওপরকার দৃশ্য উন্মোচিত করল। আশা করেছিল দিগন্ত পর্যন্ত শুধু পানি দেখতে পাবে, কিন্তু ভিউইং স্ক্রীনে তার ধারণার উল্টোটা দেখা যাচ্ছে। গাছপালা সহ বিশাল একটা ভূখণ্ড স্ক্রীন দখল করে রেখেছে। গোটা সিকোয়েন্স আবার নতুন করে দেখল সে, শুরু করল চারটে বিন্দু থেকে, যে বিন্দুগুলো রডনি বুমারের হীরক দ্বীপগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। পুরো সিনারিও দশ, বিশ, ত্রিশবার পুনরাবৃত্তি করল কিং, সাউন্ড রে ট্রেস করে চূড়ান্ত সম্মিলন ক্ষেত্রে পৌঁছে গেল।

অবশেষে নিশ্চিত হলো কিং, কোথাও কোন ভুল হয়নি। সীটে নেতিয়ে পড়ল সে, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। 'ওহ্ গড!' বিড় বিড় করছে আপনমনে। 'ওহ্ মাই গড!'

রোববার হলেও, বাড়িতে বসে সকাল থেকে কাজে ডুবে আছেন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। অনেক ভাবে বুঝিয়েও একদল কংগ্রেস সদস্যকে রডনি বুমারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে রাজি করানো যায়নি, আজ টেলিফোনে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে নিরেট কোন প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন অ্যাডমিরাল। এখন তাঁর একমাত্র ভরসা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত পেতে হলেও প্রভাবশালী দু'চারজন কংগ্রেস সদস্যের সমর্থন দরকার।

কি করা যায় ভাবছেন, এই সময় দারোয়ান এসে খবর দিল জর্জ রেডক্লিফ বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন তিনি, অপেক্ষা করছেন। নুমায় তাঁর পরেই রেডক্লিফের স্থান। ছুটির দিনে দেখা করতে আসার পিছনে নিশ্চয়ই জরুরী কোন কারণ আছে।

'খবর ভাল নয়,' স্টাডিরুমে ঢুকেই বললেন রেডক্লিফ।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, কথা না বলে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। বিগ ডলি থেকে রানা আর মুরল্যান্ড কিডন্যাপ হবার পর তিন দিন পেরুতে যাচ্ছে, ওদের কোন খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, জানেন তিনি।

'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি একটা স্যাটেলাইট ফোন ইন্টারসেপ্ট করেছে,' বললেন রেডক্লিফ। 'ফোনটা করা হয়েছে একটা ইয়ট থেকে নিমবাস দ্বীপে, রডনি বুমারের কাছে। মেসেজে বলা হয়েছে–রানা, মুরল্যা আর মলি বুমারকে এঞ্জিনবিহীন ছোট একটা বোটে তুলে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'সাগরের কোথায়?'

'যেখানে ভারত মহাসাগর তাসমান সীর সঙ্গে মিশেছে। সঠিক পজিশন বলা হয়নি। ফোনটা করেছে পাউলা নামে একটা মেয়ে। রডনিকে জানিয়েছে, নিমবাসে ফিরে যাচ্ছে সে।'

'রডনি বুমার তাঁর একমাত্র মেয়েকে এরকম বিপদের মুখে ফেলে দেবেন?' অ্যাডমিরাল বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'ফোনে পাউলা বলেছে, মলি বুমার নাকি স্বেচ্ছায় রানার সঙ্গে গেছে, জোর করেও তাকে ঠেকানো যায়নি।'

'কতক্ষণ আগের ঘটনা এটা?'

'ভাসিয়ে দেয়ার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় একটা টাইফুনের মুখে।'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'ওরা যদি বেঁচেও থাকে, খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন।'

'অসম্ভবই বলতে হয়, কারণ সার্চ করার জন্যে আমাদের বা অস্ট্রেলিয়ানদের কোন জাহাজ বা প্লেন পাওয়া যাচ্ছে না–অন্তত সেরকম রিপোর্টই পেয়েছি।'

'আপনি বিশ্বাস করেন?'

'না।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না হ্যামিলটন, তারপর চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন। 'কারও ওপর ভরসা করার দরকার নেই,' অবশেষে সিদ্ধান্ত দিলেন তিনি। 'পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে নুমার যে-ক'টা রিসার্চ শিপ আছে সবগুলোকে সতর্ক করে দিন, বলে দিন কোন দিকটায় সার্চ করতে হবে।'

'যদি কিছু মনে না করেন–অনেক দেরি হয়ে যায়নি কি, অ্যাডমিরাল?'

'দেরি হয়ে গেছে মানে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কি বলছেন আপনি? সাগরের তলা থেকে হলেও তো উদ্ধার করে আনতে হবে ওদেরকে। বিশেষ করে রানাকে যদি উদ্ধার করতে না পারি, বন্ধু জেনারেল রাহাত খানের কাছে আমি মুখ দেখাব কিভাবে?'

ওয়াশিংটনের বাইরে, নির্জন ছোট্ট এক রেস্তোরাঁয়, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ফোনে খুঁজে পেল ল্যারি কিং। এটা অ্যাডমিরালের প্রিয় রেস্তোরাঁগুলোর একটা, আজ এখানে তিনি জর্জ রেডক্লিফকে নিয়ে ডিনার খেতে এসেছেন। মোবাইল ফোনটা পকেটে ছিল, আওয়াজ শুনে বের করলেন অ্যাডমিরাল। 'জর্জ হ্যামিলটন।'

'ল্যারি কিং, অ্যাডমিরাল। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। ডাটা সেন্টারে একবার আসতে পারবেন? খুব জরুরী।'

'বুঝলাম জরুরী, তা না হলে অফিসের বাইরে যোগাযোগ করতে না। কিন্তু

ফোনে বলা যায় না?'

'যায় না, অ্যাডমিরাল, কারণ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে অবাঞ্ছিত কান আছে। আমি আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।'

'রেডক্লিফকে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।' ফোনটা পকেটে রেখে দিয়ে আহারে মনোনিবেশ করলেন অ্যাডমিরাল।

'খারাপ খবর?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'কিং সম্ভবত অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য পেয়েছে। ডাটা সেন্টারে ব্রিফ করতে চায়।'

'তাহলে ভাল খবর হওয়া উচিত।'

'গলার আওয়াজ শুনে তা মনে হলো না।'

চেয়ারে নেতিয়ে আছে কিং, পা দুটো সামনে মেলা, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে বড় আকারের ভিডিও কমপিউটর ডিসপ্লেতে ফুটে থাকা ইমেজের ওপর। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও রেডক্লিফ। চেয়ার না ছেড়েই ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাল সে।

সময় নষ্ট না করে অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ঘটনাটা কি?'

চেয়ারে সিধে হলো কিং, ইঙ্গিতে ভিডিও স্ক্রীনটা দেখাল। 'বুমারের মাইনিং অপারেশন থেকে যে অ্যাকুসটিক এনার্জি বেরুচ্ছে সেগুলো কোথায় মিলিত হবে তা হিসাব করার একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি আমি।'

'গুড ওঅর্ক, কিং,' একটা চেয়ার টেনে বসলেন রেডক্লিফ, স্ক্রীনের দিকে চোখ। 'জানতে পেরেছ পরবর্তী কনভারজান্স জোন কোথায় হবে?'

মাথা ঝাঁকাল কিং। 'পেরেছি, তবে প্রথমে আমাকে প্রসেসটা ব্যাখ্যা করতে দিন।' পুরো এক সিরিজ কমান্ড টাইপ করে চেয়ারে হেলান দিল সে। 'সাগরের ভেতর দিয়ে চলার সময় শব্দের গতি কমবেশি হয় পানির তাপমাত্রা আর বিভিন্ন গভীরতায় হাইড্রস্ট্যাটিক প্রেশার কমবেশি হওয়ার সঙ্গে মিল রেখে। আপনি যত গভীরে থাকবেন, ওপরের পানির কলাম তত বেশি ভারী হবে, শব্দও তত বেশি গতি পাবে। গতি কমবেশি হবার আরও একশো একটা কারণের কথা বলতে পারি আমি– অ্যাটমোসফরিক কন্ডিশন, সিজনাল ডিফারেন্সেস, কনভারজেন্স-জোন প্রপাগেশন অ্যাকসেস, ফরমেশন অভ সাউন্ড কস্টিকস ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে বেশি জটিলতার মধ্যে না গিয়ে কি জানতে পেরেছি তার সহজ একটা ব্যাখ্যা দিই।'

ভিউইং স্ক্রীনে প্যাসিফিক ওশেনের একটা চার্ট দেখা যাচ্ছে, সবুজ চারটে রেখা সহ, রেখাগুলো শুরু হয়েছে বুমারের মাইনগুলো থেকে, ভেদ করে গেছে দক্ষিণ প্যাসিফিকের রুরালি দ্বীপকে। 'অ্যাকুসটিক প্লেগ যেখানে আঘাত হেনেছে, সেই পয়েন্ট থেকে পিছু হটে উৎসে পৌঁছেছি আমি। সাউন্ড রে প্রথম যে-সব জাহাজ বা দ্বীপে আঘাত হানে সে-সম্পর্কে আমাদের হাতে প্রায় কোন তথ্যই নেই। রুরালি থেকে শুরু করি আমি। ওই দ্বীপের গঠন থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসি, ডীপ ওশেন সাউন্ড রে সী ফ্লোরের পাহাড়বহুল ভূ-প্রকৃতির দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। পদ্ধতিটা

জানার পর এ-ধরনের আরও ঘটনার পয়েন্ট থেকে সাউন্ড রে অনুসরণ করে উৎসে পৌঁছুতে পেরেছি।'

'আমরা বোধহয় বিশদে না গিয়ে সার-সংক্ষেপ জানতে পারলে খুশি হই, তাই না?' রেডক্লিফকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'হ্যাঁ, আমরা জানতে চাই পরবর্তী কনভারজেন্স জোনটা কোথায়।'

'আগামী তিন দিন যদি এখনকার পরিস্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকে, সর্বশেষ ডেথ স্পট হবে এখানে।' কী-বোর্ডের বোতামে আবার আঙুল ছোঁয়াল কিং, এবার রেখাগুলোর রঙ হলুদ, ইস্টার আইল্যান্ড থেকে পাঁচশো কিলোমিটার উত্তরে ওগুলো মিলিত হয়েছে।

'তখন ওদিকে কোন জাহাজ থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমি একটা ওয়ার্নিং প্রচার করার নির্দেশ দিচ্ছি, জাহাজগুলো যাতে এলাকাটা এড়িয়ে যায়।'

স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে রেডক্লিফ জিজ্ঞেস করলেন, 'ভুলের মাত্রা কতটুকু?'

'কমবেশি বারো কিলোমিটার।'

'কতটুকু জায়গা জুড়ে আঘাত হানবে?'

'চল্লিশ থেকে নব্বুই কিলোমিটার, নির্ভর করে বিরাট দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর সাউন্ড রে কতটা শক্তিশালী থাকে তার ওপর।'

'চল্লিশ বা নব্বুই কিলোমিটার পরিধির মধ্যে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী থাকবে,' চিন্তা করছেন অ্যাডমিরাল।

রেডক্লিফ জানতে চাইলেন, 'কিং, তুমি কতদিন আগে বলতে পারো ঠিক কবে সাউন্ড রে-র সম্মিলন ঘটবে?'

'ওশেন কন্ডিশন প্রেডিক্ট করা খুব কঠিন,' জবাব দিল কিং। 'আমার হিসাবের পদ্ধতিও খুব জটিল। এর আগে সাউন্ড রে মিলিত হবার যে-সব ঘটনা ঘটেছে তা থেকে পাওয়া সূত্র ধরে আগাম বলে দেয়া যায় কোথায় বা কখন পরবর্তী আঘাতটা আসছে। বুমারের চারটে দ্বীপ থেকে কখন কি মাত্রায় সাউন্ড রে রওনা হবে, আগের উদাহরণ থেকে পাওয়া ছক দেখে তা বলে দেয়া সম্ভব। ত্রিশ দিনের মধ্যে হলে মোটামুটি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারব, তারপর ব্যাপারটা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতই।'

'পরবর্তী কনভারজেন্স সাইট ছাড়া অন্য কোনটার হিসাব করেছ?'

'আজ থেকে সতেরো দিন পর,' উদ্ভিন্নযৌবনা এক ললনার ছবি সহ একটা ক্যালেন্ডার রয়েছে দেয়ালে, সেটার দিকে চোখ তুলে বলল কিং। 'বাইশে ফেব্রুয়ারি।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

অ্যাডমিরালের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল কিং। 'সবচেয়ে খারাপ খবরটা শেষে বলছি।' কী বোর্ডে নড়ে উঠল তার আঙুল। 'বাইশে ফেব্রুয়ারিতে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা অংশে কেয়ামত নেমে আসবে। আমি জানি না···মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ লাখ লোকও মারা যেতে পারে।'

স্ক্রীনে যা ফুটে উঠল তার জন্যে ওঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। অ্যাডমিরাল আর

রেডক্লিফ, দু'জনেই অসহায় বোধ করলেন, কারণ যে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে তা ঠেকাবার সাধ্য তাঁদের নেই। চারটে লাল রেখা চার্টের ওপর দিয়ে ছুটছে, সেগুলো নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে মিলিত হলো।

'কোন ভুল নেই?' অসুস্থ বোধ করছেন অ্যাডমিরাল।

'ত্রিশ বার ক্যালকুলেশন করেছি,' বলল কিং। 'প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি আমার ভুল হচ্ছে। কিন্তু না, কোথাও কোন ক্রুটি পাইনি। যতবার হিসাব করেছি, সেই একই রেজাল্ট।'

'গড, নো!' ফিসফিস করলেন অ্যাডমিরাল। চারটে লাল রেখা যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই পয়েন্ট থেকে নব্বুই মাইল পরিধির মধ্যে ফিজি আর টোঙ্গা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছেন তিনি। ওখানে আরও অনেকগুলো দ্বীপ আছে, লোক সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে সত্তর লাখ বা তারও অনেক বেশি। 'গড, নো!'

হোয়াইট হাউসের চীফ অব স্টাফ ক্লাইভ বোথামকে দৈত্য বললেই হয়, তিনি যেন ওখানে বসেও আছেন কেউ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে নানা অজুহাত দেখিয়ে নিরুৎসাহিত করার জন্যে। শুধু কংগ্রেসের কোন নেতা বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলে আলাদা কথা, তা না হলে কেবিনেট সদস্যদেরকেও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন তিনি, ভাব দেখে সন্দেহ হবে প্রেসিডেন্ট আর হোয়াইট হাউস যেন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

আর্মিতে ছিলেন ভদ্রলোক, পেন্টাগন সদস্যদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ আছে, সুট পরা রাজনীতিকদের চেয়ে জেনারেল আর অ্যাডমিরালদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। তাসত্ত্বেও ফোনে তাঁর সঙ্গে আধ ঘণ্টা তর্ক করতে হলো জর্জ হ্যামিলটনকে। তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে মুখোমুখি বসে প্রশান্ত মহাসাগরে কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হলো। তবু বরফ গলতে চায় না। বোথাম বললেন, 'আমি শুনেছি বুমার মাইনিং কোম্পানীতে সামরিক অভিযান চালাবার একটা উদ্ভট প্ল্যান করেছেন আপনি, কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা সমর্থন করতে রাজি হননি।'

'হ্যাঁ, ওদেরকে আমি বিপদটা বোঝাতে পারিনি।'

'ওদেরকে বোঝাতে না পারলে প্রেসিডেন্টকে বোঝাবেন কিভাবে?'

অ্যাডমিরাল জবাব দিলেন, 'আমেরিকানরা একজন অন্ধ ও বধিরকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

পরবর্তী তিন মিনিটের মধ্যে ওভাল অফিসে দেখা গেল অ্যাডমিরালকে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পুরানো ডেস্ক ঘুরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে আসছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, দিস ইজ আ প্লেজার।'

'সময় দেয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আমাকে যা বলেছেন, প্রেসিডেন্টকেও তাই বলুন,' পরামর্শ দিলেন বোথাম, অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে রিপোর্টটা প্রেসিডেন্টের হাতে ধরিয়ে দিলেন। প্রেসিডেন্ট ফাইলটা খুলে পড়ছেন, এই ফাঁকে হুমকির ধরনটা ব্যাখ্যা করছেন অ্যাডমিরাল।

পরিস্থিতি এমনিতেই ভয়াবহ, বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন হলো না। সব কথা

বলার পর অ্যাডমিরাল সুপারিশ করলেন, বুমার মাইনিং কোম্পানীর তৎপরতা বন্ধ করার জন্যে সামরিক অভিযানই একমাত্র সমাধান।

তাঁর সব কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর রিপোর্টটা পড়ার জন্যে আরও দু'তিন মিনিট চুপ করে থাকলেন। পড়া শেষ হতে বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন, অ্যাডমিরাল, বিদেশের মাটিতে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করার অনুমতি আমি দিতে পারি না।'

'শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস হবে না, সামরিক অভিযান চালানো হলে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটবে,' মন্তব্য করলেন বোথাম।

'আমরা শুধু যদি বুমারের মাত্র একটা মাইনের অপারেশন বন্ধ করতে পারি,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'এবং উৎস থেকে অ্যাকুসটিক এনার্জির রওনা হওয়াটা থামিয়ে দিতে পারি, তাতেই কনভারজেন্স এতটা দুর্বল হয়ে পড়বে যে টোঙ্গা আর ফিজি সহ বাকি দ্বীপগুলোর পঞ্চাশ থেকে সত্তর লাখ মানুষ তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

'আপনাকে বুঝতে হবে, অ্যাডমিরাল, অ্যাকুসটিক এনার্জি যদি সত্যি বড় ধরনের কোন হুমকি হয়েও থাকে, তা ঠেকাবার প্রস্তুতি সরকারের নেই। আমার কাছে এটা একেবারে নতুন। ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ডে আমার অ্যাডভাইজাররা আছেন, নুমার আবিষ্কার ইনভেস্টিগেট করার জন্যে তাঁদেরকে সময় দিতে হবে।'

অ্যাডমিরাল গম্ভীর মুখে বললেন, 'আর ষোলো দিন পর কনভারজেন্স ঘটবে।'

'আমি চারদিন পর আবার আপনার সঙ্গে কথা বলছি,' করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করলেন প্রেসিডেন্ট।

বিকেলে জগিং করতে বেরিয়েছেন রেডক্লিফ, পার্কে ঢুকতেই অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু'জন একসঙ্গে দৌড়াচ্ছেন। 'সাগরের স্রোতে ভেসে গেছে, এরকম কারও টিকে থাকার রেকর্ড আমাদের জানা আছে?' এমন সুরে প্রশ্নটা করলেন অ্যাডমিরাল, তাঁরা যেন নুমার অফিসে রয়েছেন।

'স্টিভ কালাহান, একজন ইয়টসম্যান, ক্যানারি আইল্যান্ডের কাছে বোটডুবির পর ছিয়াত্তর দিন টিকে ছিল,' জবাব দিলেন রেডক্লিফ। 'একা একটা মানুষ ইনফ্লেটেবল র‍্যাফ্‌ট্‌ বা ভেলা নিয়ে টিকে থাকার এটাই দীর্ঘতম রেকর্ড। তবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার পুন লিম নামে একজন চীনা স্টুয়ার্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ আটলান্টিকে টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ ডুবে গেলে সে একটা ভেলায় আশ্রয় নেয়। ব্রাজিলিয়ান জেলেরা একশো তেত্রিশ দিন পর উদ্ধার করে তাকে।'

'দু'জনের কেউ কি সাইক্লোন বা টাইফুনের কবলে পড়েছিল?'

মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'রানা আর মুরল্যান্ডকে যে-ধরনের জোরাল টাইফুনের মধ্যে পড়তে হয়েছে ওদেরকে সে-ধরনের কোন বিপদে পড়তে হয়নি।'

'বুমারের ইয়ট থেকে ওদেরকে নামিয়ে দেয়ার পর দু'হপ্তা পার হতে চলেছে,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ঝড়টা থেকে যদি বেঁচেও যায়, খাবার আর পানির অভাবে খুব ভুগতে হচ্ছে ওদেরকে।'

'সারভাইভ করার অনেক রেকর্ড আছে মাসুদ রানার,' বললেন রেডক্লিফ। 'তাঁর সঙ্গে মুরল্যান্ড থাকায় আমি আশাবাদী। ওরা যদি তাহিতির সৈকতে ভেসে আসে, আমি একটুও আশ্চর্য হব না।'

ট্র্যাক সুট পরা এক তরুণীকে পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে একপাশে সরে এলেন অ্যাডমিরাল। 'রানাকে প্রায়ই একটা কথা বলতে শুনি– সাগর সহজে তার রহস্য ফাঁস করে না।'

'সমস্যা সহজ হয়ে যেত নুমার সঙ্গে যদি অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের রেসকিউ-অ্যান্ড-সার্চ ফোর্স যোগ দিত।'

'রডনি বুমারের হাত খুব লম্বা,' বললেন অ্যাডমিরাল, চেহারায় অস্বস্তি। 'সবাই বলছে তারা নাকি বিভিন্ন রেসকিউ মিশনে ব্যস্ত, ফলে লোকবলের অভাব দেখা দিয়েছে। মিথ্যে অজুহাত!'

'ভদ্রলোক যে অসম্ভব শক্তিধর, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বললেন রেডক্লিফ। তাঁর ঘুষের টাকা কোথায় পৌঁছায় না সেটাই প্রশ্ন–এমনকি আমাদের কংগ্রেস সদস্যদের পকেটেও ঢুকছে। অদ্ভুতই লাগে যে বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাঁর হয়ে কাজ করেন।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন অ্যাডমিরাল। চেহারা লালচে হয়ে উঠছে– পরিশ্রমে নয়, রাগে। 'বুমারকে বাগে পাবার বিনিময়ে নুমা থেকে আমি পদত্যাগ করতেও রাজি আছি।'

'একা শুধু আপনি নন, নিশ্চয়ই আরও অসংখ্য মানুষ তাঁকে ঘৃণা করে। অথচ কেউ তারা তাঁর সঙ্গে বেঈমানী করেনি।'

'যারা তাঁর ঘুষ খেতে রাজি হয় না, দুর্ঘটনায় মারা যায়

'শুনেছি ঘুষ হিসেবে হীরে ভরা বাক্স সরাসরি সুইস ব্যাংকে পাঠিয়ে দেন বুমার।'

'হীরের লোভ সামলানো কঠিন। তবে আমাদের প্রেসিডেন্টকে হাত করা সম্ভব নয়।'

'না, তবে প্রেসিডেন্টকে বাজে পরামর্শ দিয়ে ভুল বোঝানো হতে পারে। চারদিনের জায়গায় ছ'দিন পার হতে চলেছে, অথচ এখনও তিনি কিছু জানাচ্ছেন না। আমার ভাল ঠেকছে না।'

ওঁরা দু'জন পার্ক থেকে বেরুতেই রাস্তার ধারে পার্ক করা একটা ভ্যান থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল এক লোক, গায়ে বড় বড় হরফে নুমা লেখা রয়েছে। 'স্যার, অ্যাডমিরাল, হোয়াইট হাউস থেকে আপনাকে ফোন করা হয়েছে।'

রেডক্লিফের দিকে ফিরে হাসলেন অ্যাডমিরাল 'প্রেসিডেন্টের কান নিশ্চয়ই খুব লম্বা।'

এগিয়ে এসে তাঁর হাতে একটা পোর্টেবল ফোন ধরিয়ে দিল ভ্যানের ড্রাইভার। 'ক্লাইভ বোথাম, স্যার–সেফ লাইনে'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। হ্যালো?'

'হ্যালো, অ্যাডমিরাল। আপনার জন্যে দুঃসংবাদ

'প্লীজ এক্সপ্লেইন।' আড়ষ্ট হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

'যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার পর প্রেসিডেন্ট আপনার অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোন অ্যাকশন নেয়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কেন?' হাঁপিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'অ্যাকশন না নিলে কি ঘটতে পারে সে-ব্যাপারে তিনি সচেতন নন?'

'ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ডের এক্সপার্টরা আপনার থিউরির সঙ্গে একমত নন। তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান প্যাথলজিস্টদের রিপোর্ট দেখে। প্যাথলজিস্টরা রিপোর্টে বলেছেন, কুরালি দ্বীপ, মর্নিং রোজ বা অন্যান্য জাহাজে যারা মারা গেছে তারা বিরল ব্যাকটেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিল।'

'এ অসম্ভব!' কড়কে উঠলেন অ্যাডমিরাল।

'আমাকে যা বলা হয়েছে আমি তাই বলছি,' স্বীকার করলেন বোথাম।

'কিন্তু আমার মুখ সেলাই করা যাবে না,' রাগে কাঁপছেন অ্যাডমিরাল। 'আমার কথায় কান না দেয়াটা প্রেসিডেন্টের জন্যে মারাত্মক ভুল হবে। ফর গড'স সেক, বোথাম, প্রেসিডেন্টকে আপনি বোঝান, এখনও সময় আছে...'

'সরি, অ্যাডমিরাল। প্রেসিডেন্টের হাত আসলে বাঁধা। তাঁর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজারদের একজনও মানতে পারছে না যে আপনার পরিবেশিত এভিডেন্স আন্তর্জাতিক ঘটনা তৈরির হুমকি হয়ে দেখা দেবে। সামনে নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট কোন ঝুঁকি নিতে পারেন না।'

'এ স্রেফ পাগলামি,' চিৎকার করছেন অ্যাডমিরাল। 'প্রেসিডেন্ট অ্যাকশন না নিলে লোকে তাঁকে পাবলিক বাথরুম পরিষ্কার করার জন্যেও ভোট দেবে না।'

'সেটা আপনার অভিমত,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন বোথাম। 'তবে আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে আন্তর্জাতিক ইনভেস্টিগেটরদের একটা টীমকে মাইনিং অপারেশন দেখার প্রস্তাব দিয়েছেন রডনি বুমার।'

'টীমটা গঠন করতে সময় লাগবে কি রকম?'

'এ-সব কাজে সময় লাগেই, এই ধরুন দুই কি তিন হপ্তা

'ততদিনে ফিজি আর টোঙ্গায় লাশের পাহাড় জমে যাবে

'আপনার এই ধারণা খুব কম লোকই বিশ্বাস করছে।'

যোগাযোগ কেটে দেয়ার পর রেডক্লিফকে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমরা হেরে গেছি।'

'পরিস্থিতিটা প্রেসিডেন্ট অগ্রাহ্য করতে চাইছেন?' রেডক্লিফ চিন্তিত।

'প্যাথলজিস্টদের কিনে নিয়েছেন রডনি ওরা বলছে, মৃত্যুর কারণ এক ধরনের বিরল জীবাণু

'আমাদের থেমে গেলে চলবে না,' বললেন রেডক্লিফ। 'রডনিকে যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে।'

অ্যাডমিরালের চোখ দুটো জ্বলছে। 'সন্দেহে ভোগার সময় নিজের চেয়ে বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য নিতে হয়,' বললেন তিনি। ফোনের বোতামে চাপ দিচ্ছেন। 'আমি এক ভদ্রলোককে চিনি, দেখা যাক তিনি কোন সমাধান দিতে পারেন কিনা'

চার

পানি ছাড়া চারদিন কাটছে। রোদে পোড়া বাতাসে জলকণা নেই, আর রোদ যেন আগুন, ওদের শরীরের ঘাম বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। দিগন্ত বিস্তৃত অথৈ ফাঁকা সাগর শারীরিক শক্তি কেড়ে নেয়, অকেজো করে দেয় চিন্তাশক্তি, কথাটা খেয়াল থাকায় ওদেরকে ঘুমাতে বা ঝিমাতে দিচ্ছে না রানা। বোটের গায়ে ঢেউয়ের লাফালাফি আর একঘেয়ে ছলছলাৎ-ছল আওয়াজ প্রায় পাগল করে তুলেছিল সবাইকে, তারপর এক সময় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সৃষ্টিশীল চিন্তাশক্তি বেঁচে থাকার চাবিকাঠি, জানে রানা, জাহাজডুবির পর অবসাদ আর হতাশা নাবিকদের খুন করে ফেলে। মুরল্যান্ড আর মলিকে শুধু রাতে ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছে ও, সারাটা দিন কোন না কোন কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখে।

মলিকে শুধু যে মাছ কোটার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা নয়; রানার নির্দেশে একটা লাইনে সিল্ক রুমাল বেঁধে পানিতে নামিয়ে দিয়েছে সে, বোটের পিছু নিয়ে আসছে সেটা। রুমালটা মিহি জালের কাজ করছে, প্ল্যাঙ্কটন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সী লাইফ ধরা পড়ছে সেই জালে। কয়েক ঘণ্টা পর সেগুলো তিনটে স্তূপে ভাগ করল সে, দেখে মনে হবে সামুদ্রিক উপকরণ দিয়ে বানানো তিন রকমের সালাদ।

মলির সংগ্রহ করা সী লাইফ থেকে বড়শিতে গাঁথার জন্যে টোপ পেয়ে যাচ্ছে মুরল্যান্ড। সে-ও প্রচুর মাছ ধরছে। রানার পরামর্শে কয়েক ঘণ্টা পরপর পানিতে নেমে শরীর ভিজিয়ে নিচ্ছে ওরা, শরীর যাতে পানির অভাবে বেঁকে না বসে। একজন পানিতে নামলে বাকি দু'জন লক্ষ রাখে হাঙর আসছে কিনা। বোটে ওঠার পর ভিজে কাপড়েই থাকে ওরা, চাঁদোয়ার নিচে ছায়ার ভেতর।

রানার কাজ বোট কোন দিক যাচ্ছে খেয়াল রাখা। পশ্চিমা বাতাস পুব দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে বোটটাকে। ওই একই দিকে প্রবাহিত হয়ে সাহায্য করছে স্রোতও। বৈঠা থেকে দু'টুকরো সরু কাঠ কেটে নিয়ে একটা ক্রস-স্টাফ তৈরি করেছে রানা, সূর্য বা নক্ষত্র দেখে আনুমানিক দিক নির্ণয়ের কাজে লাগছে ওগুলো।

প্রাচীন নাবিকরা ল্যাটিচিউড নির্ধারণের জন্যে ক্রস-শ্যাফট ব্যবহার করতেন। শ্যাফটের একটা প্রান্ত চোখের সামনে ধরা হয়, অপর ক্রসপীসটাকে আগুপিছু করানো হয়, যতক্ষণ না একটা প্রান্ত সূর্য কিংবা নক্ষত্র আর দিগন্তের ঠিক মাঝখানে আসে। এরপর স্টাফের গায়ে কাটা দাগ দেখে অক্ষাংশের কোণ পড়া হয়। কোণগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে ল্যাটিচিউড নির্ধারণের কাজটা চালিয়ে নিতে পারে নাবিকরা, রেফারেন্সের জন্যে পাবলিশড টেবিলস ছাড়াই। লংগিচিউট জানার জন্যে—যেহেতু অনেক পুবে সরে এসেছে ওরা—অন্য পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হলো রানাকে

রাতের আকাশে জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের হাট বসে যায়, সেগুলো দেখে নাইলন বোট কভারের এক প্রান্তে মলির কাছ থেকে পাওয়া শ্লেট একটা পেন্সিল দিয়ে হিসাব কষে রানা। পেন্সিলটা মলি একটা বয়ান্সি টিউবের তলা থেকে পেয়েছে।

বোটের সামনে পাঁচ মিটার লম্বা লাইন ফেলে নিজেদের গতি জেনে নিয়েছে রানা, লাইনের শেষ প্রান্তে বাঁধা ছিল ওর এক পাটি রাবার সোল লাগানো জুতো। জুতোটাকে পাশ কাটাতে বোট কতক্ষণ সময় নিল সেকেন্ড গুনে জেনে নিয়েছে। পশ্চিমা বাতাস, ঘণ্টায় ওদেরকে তিন কিলোমিটার ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। বোট কাভারটাকে পাল হিসেবে ব্যবহার করার পর আরও দু'মাইল বেড়েছে গতি।

পাঁচ দিনের দিন সকালে মেঘ দেখা গেল আকাশে। বৃষ্টি শুরু হতে দুপুর পার হয়ে গেল। পাত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন যা কিছু পাওয়া গেল সব ভরে ফেলল ওরা। সব মিলিয়ে দশ-বারো লিটার পানি। কেউ বলতে পারে না আবার কবে বৃষ্টি হবে, আর তখন ওরা কোথায় থাকবে।

ফাঁকা দিগন্ত, ক্লান্ত চোখে তীর ধরা পড়ে না, এভাবে আরও চারদিন কেটে গেল। রাত তখন গভীর, প্রকৃতির ডাকে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একা শুধু রানা জেগে। অকস্মাৎ অন্ধকারে সাপের মত ফণা তুলতে দেখল একটা ঢেউকে, ছুটে আসছে ওদের দিকে। চিৎকার জুড়ে দিল রানা, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চোখ। ঢেউটা ওর দৃষ্টিপথ পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। 'কি হলো? কি হলো?' জানতে চাইছে মলি আর মুরল্যান্ড, সদ্য ঘুম ভাঙায় হতচকিত দেখাচ্ছে ওদেরকে। রানার ঘাড়ের চুল সড় সড় করছে, ঠাণ্ডা ঘাম ফুটল কপালে–প্রথম ঢেউটার পিছনে একই আকৃতির আরও তিনটে ঢেউ দেখতে পাচ্ছে ও।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে মুরল্যান্ডও ওগুলোকে দেখতে পেল, খপ করে কনসোলটা ধরে ফেলল সে। এক ঝটকায় মলিকে টেনে নিল রানা, তারপর বোটের মেঝেতে শুইয়ে দিল। ঢেউটা বাঁকা হয়ে ভেঙে পড়ল বোটের ওপর, পানির ছিটা আর ফেনায় ডুবে গেল ওরা। প্রথম ধাক্কায় বোটের স্টারবোর্ড সাইড ডেবে গেল, উঁচু হয়ে উঠল উল্টোদিকটা, সেই সঙ্গে পাক খেতে শুরু করল গোটা কাঠামো।

দ্বিতীয় ঢেউ মাথাচাড়া দিচ্ছে, ওদের ওপর ভেঙে পড়ার আগে নক্ষত্র ছুঁতে চেষ্টা করল। কালো পানিতে ডুবে গেল বোট। আবার যখন ভাসল, রানা জানে না মুরল্যান্ড ওদের সঙ্গে আছে কিনা। তৃতীয় ঢেউটা প্রায় কোন সময়ই দিল না, খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়ল। কেন; কোত্থেকে আসছে এই ঢেউ, কিছুই বুঝতে পারছে ন রানা। চিন্তা করার সময়ও নেই, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে একটা বয়াসি টিউব আঁকড়ে ধরে আছে। তৃতীয় ঢেউটাও ডুবিয়ে দিল ওদেরকে, তবে আবার ভেসে উঠল বোট পরম আশ্চর্য, এরপর সাগর একদম শান্ত, যেন কিছুই ঘটেনি।

'মেজাজের একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, কনসোলটাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরে আছে। 'কি এমন করেছি আমরা যে সাগর এরকম খেপে উঠল?'

মলিকে ছেড়ে দিল রানা, উঠে বসতে সাহায্য করল। 'ঠিক আছ তো?'

কয়েক সেকেন্ড কাশল মলি। 'মরবঁ না,' বলল সে। 'কি ঘটল বলো তো?'

'আমার সন্দেহ পানির তলায় সাইজমিক ডিসটার্ব্যান্স। বড় ধরনের ভূমিকম্প ছাড়াও বেয়াড়া ঢেউ উঠতে পারে।'

চোখ থেকে ভেজা চুল সরাল মলি। 'ভাগ্যই বলতে হবে যে বোটটা উল্টে যায়নি বা আমরা কেউ পানিতে পড়ে যাইনি।'

'পালের কি অবস্থা?'

'ঝুলে আছে এখনও। বৈঠা···মানে মাস্তুলটাও পড়ে যায়নি।'

মুরল্যান্ড বলল, 'খাবার আর পানিও নষ্ট হয়নি।'

'যাক,' বলল মলি। 'আমাদের তাহলে কোন ক্ষতিই হয়নি।'

'হয়েছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'ক্ষতি হয়েছে?' মুরল্যান্ড জিজ্ঞেস করল। 'কই, আমি তো কিছু দেখছি না।'

'তুমি নিচে তাকাওনি।'

রানার চেহারা গম্ভীর, চাঁদের আলোয় থমথম করছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

বোটের ফাইবারগ্লাস বটম হাল পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে ফেটে গেছে। এরইমধ্যে পানি ঢুকছে ফাটলটা দিয়ে।

রোগা-পাতলা, খটখটে, ঋজু; চলতি বছর বাহাত্তরে পড়েছেন, মুখভর্তি পাকা দাড়ি বুক ঢেকে ক্রমশ সরু হয়ে নেমে এসেছে, পরে আছেন সালোয়ারের ওপর ঢিলে-ঢালা জোব্বা। আরিজোনায় এই বেশভূষা বিচিত্র হলেও, বাংলাদেশের পথে-ঘাটে দেখা গেলে ভদ্রলোককে অনায়াসে ফকির দরবেশ বলে চালিয়ে দেয়া যায়। বাঙালীই, তবে আমেরিকার স্থায়ী নাগরিক, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, ইমরুল কায়েস একজন শব্দ বিশারদ–আইনস্টাইনের কাছে সময় আর আলো যা ছিল, তাঁর কাছে শব্দও ঠিক তাই। একরোখা, খানিকটা খেয়ালী, প্রতিভাবান, অ্যাকুসটিক্যাল ওশেনোগ্রাফি সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে তিনশোর বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন ভদ্রলোক। তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের গবেষণার আওতায় আন্ডারওয়াটার রাডার ও সোনার টেকনিক থেকে শুরু করে অ্যাকুসটিক প্রপাগেশন পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি। একমাত্র বাঙালী, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাডভাইজার হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। চাকরিটা তাঁর হয়নি, কারণ বিশ্বের তাপমাত্রা মাপার জন্যে সরকার ওশেন নয়েজ টেস্ট শুরু করায় খেপে যান তিনি, বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর প্রতিবাদ ছাপা হতে থাকে। নেভির আন্ডারওয়াটার নিউক্লিয়ার টেস্ট-এর বিরুদ্ধেও কঠোর সমালোচনা শুরু করেন, ফলে পেন্টাগন তাঁকে সহ্যই করতে পারে না বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা তাঁর দোরগোড়ায় ভিড় জমান, আশা তিনি তাদের ফ্যাকালটিতে যোগ দেবেন। কিন্তু সবাইকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফ্রী-ল্যান্সার বিজ্ঞানী হিসেবে জাতিসংঘের বাছাই করা দু'একটা প্রজেক্ট করেন, চুক্তিভিত্তিক। আর গবেষণা করেন নিজের টাকায়, স্টাফ হিসেবে নিয়েছেন ছাত্রকে।

ড. কায়েসকে ওয়াশিংটনে আসতে বলা আর ঈশ্বরকে মেরুপ্রদেশের বরফ গলাতে বলা একই কথা, দু'জনের কেউই সাড়া দেবেন না। ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্ক, এই দুই জায়গা সম্পর্কে অ্যালার্জি আছে তাঁর; এমনকি টেস্টিমোনিয়াল ডিনারের প্রস্তাব বা পুরস্কার গ্রহণের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন তিনি, আরিজোনার আস্তানা ছেড়ে নড়বেন না। ওখানকার ক্যামেলব্যাক মাউন্টেনে একটা বাড়ি আছে তাঁর। প্লেন থেকে নেমে ট্যাক্সি নিতে হলো অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে, বেলা সাড়ে

তিনটের সময় বাড়িটার কলিং বেল বাজালেন।

আগেই পরিচয় ছিল, অ্যাডমিরালকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন ড. ইমরুল কায়েস। তাঁর বেশভূষা দেখে হাসি পেলেও সযত্নে সেটা গোপন রাখলেন অ্যাডমিরাল। এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর সাহায্য খুবই দরকার তাঁর, এমন কিছু করা চলবে না যাতে ভদ্রলোক বিরক্ত বোধ করেন।

সিটিং রূমে বসিয়ে ড. কায়েস জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেব? আমার পুত্রবধূ বাংলাদেশ থেকে রসমালাই পাঠিয়েছেন, একটু চাখবেন নাকি? তা না হলে লেবু-চা খান?'

'না, ধন্যবাদ, এই সময় আমি কিছু মুখে দিই না।'

মাথা ঝাঁকালেন ড. কায়েস, রিস্টওয়াচে চোখ বুলালেন, তারপর জানতে চাইলেন, 'আপনার আমি কি সাহায্যে আসতে পারি, অ্যাডমিরাল? ফোনে তো আপনি তেমন কিছুই জানাননি।'

সরাসরি কাজের প্রসঙ্গ তোলায় খুশি হলেন হ্যামিলটন। 'আপনি কি শুনেছেন, নুমা একটা অ্যাকুসটিক প্লেগ প্রতিরোধ করতে চাইছে?'

'কিছু কিছু গুজব কানে এসেছে। অস্ট্রেলিয়ানরা এটাকে প্লেগ বলতে রাজি নয়।'

'ওরা টাকা খেয়েছে। আমাদের সেরা একজন প্যাথলজিস্ট কর্নেল মিলার প্রমাণ করেছেন মৃত্যুগুলোর কারণ ইনটেন্স সাউন্ড ওয়েভ। এরইমধ্যে চারশো মানুষ মারা গেছে, স্যার!'

'কম কথায় বলুন দেখি ঠিক কি ঘটছে।'

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন অ্যাডমিরাল।

সব শোনার পর ড. কায়েস জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন?'

'আইভরি টাওয়ার সায়েন্টিস্টরা কে কি ভাবল তা জানতে আমার বয়েই গেছে। আমার চিন্তা রডনি বুমারকে নিয়ে, তাঁকে থামাতে না পারলে আরও অসংখ্য মানুষ মারা যাবে। এ-দেশে আপনিই বেস্ট অ্যাকুসটিক ম্যান, কাজেই আমি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ চাই।'

'আপনি ফোন করার পর ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়েছি, অ্যাডমিরাল,' বললেন ড. কায়েস। 'একটা পদ্ধতির কথাও ভেবেছি, তবে সফল হবার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি, বা তারও কম। সিরিয়াস রিসার্চ করার সময় পাচ্ছি না, কাজেই এরচেয়ে ভাল পদ্ধতি এ-মুহূর্তে আপনাকে আমি দিতে পারব না।'

অ্যাডমিরালের চোখে অবিশ্বাস। 'রডনি বুমারের মাইনিং অপারেশন বন্ধ করার একটা প্ল্যান সত্যি আপনার কাছে আছে?'

মাথা নাড়লেন ড. কায়েস। 'কোন ধরনের শক্তি প্রয়োগে নেই আমি। যে পদ্ধতিটার কথা বলছি, অ্যাকুসটিক কনভারজেন্স নিউট্রালাইজ করতে পারে ওটা।'

'কিভাবে তা সম্ভব?'

'সহজ ভাষায়, সাউন্ড-ওয়েভ এনার্জি প্রতিধ্বনিত করা যায়।'

'হ্যাঁ, বলাই বাহুল্য,' মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'আপনি যেহেতু জানেন যে চারটে আলাদা সাউন্ড রে ফিজি আর টোঙ্গার দিকে ছুটে আসবে, কনভারজান্সের আনুমানিক সময়ও যখন হিসাব করতে পেরেছেন, ধরে নিচ্ছি আপনার বিজ্ঞানীরা কনভারজেন্স পজিশনও নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।'

'হ্যাঁ, তা-ও আমরা জানি।'

'ওটাই তো সমাধান।'

'সমাধান?' অ্যাডমিরালের মনে যা-ও বা একটু আশা জেগেছিল, সব উবে গেল। 'কোথায়?'

'আমার পরামর্শ হলো, স্যাটেলাইট ডিশের মত নুমা একটা রিফ্লেক্টর তৈরি করুক, সাগরে নামিয়ে দিক ওটা, ঠিক কানভারজেন্স পয়েন্টে ধরে রাখুক। তাতেই কাজ হবে, অ্যাকুসটিক ওয়েভের বীম টোঙ্গা আর ফিজি থেকে দূরে সরে যাবে।'

চেহারায় ভাবাবেগের কোন ছাপ থাকল না, তবে উত্তেজনায় ধক ধক করছে অ্যাডমিরালের বুক। বিকট সমস্যার সমাধান এতটাই জটিলতাবিহীন যে হাস্যকর মনে হচ্ছে। সত্যি বটে যে রিডিরেকশন প্রজেক্ট বাস্তবায়িত করা সহজ কাজ হবে না, তবে কাজটা সম্ভব। 'নুমা যদি একটা রিফ্লেক্টর ডিশ কাজে লাগাতে পারে,' ড. কায়েসকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'অ্যাকুসটিক ওয়েভ কোথায় ফিরে যাবে?'

ড. কায়েসের মুখে চকচকে হাসি ফুটল। 'জানা কথা, সাগরের নির্জন কোন এলাকায় পাঠানোই উচিত, এই ধরুন দক্ষিণ অর্থাৎ অ্যান্টার্কটিকার দিকে। তবে, কনভারজেন্স এনার্জি যেহেতু যত দূরত্ব পেরোয় ততই দুর্বল হয়ে পড়ে, আপনি ওটাকে উৎসে ফেরত পাঠান না কেন?'

'রডনি বুমারের নিমবাস দ্বীপে,' বিড়বিড় করলেন অ্যাডমিরাল।

মাথা ঝাঁকালেন ড. কায়েস। 'অসুবিধে কি। ফেরার পথে সাউন্ড ওয়েভের এত শক্তি থাকবে না যে মানুষ মারবে। তবে ওদের মনে আল্লাহকে ভয় পাওয়ার কারণ ঘটাবে, আর মাথার ব্যথাটা হবে খুব হারামীজাতের।'

আর পারা গেল না, তিক্ত মনে ভাবল রানা।

অমানুষিক পরিশ্রম আর ভোগান্তির পরও কেউ ওরা আশা ছাড়েনি, হতাশামুক্ত রাখার জন্যে পরস্পরকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে যুদ্ধ করেছে ঝড়ের সঙ্গে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হলেও কোন অভিযোগ করেনি, আর এই হলো তার উপসংহার–বোট যে-কোন মুহূর্তে টুকরো হয়ে যাবে, ওরা পরিণত হবে মাছের খোরাকে। মলি ভাবছে, সে তার ছেলে দুটোকে কোনদিন আর দেখতে পাবে না। যে প্রেমিকার কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তার কথা কল্পনা করছে মুরল্যান্ড। আর রানার মনে পড়ল দেশের কথা–দুঃস্থ আর মুমূর্ষু মাতৃভূমির সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে সে।

সাগর অনেকটা শান্ত হলেও, এক মিটার উঁচু প্রতিটি ঢেউ যখনই বোটে আঘাত করছে, ফাটলটা সামান্য হলেও বড় হচ্ছে আকারে। বয়্যান্সি টিউব ওদেরকে ভাসিয়ে রাখছে ঠিকই, কিন্তু খোলটা টুকরো হয়ে গেলে পানিতে পড়ে যাবে ওরা, হাঙর এসে বাকি কাজটা শেষ করবে।

সাইজমিক ডিসটার্ব্যান্স বোটে আঘাত করার আগেই হাতে তৈরি একটা হাল পানিতে নামিয়ে দিয়েছিল রানা, সেটার হাতলে বুক চেপে ধরে পানি সেচার আওয়াজ শুনছে এখন, সকালের প্রথম রোদে দিগন্তের ওপর টকটকে লাল চোখ বুলাচ্ছে। মলি আর মুরল্যান্ড মেশিনে পরিণত হয়েছে, ফাটল দিয়ে পানি ঢোকার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে ওদেরকে। হালটা রানা তৈরি করেছিল ফাইবারগ্লাস শীট খুলে, শীটটা একটা স্টোরেজ কমপার্টমেন্টের ঢাকনি হিসেবেও কাজ করছিল। ঢাকনিটা চৌকো, আকারে একটা কাবার্ড-এর দরজার সমান হবে। বাকি শীটগুলোর কব্জা খুলে আটকানো হয়েছে ঢাকনির একটা প্রান্তে, প্রান্তটা জোড়া লাগানো হয়েছে ট্র্যানসামে, যেটায় আউটবোর্ড মোটর ফিট করা ছিল, ফলে ওটাকে আগু-পিছু করানো যাচ্ছে। সবশেষে ঢাকনির ওপরের প্রান্তে দুই প্রস্থ রশি আটকেছে রানা, অপারেট করার জন্যে।

চারদিকে কোথাও কোন জাহাজ, প্লেন বা দ্বীপের চিহ্নমাত্র নেই। বিশ কিলোমিটার দূরে দু'এক টুকরো মেঘই শুধু ওদেরকে সঙ্গ দিচ্ছে।

বোটে প্রচুর মাছ আছে। পানিও আপাতত কোন সমস্যা নয়। বোটটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে বিরতিহীন পানি সেচতে হচ্ছে, ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা, আসল সমস্যা এটাই। চাহিদা মত ঘুম হচ্ছে না। ভাল কোন পাত্র না থাকায় হাত দিয়ে সেচতে হচ্ছে পানি। প্রথমে চার ঘণ্টার শিফটে কাজ করেছে ওরা, কারণ মলিও শ্রম দেয়ার জন্যে জেদ ধরে। শুরুতে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পানি সেচেছে সে, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক পরই তার শরীর বেঁকে বসে। এরপর রানা শুরু করে। ওকে ছয় ঘণ্টা পানি সেচতে হয়েছে। তারপর দায়িত্ব নিয়েছে মুরল্যান্ড, সে একটানা আটঘণ্টা কাজ করছে। কিন্তু ফাটলটার সঙ্গে ওরা পারছে না, হেরে যাচ্ছে। পানি এখন চোয়াচ্ছে না, কলকল আওয়াজ তুলে ভেতরে ঢুকছে।

ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করল মলি, 'আমার পালা শুরু হচ্ছে?'

'আরও পাঁচ ঘণ্টা পর,' জবাব দিল রানা। 'ঘুমাও।'

রানা ভাবছে, আল্লাহই জানে কিভাবে মুরল্যান্ড কাজটা করে যাচ্ছে। ইস্পাতের মত ইচ্ছাশক্তি ছাড়া এত পরিশ্রম কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে রানা জানে, মুরল্যান্ডের শারীরিক শক্তিরও কোন তুলনা হয় না। এখন সে হাত দিয়ে পানি সেচছে না, স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে একটা ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেট পেয়ে সেটাকে দুমড়ে পাত্রের মত করে নিয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেয়ে রানার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। বোট কাভারটাকে চাঁদোয়া বানানো হয়েছিল, পালের কাজও চলছিল ওটা দিয়ে, সেটাকে নামিয়ে পানিতে সমান করে বিছাল ও, খোলের তলায় আটকে রশি দিয়ে বয়ান্সি টিউবের সঙ্গে বাঁধল। ফাটলে সেঁটে গেল নাইলন শীট, বোটে পানি ঢোকার পরিমাণ অর্ধেক কমে গেল। খুব বড় কোন সাফল্য হয়তো নয়, তবে অন্তত কয়েক ঘণ্টা আয়ু তো বাড়ল।

হাতঘড়ি দেখল রানা, সাড়ে চার ঘণ্টা পর রাত নামবে। মুরল্যান্ডের কব্জি ধরল ও, বলল, 'আমার পালা।' নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। তার হাত থেকে ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটটা নিল রানা। একটু সরে এসে বয়ান্সি টিউবের ওপর কাত

হলো মুরল্যান্ড, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল, কিংবা হয়তো জ্ঞান হারাল।

ঘণ্টা দুয়েক পর চোখ মেলল মলি, উঠে বসে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ তাকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। 'রানা, তুমি কি!'

'কেন, আমি আবার কি করলাম?'

'বোটের নাক আরেকটু স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নেয়া উচিত নয়?'

'স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নেব? কেন?'

মলি যেন নেশা বা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। 'কেন মানে? ওদিকে একটা দ্বীপ রয়েছে, আমরা ওখানে নামব না?'

কিন্তু স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না রানা। বুঝতে পারল, মলি প্রলাপ বকছে, দৃষ্টি ভ্রমের শিকার। 'না, মলি, ওদিকে কিছুই নেই। তুমি বরং আরও একটু ঘুমাও।'

'ওটা কি?' মাথার ওপর আঙুল তুলল মলি।

এবার রানা দেখতে পেল। একটা কিয়া পাখি, তোতার মতই দেখতে, লেজটা খয়েরি সবুজ। বাতাসে ডানা মেলে দিয়ে স্থির হয়ে আছে বোটের ওপর। এক ডানা থেকে আরেক ডানা প্রায় এক মিটার লম্বা। 'হ্যাঁ, একটা পাখি।'

'ভাল করে তাকাও, দ্বীপটাও তাহলে দেখতে পাবে।'

'কিংবা রানা হয়তো চাইছে না এই রোমান্টিক অভিযানের সমাপ্তি ঘটুক,' এক চোখ খুলে টিপ্পনী কাটল মুরল্যান্ড।

সেদিকে কান না দিয়ে কন্ট্রোল কনসোলের কাছে সরে এল রানা, দু'হাতে স্ট্যান্ডটা ধরে দাঁড়াল। স্টারবোর্ড সাইডে মেঘ জমেছে, দিগন্ত স্পষ্ট নয়। চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকল ও। প্রায় ষোলো দিন রোদের মধ্যে তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক। তবে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর দিগন্তের যে অংশটাকে মেঘ বলে মনে হচ্ছিল এখন সেটাকে পানির ওপর মাথা তুলে থাকা মাটি বলে চিনতে পারল। মেঘ সচল, কিন্তু দিগন্তের ছোট্ট ওই অংশটুকু স্থির হয়ে আছে।

'আমি বলছি, ওই পাখি আমাদেরকে পথ দেখাবে,' রানার কানে কানে ফিসফিস করল মলি।

রানার চেহারায় কোন উত্তেজনা নেই। 'ওখানে পৌঁছুতে হলে পালটা আবার তুলতে হবে। পানি সেচতে হবে পাগলের মত।'

দ্বীপের সঙ্গে বোটের দূরত্বটা আন্দাজ করল মুরল্যান্ড। 'অর্ধেক দূরত্ব পেরুবার আগেই বোট না দু'টুকরো হয়ে যায়।'

তবে কোন বিপদ ঘটল না, নিরাপদেই পাথরের একটা শেলফে বোটটা তুলে আনল ওরা। মাটিতে পা ফেলার আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করলেও, ক্লান্তিতে বোটের পাশে শুয়ে পড়ল সবাই, কথা বলার শক্তি অবশিষ্ট নেই। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর বসল রানা, দাঁড়াবার আগে হাঁটুর ওপর সিধে হলো। প্রথম দিকে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে রাখতে হলো। দু'হপ্তারও বেশি সাগরের সঙ্গে দুলতে হয়েছে ওদেরকে, তার তো একটা প্রতিক্রিয়া আছে। ওদের জগৎ যেন পাক খাচ্ছে। দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল মলি, খপ করে তাকে ধরে ফেলল রানা। মুরল্যান্ড

দাঁড়াল, পড়ল না, কারণ একটা গাছ ধরে আছে সে। তারপর ধীরে ধীরে রানাও দাঁড়াল। পা আর গোড়ালি অসম্ভব আড়ষ্ট হয়ে আছে, বিশ মিটারের মত হাঁটার পর জয়েন্টগুলো আলগা হতে শুরু করল।

বোটটাকে আরও খানিকটা ওপরে তুলে আনল ওরা, তারপর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে খেতে বসল। সেই ফালি করা শুকনো মাছ আর সংরক্ষিত পানি। শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে, এবার দ্বীপটা সার্ভে করতে হয়। দেখার মত তেমন কিছু নেই। এই দ্বীপ আর চ্যানেলের ওপারে ওটার সঙ্গী, দুটোই লাভার নিরেট স্তর ছাড়া কিছু নয়, সাগরের নিচে সহস্র বছর ধরে আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হওয়ায় একটু একটু করে সৃষ্টি হয়েছে।

এক তীর থেকে আরেক তীর পর্যন্ত হেঁটে এল মুরল্যান্ড, ঘোষণা করল ওদের আশ্রয় মাত্র একশো ত্রিশ মিটার চওড়া। সবচেয়ে উঁচু জায়গা একটা সমতল মালভূমি, দশ মিটারের বেশি নয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, এক ফোঁটা অশ্রুর আকৃতি। লম্বায় এক মাইল, এক প্রান্ত গোলাকার, আরেক প্রান্ত ছুঁচালো। দ্বীপটাকে ঘিরে আছে প্রাকৃতিক প্রাচীর, ফলে ঢেউ বা জলোচ্ছ্বাস সুবিধে করতে পারে না। চেহারা দেখে অবিরত হামলার মুখে একটা দুর্গ বলে মনে করা যেতে পারে।

কিছু দূর যাবার পর ভাঙা একটা বোট দেখতে পেল ওরা, সরু ও শুকনো একটা ইনলেটে পড়ে আছে। পাথর ভেঙে ভেতরে সাগর ঢুকে পড়ায় ইনলেটটা তৈরি হয়েছে। মাঝারি আকৃতির সেইলবোট, পোর্টসাইডে উল্টে আছে, খোল আর কীল অর্ধেকটাই ভাঙা, বোঝাই যায় পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে। মাস্তুল না থাকলেও, ডেকহাউস অক্ষত বলে মনে হলো। ভেতরে উঁকি দেয়ার আগে বোটটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে ওরা।

'গঠনশৈলীতে দক্ষতা আছে,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড। 'প্রায় বারো মিটার, কি বলো? টিক হাল।'

রানা বলল, 'এখানে সম্ভবত বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে পড়ে আছে।'

'এই বোট নিয়ে যে বা যারাই এখানে এসে থাকুক,' বলল মলি, 'আশা করি প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'দ্বীপ দুটোকে দেখার পর থেকে একটা কথা ভাবছি, কিন্তু বলতে পারছি না।'

'বলে ফেলো।'

মলিই জানে কেন সে লজ্জা পাচ্ছে। 'না, থাক।'

'কেন, থাকবে কেন?'

'তোমরা আবার কি না কি ভাব।' ইতস্তত করছে মলি। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আগে বলো, দ্বীপ দুটোর সঙ্গে কি একজোড়া স্তনের কোন মিল আছে?'

হেসে ফেলল মুরল্যান্ড। 'আমি কি ভুল শুনলাম? আপনি স্তন শব্দটা উচ্চারণ করলেন?'

'দেখলে তো,' মলির চোখে রাগ, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'আমি জানতাম হাসি-ঠাট্টা করা হবে।'

'এই মুরল্যান্ড, কানে তুলো দাও,' নির্দেশ দিল রানা, তারপর মলির দিকে

ফিরল। 'খানিকটা মিল হয়তো আছে। কেন?'

'অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন এক রূপকথায় একজোড়া দ্বীপের কথা বলা হয়েছে,' বলল মলি। 'মেয়েদের বুকের সঙ্গে মিল। ওগুলোর নামও আমি জানি।'

'কি নাম?'

'ধ্যেত। আগে জিজ্ঞেস করতে হয় দ্বীপ দুটো কোথায়। গল্পে বলা হয়েছে, ওগুলো মাঝে মধ্যেই হারিয়ে যায়...'

'কোথায়?' রানা অন্যমনস্ক, বোটটা দেখছে।

'তাসমান সাগরের দক্ষিণে,' বলল মলি। 'নাম–,'

কেউ তেমন মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে চুপ করে গেল সে।

কাত হয়ে থাকা বোটটাকে সিধে করল মুরল্যান্ড, খোলের ভেতর ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে হ্যাচ হয়ে ডেকহাউসে চলে এল রানা। 'ঝেঁটিয়ে সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে,' ভেতর থেকে বলল ও। 'ভেতরে কিছুই নেই। ট্র্যানসাম চেক করো, দেখো মেয়ের নাম লেখা আছে কিনা।'

স্টার্নের দিকে হেঁটে এল মুরল্যান্ড, ঝাপসা লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল। 'মেয়ের নাম ড্যান্সিং ডরোথি।'

ইয়টের ককপিট থেকে নেমে এল রানা। 'সাপ্লাই নিশ্চয়ই কাছেপিঠে কোথাও সরানো হয়েছে, সার্চ করা দরকার। ক্রুদের ফেলে যাওয়া দু'একটা জিনিস আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

অশ্রু বা ফোঁটা আকৃতির দ্বীপের গোটা তীর সার্চ করতে আধ ঘণ্টার বেশি লেগে গেল, এরপর ওরা ভেতর দিকে সরে এল। সময় বাঁচানোর জন্যে তিনজন ভাগ হয়ে গেল। মলিই প্রথমে একটা কুড়ালের অর্ধেকটা আবিষ্কার করল, উদ্ভট বেঁটে আকৃতির একটা পচা কাণ্ডে গাঁথা রয়েছে। টেনে সেটাকে বের করল মুরল্যান্ড, 'কাজে আসবে।'

কয়েক মিনিট পর রানা একটা নালা দেখতে পেল, খোলা একটা সমতল কার্নিস হয়ে ঝাঁপ দিয়েছে সাগরে। ওই নালার পাশেই কুঁড়েটা, গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ইয়টের মাস্তুল। কুঁড়ে মানে লগের ওপর লগ বসিয়ে চৌকো একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, চার মিটার লম্বা, তিন মিটার চওড়া। ছাদেও পাশাপাশি লগ ফেলা হয়েছে, নির্মাতা যে-ই হোক, আস্তানাটা সে নিরেট আর পোক্তভাবে তৈরি করেছে।

কুঁড়েটার বাইরে পরিত্যক্ত সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্টের স্তূপ জমে আছে। ব্যাটারি আর মরচে ধরা রেডিও-টেলিফোন, ডিরেকশন ফাইন্ডিং সেট, টাইম সিগন্যাল আর ওয়েদার বুলেটিন পাবার জন্যে ওয়্যারলেস রিসিভার, একগাদা মরচে ধরা ও খালি ফুড ক্যান, আউটবোর্ড মোটর সহ অক্ষত একটা টিকউড ডিঙ্গি, রাজ্যের নটিক্যাল হার্ডওয়্যার, ডিশ আর তৈজসপত্র, একটা স্টোভ ইত্যাদি ছাড়াও বহু জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে চারদিকে। স্টোভের পাশে মাছের কাঁটা।

'সাবেক ভাড়াটে সব একেবারে নোংরা করে রেখে গেছে,' বলল মুরল্যান্ড, গ্যাসচালিত একটা ছোট জেনারেটর পরীক্ষা করছে সে, বোটের ব্যাটারি চার্জ করতে লাগে।

'ওরা হয়তো এখনও কুঁড়েটার ভেতর আছে,' বিড়বিড় করল মলি।

হাসল রানা। 'ভেতরে ঢুকে দেখছ না কেন?'

মাথা নাড়ল মলি। 'আমি না। অন্ধকার ভৌতিক জায়গায় নাক গলানো পুরুষদের কাজ।'

নিচু দোরগোড়া, ঢোকার সময় মাথা নিচু করতে হলো রানাকে। ভেতরে অন্ধকার, প্রথম কিছুই দেখতে পেল না। লগগুলোর ফাঁক গলে অল্পই আলো ঢুকছে। খানিক পর অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে রানা দেখল, ও একটা কঙ্কালের খালি অক্ষিকোটরের দিকে তাকিয়ে আছে। সেইলবোট থেকে উদ্ধার করা একটা বার্থে শুয়ে আছে কঙ্কালটা। আই সকেটের ওপর কপালের হাড় চওড়া, কাজেই ওটাকে পুরুষ বলে ধরে নিল রানা। মরা মানুষটার মাত্র তিনটে দাঁত অবশিষ্ট আছে। বাকিগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে মনে হলো না, যেন বয়েসের কারণে পড়ে গেছে। ছেঁড়া আর ভঙ্গুর একটা শর্টস পেলভিস ঢেকে রেখেছে, হাড়সর্বস্ব পায়ে এখনও রাবার-সোলড ডেক শু। কঙ্কালে মাংস বলতে কিছুই নেই, খুদে পোকামাকড়রা সবই খেয়ে ফেলেছে। লোকটার চেহারা সম্পর্কে সামান্য একটু আভাস পাওয়া গেল খুলিতে লেগে থাকা লালচে খানিকটা চুল দেখে। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, ধরে আছে একটা লগ বুক।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখা গেল কুঁড়ের মালিক সব কিছু বেশ গুছিয়ে রেখেছিল। ড্যান্সিং ডরোথির পাল সিলিঙে টাঙানো হয়েছে, বাতাস আর বৃষ্টি ঠেকানোর জন্যে। রাইটিং টেবিলে রয়েছে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি চার্ট, পাইলটিং-এর ওপর কয়েকটা বই, টাইড টেবল, নেভিগেশন লাইট, রেডিও সিগন্যাল ও একটা নটিক্যাল আলমান্যাক। বোটের ইলেকট্রনিক ও মেকানিক্যাল গিয়ার কিভাবে অপারেট করা হবে তার ওপর লেখা কিছু বইও আছে, আলাদা একটা শেলফে সাজানো। ছোট একটা কাঠের বাক্সে পাওয়া গেল সেক্সট্যান্ট আর ক্রনোমিটার। টেবিলের নিচে একটা হ্যান্ড বেয়ারিং কম্পাস, আর একটা স্টিয়ারিং কম্পাস দেখা গেল। ছোট একটা ফোল্ডিং ডাইনিং টেবিলে হেলান দিয়ে রয়েছে স্টিয়ারিং হেলম, স্পোকের সঙ্গে বাঁধা একজোড়া বিনকিউলার। ঝুঁকল রানা, কঙ্কালের হাত থেকে লগটা তুলে নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল। 'ভদ্রলোক মারা যান,' বলল ও। 'দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে পারেননি।'

উঁকি দিয়ে কুঁড়ের ভেতরে তাকাল মুরল্যান্ড। 'এদিকে উনি এসেছিলেন কেন?'

'এতে হয়তো সব প্রশ্নের জবাব পাব,' লগ বুকটা দেখাল রানা। একটা পাথরের ওপর বসে কয়েকটা পাতার ওপর চোখ বুলাল।

ভদ্রলোকের নাম রডনি ইয়র্ক। না, রডনি বুমারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সমুদ্রপথে দুনিয়া ঘোরার প্রতিযোগিতায় মোট বারোজন অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। পোর্টসমাউথ, ইংল্যান্ড থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। স্পনসর করে লন্ডনের একটা দৈনিক পত্রিকা। প্রথম পুরস্কার ছিল বিশ হাজার পাউন্ড। এপ্রিল চব্বিশ, উনিশশো বাষট্টিতে রওনা হন রডনি ইয়র্ক। তারমানে প্রায় ছত্রিশ বছর ধরে নিখোঁজ তিনি। সাতানব্বুই দিন সাগরে থাকার পর তার বোট মিজারি নামে একটা দ্বীপে ধাক্কা খায়।

'তোমরা তো আমার অস্ট্রেলিয়ান রূপকথা শুনতে চাইলে না,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল মলি। 'ওই গল্পেও মিজারি দ্বীপের কথা বলা হয়েছে।'

রানা আবার শুরু করল। প্রতিযোগিতায় সবার আগে ছিলেন ইয়র্ক, কিন্তু এদিকে আসার পর তাঁর জেনারেটর নষ্ট হয়ে যায়। পাওয়ার সাপ্লাই না থাকায় বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। বোটটা পাথরে বাড়ি খেয়ে উল্টে পড়েছিল। বেশিরভাগ সাপ্লাই পানিতে পড়ে যায়। ঝড় থামার পর তিনি ওটাকে টেনে তোলেন। কিছু খাবার উদ্ধার করেছিলেন, তবে তাতে বেশি দিন চলেনি। মাছ ধরার চেষ্টা করেন তিনি, তেমন সফল হননি। খেতে না পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পাখির ডিম পেয়েছিলেন কয়েকটা। এভাবে এই পাথরের টুকরোর ওপর একশো ছত্রিশ দিন বেঁচেছিলেন ইয়র্ক। শেষ দিকে তিনি লিখেছেন, 'আর নড়াচড়া করতে পারছি না। শুয়ে আছি। প্রহর গুনছি কখন মৃত্যু হবে। হায় স্বদেশ, বড় সাধ জাগে আরেকবার তোমাকে দেখি। এই লগ যিনিই হাতে পান, দয়া করে আমার স্ত্রী আর তিন কন্যাকে লেখা আলাদা চারটে চিঠি যেন তাদের হাতে ঠিকমত পৌঁছে দেন। আমার চিন্তায় তারা যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সেজন্যেও তাদের কাছে আমি ক্ষমা চাই। আমার ব্যর্থতার জন্যে যতটা ত্রুটি দায়ী তারচেয়ে বেশি দায়ী দুর্ভাগ্য। হাত এত দুর্বল যে আর লিখতে পারছি না। ধন্যবাদ।'

মলির চোখ দুটো ছলছল করছে। 'বেচারা স্ত্রী আর মেয়েগুলো জানেও না কোথায় কিভাবে তিনি মারা গেছেন।'

কুঁড়ের ভেতর আবার ঢুকল রানা, বেরিয়ে এল অ্যাডমিরাল্টি চার্ট হাতে নিয়ে। পাথরের ওপর মেলে তাসমান সীর দিকে তাকাল রানা। 'মিজারি শুধু রূপকথায় নয়, চার্টেও আছে।'

'আমরা তাহলে কোথায় রয়েছি?' জানতে চাইল মলি।

নীল সাগরের মাঝখানে খুদে একটা বিন্দুর ওপর আঙুল তাক করল রানা। 'এখানে। নিউজিল্যান্ডের ইনভারকারগিল থেকে নয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।'

মুরল্যান্ড জিজ্ঞেস করল, 'ইয়র্কের খোঁজ পেতে ছত্রিশ বছর লেগে গেছে। আমাদের খোঁজ পেতে কত বছর লাগবে?'

পাঁচ

গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদে নিজের বাড়িতেই অফিস খুলে বসেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'হাতে আছে আর মাত্র নয় দিন,' বললেন তিনি, টেবিলে বসা দাড়ি না কামানো পুরুষ আর ক্লান্ত মেয়েগুলোর ওপর চোখ বুলালেন। দেয়ালে ফটো, নটিকল চার্ট আর দ্রুত হাতে আঁকা ছবি সাঁটা হয়েছে। কার্পেটে ছেঁড়া কাগজের স্তূপ। কনফারেন্স টেবিলের ওপর কফি কাপ, নোটপ্যাড, আট-দশটা টেলিফোন, আর চুরুট ভর্তি অ্যাশট্রে।

'সময় আমাদের বিরুদ্ধে,' ড. ইমরুল কায়েস বললেন। 'ডেডলাইনের আগে একটা রিফ্লেক্টর তৈরি করে জায়গা মত ফিট করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।'

সাউন্ড এক্সপার্ট আর তাঁর ছাত্ররা আরিজোনায় রয়েছেন, তবে টিভি মনিটরের কল্যাণে দেখে মনে হবে নুমার স্টাফের সঙ্গে ওয়াশিংটনে, একই টেবিলে বসে আছেন তাঁরা। উল্টোটাও সত্যি, হ্যামিলটনের এক্সপার্টরা যেন আরিজোনায় ড. কায়েসের রিসার্চ সেন্টারে বসে আছে। ভিডিও হলোগ্রাফির কৃতিত্ব, ফটোনিক্স-এর মাধ্যমে ছবি আর আওয়াজ বিশাল দূরত্ব পেরিয়ে আসা-যাওয়া করছে। ফটোনিক্সের সঙ্গে কমপিউটরের জাদু যোগ করায় টাইম আর স্পেস-এর সীমাবদ্ধতা বলতে কিছু নেই।

'আপনার সঙ্গে আমি একমত,' টিভি মনিটরের দিকে তাকিয়ে ড. কায়েসকে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তৈরি করা আছে, এরকম একটা রিফ্লেক্টর পেতে হবে আমাদেরকে।'

'আমাদের একটা প্যারাবলিক রিফ্লেক্টর দরকার,' বললেন ড. কায়েস। 'আকারে সেটা একটা বেসবল ডায়মন্ড-এর চেয়ে বড় হবে তো ছোট নয়, সাউন্ড এনার্জি রিফ্লেক্ট করার জন্যে সারফেসের মাঝখানে একটা এয়ার গ্যাপ থাকবে। সময়ের জানালা বন্ধ হবার আগে এ জিনিস তৈরি করা সম্ভব নয়।'

রেডক্লিফ বললেন, 'না, সম্ভব নয়। তৈরি কোন রিফ্লেক্টর চাই আমাদের, ফিজি আর টোঙ্গার মাঝখানে শুভা দ্বীপে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

'অত বড় একটা জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়,' ল্যাপটপ কমপিউটর থেকে মুখ তুলে বলল ল্যারি কিং। 'প্রথমে খুলতে হবে ওটাকে, টুকরোগুলো জাহাজে তুলে শুভা দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে, তারপর আবার জোড়া লাগাতে হবে। কোন প্লেন এত বড় কাঠামো বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'কিন্তু এত বড় জাহাজই বা পাব কোথায়?' রেডক্লিফের প্রশ্ন।

চুরুট ধরালেন অ্যাডমিরাল। 'হয় অয়েল সুপারট্যাঙ্কার দরকার হবে, নয়তো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার।'

'নিউক্লিয়ার ক্যারিয়ারের স্পীড ফিফটি নট, সান ফ্রান্সিসকো থেকে টোঙ্গা বা শুভা দ্বীপে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বাহাত্তর ঘণ্টা,' বললেন রেডক্লিফ

চোখ তুলে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তারমানে পাঁচদিনের মধ্যে একটা রিফ্লেক্টর খুঁজে পেতে হবে, সেটাকে প্রথমে সান ফ্রান্সিসকোয় নিয়ে যেতে হবে, তারপর ওখান থেকে কনভারজেন্স জোনে নিয়ে গিয়ে ফিট করতে হবে।'

'টাইট শেডিউল, আপনার হাতে যদি একটা রিফ্লেক্টর থাকেও,' বললেন ড. কায়েস।

কিং জানতে চাইল, 'কত গভীরে ওটা ফিট করতে হবে?'

সুন্দরী এক তরুণী, শাড়ি পরিহিতা, ঝট করে ড. কায়েসের হাতে একটা পকেট ক্যালকুলেটর গুঁজে দিল। ড. কায়েস কয়েকটা বোতামে চাপ দিলেন। 'রিফ্লেক্টরের সেন্টারটা একশো সত্তর মিটার গভীরতায় থাকা দরকার,' বললেন তিনি।

'স্রোত আমাদের এক নম্বর সমস্যা,' বললেন রেডক্লিফ। 'জায়গা মত রিফ্লেক্টরটাকে ধরে রাখা খুব কষ্টকর হবে।'

'আমাদের এঞ্জিনিয়ারদের কাজে লাগান,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওরা একটা রিগিং সিস্টেমের ডিজাইন করুক, কাঠামোটা যাতে স্থির থাকে।'

'কনভারজিং সাউন্ড ওয়েভ রি-ফোকাস করলেই যে সরাসরি আবার ওটা নিমবাসের উৎসে ফিরে যাবে, তার নিশ্চয়তা কি?' ড. কায়েসকে জিজ্ঞেস করল কিং।

এক হাতে দাড়ি পাকাচ্ছেন ড. কায়েস, জবাব দিলেন, 'যে. ফ্যাক্টরগুলো অরিজিনাল সাউন্ড ওয়েভকে প্রপাগেট করবে–যেমন, লবণাক্ততা, পানির তাপমাত্রা ও শব্দের গতি–সেগুলো যদি অক্ষুণ্ন থাকে, রিফ্লেক্টেড এনার্জি নিজের পথ ধরে অবশ্যই উৎসে ফিরে যাবে।'

অ্যাডমিরাল কিং-এর দিকে ফিরলেন। 'নিমবাসের লোক সংখ্যা কত?'

কমপিউটরের সাহায্য নিল কিং। 'স্যাটেলাইট ফটো সহ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ জন, বেশিরভাগই মাইনার।'

'চীনা আর বাঙালী পেভ লেবার,' বিড়বিড় করলেন রেডক্লিফ।

ড. কায়েসকে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আপনি বলেছেন, ফেরার পথে দুর্বল হয়ে পড়বে সাউন্ড ওয়েভ, ফলে লোকজন মারা যাবে না। তবে অসুস্থ হবে। তার মাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারেন?'

অ্যাকুসটিক এক্সপার্টের আরেকজন সহকারী কোন রকম ইতস্তত না করে কাগজের একটা শীট বাড়িয়ে ধরল, সেটা নিয়ে ড. কায়েস বললেন, 'নিমবাসে আঘাত করার সময় ওভারল্যাপিং কনভারজেন্স জোনের এনার্জি ফ্যাক্টর শতকরা আটাশ ভাগ কমে যাবে, প্রাণী বা মানুষকে মেরে ফেলার মত যথেষ্ট শক্তিশালী থাকবে না।'

'ফিজিকাল রিয়্যাকশন ব্যাখ্যা করতে পারেন?'

'মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, সামান্য বমি ভাব, ব্যস।'

অ্যাডমিরালের একজন উপদেষ্টা, শেলি মারভিন, বললেন, 'ইউ. এস. নেভির এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রুজভেল্ট পার্ল হারবারে ভিড়েছে, সাপ্লাই নেবে, মেরামতের কিছু কাজও সারবে, তারপর ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি টেন্থ ফ্লিটের সঙ্গে যোগ দেবে।'

'কি ভাবছেন বুঝতে পারছি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু রিফ্লেক্টর ছাড়া পার্ল হারবারে একটা ক্যারিয়ার কিভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করবে?'

শেলি মারভিন বললেন, 'ক্যারিয়ারটাকে আমি বোনাস হিসেবে দেখছি। আমি যে তথ্যটা দিতে চাইছি তা হলো, হাওয়াই দ্বীপের লানাই-এ একটা স্যাটেলাইট ইনফরমেশন কালেকশন সেন্টার আছে।'

'লানাই-এ স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটি আছে? স্ত্রীকে নিয়ে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, কই, দেখলাম না তো।' কিং বিস্মিত।

'বিল্ডিং আর প্যারাবলিক রিফ্লেক্টর মৃত পালাওয়াই আগ্নেয়গিরির ভেতরে। নেটিভ বা ট্যুরিস্টদের ওটার ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেয়া হয় না।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল, আগ্রহে চকচক করছে চোখ দুটো, কিং জানতে চাইল, 'প্যারাবলিক রিফ্লেক্টর কত বড় হয়?'

'যত দূর মনে আছে, আশি মিটার…'

'ডায়ামিটারে তো?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কায়েস। 'আমাদের যতটুকু সারফেস এরিয়া দরকার, তারচেয়ে বেশিই তাহলে।'

শেলি মারভিনকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে ভাগিয়ে এনেছেন অ্যাডমিরাল, জানেন তাঁর তথ্য ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। 'আপনার কি মনে হয় এনএসএ ওটা আমাদেরকে ধার দেবে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ওটাকে ওখান থেকে আমরা সরিয়ে আনতে চাইলে ওরা বোধহয় টাকাও দেবে,' বললেন শেলি। 'সেন্টারটা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে অনেক আগেই, কারণ যন্ত্রপাতিগুলো মান্ধাতা আমলের, বাতিল হয়ে গেছে–যদিও সাইটে এখনও পাহারা আছে।'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'তাহলে নেভীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় আমাকে। হাওয়াই থেকে খুলে ওটাকে আকাশ পথে বয়ে আনতে হবে, রুজভেল্টে নিয়ে এসে জোড়া লাগাতে হবে আবার, তারপর নামাতে হবে কনভারজান্স জোনে। শেলি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে রাজি করাবার দায়িত্বটা আপনি নিন, প্লীজ।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে; এখুনি আমি কাজ শুরু করছি।'

রডনি বুমারের জুয়েলারি ট্রেড সেন্টার। প্রাইভেট এলিভেটর নিঃশব্দে উঠে এল পেন্টহাউস স্যুইটে। অ্যাবেল ময়নিহানকে দেখে মনে হলো হলিউডের কোন বিখ্যাত অভিনেতা; ষাট বছর বয়েসেও প্রাণচঞ্চল তরুণ, সেই পঁয়তাল্লিশের পর তাঁর বয়েস যেন আর বাড়েনি। সুদর্শন এই ভদ্রলোক একজন ইহুদি, আর ইহুদিরা যে ধুরন্ধর ব্যবসায়ী হয় তা কে না জানে–ইনিও তার ব্যতিক্রম নন। এলিভেটর থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক, প্যাসেজ ধরে চলে এলেন খোলা একটা চত্বরে। এখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন রডনি বুমার।

ব্যবসায়িক সূত্রে ময়নিহান ও বুমার পরিবার একশো বছর ধরে ঘনিষ্ঠ। একজন আরেকজনকে ছোটবেলা থেকে চেনেন। তবে কয়েক বছর ধরে পরস্পরের পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছেন তাঁরা।

ময়নিহানও একজন হীরক ব্যবসায়ী। পারিবারিক খনি তো আছেই, সেই সঙ্গে তিনি একজন পাইকারও বটেন। হীরকসম্রাট রডনি বুমারের কাছ থেকে পাইকারী দরে হীরে কিনে বাজারজাত করতেন। কোম্পানীর নাম ময়নিহান অ্যান্ড সন্স। তাঁর ওপর কি কারণে বুমার খেপে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না, তবে অস্পষ্ট একটা গুজব ছড়িয়েছিল এই যে ময়নিহান নাকি তাঁর প্রেমিকা বা রক্ষিতা পাউলা পারকারকে এক রাতের জন্যে চেয়েছিলেন।

কোন হৈ-চৈ বা গোলযোগ সৃষ্টি হয়নি, ব্যাপারটা নিঃশব্দে ঘটে যায়। রডনি বুমার তাঁর অ্যাটর্নিদের মাধ্যমে জানান যে ময়নিহানের সঙ্গে তিনি কোন ব্যবসা করবেন না। খবরটা দেয়া হয় টেলিফোনে, ব্যক্তিগতভাবে মুখোমুখি হবার ঝামেলায় যাননি বুমার। ময়নিহানের জন্যে ব্যাপারটা ছিল চরম অপমানকর, সেই অপমানের

কথা আজও তিনি ভোলেননি।

পারিবারিক ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দক্ষিণ আফ্রিকার কার্টেলের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন ময়নিহান, সেই সঙ্গে কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার সিডনি থেকে তুলে নিয়ে যান নিউ ইয়র্কে। রডনি বুমার তাঁর সমস্ত খনি থেকে সব হীরে তুলে ফেলছেন, এই খবর শুনে কার্টেলভুক্ত কোম্পানীগুলো স্বভাবতই খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, কারণ বুমার যদি চাহিদার চেয়ে বেশি হীরে বাজারে ছাড়েন তাহলে বিপজ্জনক দর পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। সেজন্যেই তারা ময়নিহানকে পাঠিয়েছে, বুমারের সঙ্গে আলাপ করে তিনি বুঝতে চেষ্টা করবেন হীরকসম্রাটের আসল উদ্দেশ্যটা কি।

এগিয়ে এসে ময়নিহানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন বুমার। 'অনেক দিন পর আবার আমাদের দেখা হলো, তাই না, অ্যাবেল?'

'সাক্ষাৎ দেয়ায় তোমাকে ধন্যবাদ, রডনি,' সবিনয়ে বললেন ময়নিহান, অতীত বন্ধুত্বের কথা মনে রাখলে এই বিনয়কে ব্যঙ্গই বলতে হয়। 'আমার যতদূর মনে পড়ে, তোমার অ্যাটর্নিরা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল আমি যেন তোমার সঙ্গে কখনও যোগাযোগ না করি।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন বুমার। 'তিক্ত স্মৃতি ভুলে থাকাই সব দিক থেকে ভাল। এসো লাঞ্চে বসে মধুর স্মৃতি নিয়ে আলাপ করি,' টেবিলটার দিকে হাত তুললেন তিনি, উঁচু মঞ্চের ওপর ফেলা হয়েছে, বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে ঘেরা, চেয়ারে বসলেও সিডনি হারবার পরিষ্কার দেখা যাবে।

ময়নিহান আশা করেছিলেন বুমার আড়ষ্ট আচরণ করবেন, দেখা হওয়া মাত্র ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে। সেরকম কিছু ঘটছে না দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন তিনি। বসা মাত্র একজন ওয়েটারকে ইঙ্গিত করলেন বুমার। ওয়েটার রূপালি একটা বালতি থেকে শ্যাম্পেনের বোতল তুলে ময়নিহানের গ্লাসটা ভরে দিল। ময়নিহান লক্ষ করলেন, বুমার বিয়ার খাচ্ছেন সরাসরি বোতল থেকে। 'যখন শুনলাম কার্টেল তাদের একজন প্রতিনিধিকে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাচ্ছে, ভুলেও ভাবিনি যে তারা তোমাকে পাঠাবে,' আলোচনার সূত্রপাত করলেন বুমার।

'তোমার আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কথা মনে রেখে ডিরেক্টররা ভাবলেন তোমার মন বোঝা আমার পক্ষে সহজ হবে,' জবাব দিলেন ময়নিহান। 'কি ব্যাপার বলো তো? সব খনি তুমি একেবারে খালি করে ফেলেছ বলে শুনছি। কেন?'

'এ খবর কোথায় তুমি পেলে তা আমি জিজ্ঞেস করব না,' মিটিমিটি হেসে বললেন বুমার। 'আগে বলো শুনি কি কারণে কার্টেল এতটা উদ্বিগ্ন।'

'কেন, তুমি জানো না? হীরে উৎপাদনের কোটা তো অনেক আগেই বেঁধে দেয়া হয়েছে। তুমি সেই নির্ধারিত কোটার চেয়ে অনেক বেশি হীরে তুলছ। বাজারে যদি এ-সব আসে, চিন্তা করে দেখেছ দাম কোথায় গিয়ে নামবে?'

'দীর্ঘ আলোচনা আমার একঘেয়ে লাগে,' বললেন বুমার। 'চেষ্টা করে দেখি সংক্ষেপ করা যায় কিনা, ঠিক আছে? প্রথমে তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। ধরো তুমি খবর পেলে তোমার হীরের স্টক ডাকাতি হয়ে যাবে। ডাকাতদের সংখ্যা

এত বেশি আর তাদের অস্ত্র এত আধুনিক যে কেউ তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। এ অবস্থায় তুমি কি করবে?'

তিন সেকেন্ড চিন্তা করে জবাব দিলেন ময়নিহান, 'হীরেগুলো আমি নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলব।'

বুমার হাসলেন। 'আমিও ঠিক তাই করছি।'

ময়নিহানকে বিস্মিত দেখাল। 'কিন্তু তোমার হীরে তো খনির ভেতর রয়েছে, কে তা ডাকাতি করবে?'

'প্রকৃতি,' ছোট্ট করে জবাব দিলেন বুমার।

ভুরু কোঁচকালেন ময়নিহান। 'বুঝলাম না।'

'বাইরের কেউ এই প্রথম তুমিই জানছ,' বললেন বুমার। 'তোমাকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে, কাজেই তোমাকে সব কথা জানালে অসুবিধে নেই। আমার জিয়োলজিস্টরা সাইজমলজিকাল স্টাডির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছেন যে নিমবাস আর নিমবাসের কাছাকাছি দুটো দ্বীপ, রেড স্যান্ড আর গুডউইল, আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে বিস্ফারিত হবে।'

'বিস্ফোরিত হবে মানে?' ময়নিহান হতভম্ব। তিনি জানেন, বুমারের এদিকের খনিগুলো আগ্নেয়গিরির ভেতর। হঠাৎ তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগল। আন্তর্জাতিক বাজারে এই তথ্যের মূল্য কয়েক কোটি ডলার হওয়াও বিচিত্র নয়। এতদিন গোপন রাখলেও, বুমার এখন সব বলে ফেলেছেন। কি মনে করে?

'বিস্ফোরিত হবে মানে, আগ্নেয়গিরিগুলো জ্যান্ত হতে যাচ্ছে,' বললেন বুমার। ঘাড় ফিরিয়ে একবার প্যাসেজের দিকে তাকালেন। এক সেকেন্ড পর প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল পাউলা পারকার। হাত তুলে একবার শুধু আঙুলগুলো নাচালেন তিনি, তারপর আবার ময়নিহানের দিকে ফিরলেন। 'আর মাত্র দু'হপ্তা সময় আছে, অ্যাবেল। নিমবাস, গুডউইল আর রেড স্যান্ড বলে কিছু থাকবে না। টেকনিক্যাল ব্যাপার ভাল বুঝি না, তবে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে দ্বীপগুলো সাগরে তলিয়ে যাবে। কাজেই, বুঝতেই পারছ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত হীরে আমাকে বের করে নিতে হচ্ছে।'

সাদা প্যান্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে পাউলা, প্যান্ট আর ব্লাউজের মাঝখানে পেটের একটা অংশ অনাবৃত, ব্লাউজের নিচের ঝুল ফিতে দিয়ে বাঁধা, ফিতের লেজটুকু নাভির ওপর ঘষা খাচ্ছে। বুমারের পিছনে এসে দাঁড়াল সে, তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, 'অতিথিকে এখনও তোমরা খেতে দাওনি?' তারপর মুখ তুলে ময়নিহানের দিকে তাকাল সে। 'হ্যালো, মি. ময়নিহান?'

'হ্যালো,' শুকনো গলায় বললেন ময়নিহান, পাউলার দিকে তাকাতে আড়ষ্টবোধ করছেন। বুমারের দিকে ফিরে তিনি জানতে চাইলেন, 'কিন্তু তুমি তো শুধু এই তিনটে দ্বীপ থেকে হীরে তুলছ না। কোর, ক্যান্ডি আর রডগার খনিও খালি করে ফেলছ। ওগুলোও কি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে?'

'পাউলা, অতিথিকে কি খাওয়াতে চাও ওয়েটারকে বলো, প্লীজ,' অনুরোধ করলেন বুমার।

পাউলার ইঙ্গিতে ওয়েটার লবস্টার আর স্যালাড পরিবেশন করল। ময়নিহানের

পিছনে এসে দাঁড়াল পাউলা, সুরেলা কণ্ঠে বলল, 'নিন, মি. ময়নিহান, শুরু করুন।'

'ধন্যবাদ, আমার খিদে নেই,' প্রত্যাখ্যান করলেন ময়নিহান, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বুমারের দিকে।

বুমার বললেন, 'না, ওগুলো বিস্ফারিত হতে যাচ্ছে না। আসলে কি জানো, খুব শিগ্‌গির আমি লোকবলের সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছি। প্রশান্ত মহাসাগরে মাত্র ছ'টা দ্বীপে আমার খনি রয়েছে, তাই না? অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ওগুলোর সংখ্যা কয়েকশো বা কয়েক হাজারে দাঁড়াবে।' ময়নিহানের চেহারায় হতবিহ্বল একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখলেন তিনি, তবে দেখেও না দেখার ভান করে কথা বলে যাচ্ছেন, 'খনির সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু হীরে তোলার জন্যে অত লোক আমি পাব কোথায়? তাই ঠিক করেছি, হাতে যতক্ষণ সময় আছে, সব খনি খালি করে ফেলব। কয়েক হাজার নতুন খনি পাচ্ছি, কাজেই নতুন লোকও নেয়া হবে...'

'তোমার কথা তো কিছুই আমি বুঝতে পারছি না,' বাধা দিলেন ময়নিহান। 'কয়েকশো, কয়েক হাজার, এ-সব তুমি কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি।' হাসলেন বুমার। 'কেন, প্রশান্ত মহাসাগরে মড়ক লেগেছে, তুমি শোনোনি? খনি খালি করার কাজে পালসড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করছি আমরা। তাতে কোন কোন দ্বীপের লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমি আশা করছি মহামারী দেখা দিয়েছে ভেবে সবাই তারা দ্বীপগুলো ছেড়ে পালাবে। অর্থাৎ দ্বীপগুলো সব খালি হয়ে যাবে।'

'হলো। তো?' দ্রুত চিন্তা করছেন ময়নিহান।

'কিরিবাতি, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন আইল্যান্ড, ফিজি, টোঙ্গা ইত্যাদি নাম করা দ্বীপগুলোর কথা বাদ দাও,' বললেন বুমার। 'ওগুলোর আশপাশে রয়েছে কয়েক হাজার দ্বীপ। গত বিশ বছর ধরে আমার বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন ওদিকের প্রায় প্রতিটি দ্বীপে হীরের খনি আছে। জানি, তোমার বিস্ময় বাধ মানছে না। তবে আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছ।'

বুমারের আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারছেন না ময়নিহান। এ-সব তথ্য যদি সত্য হয়, বুমার গোপন করছেন না কেন? নিরাপত্তার অভাব বোধ করলেন তিনি। দৃষ্টিসীমার ভেতর পাউলাকে দেখতে না পেয়ে ভয়টা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

বুমার হঠাৎ জানতে চাইলেন, 'এখান থেকে গিয়ে কার্টেলকে তুমি কি জানাবে, অ্যাবেল?'

'বলব তুমি পাগল হয়ে গেছ, সারাক্ষণ শুধু প্রলাপ বকছ,' জবাব দিলেন ময়নিহান। 'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি।'

বুমার হাসলেন। 'তুমি অভিনয় জানো, তবে প্রতিভা নও। ফিরে গিয়ে আমার প্রতিটি কথা রিপিট করবে। কার্টেলকে বোঝাতে চেষ্টা করবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। অর্থাৎ উল্টোটা বলছ তুমি।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ, রডনি,' গম্ভীর সুরে বললেন ময়নিহান। 'এখন মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসা আমার উচিত হয়নি। এখন তাহলে আমি উঠব।'

'যাবার আগে, অ্যাবেল, তোমাকে আমি একটা জিনিস প্রেজেন্ট করতে চাই।'

'তোমার কোন উপহার আমি চাই না!' কঠিন সুরে বললেন ময়নিহান।

'এটা তোমার ভাল লাগবে, অ্যাবেল,' হেসে উঠে বললেন বুমার। 'আবার মনে হচ্ছে, না-ও ভাল লাগতে পারে।' একটা হাত তুলে ঝাঁকালেন তিনি।

পাউলা দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক ময়নিহানের পিছনে। ঝুঁকল সে, ময়নিহানের হাত দুটো ধরে চেয়ারের পিছনে টেনে আনল। ধস্তাধস্তি করলেন ময়নিহান, কিন্তু পাউলার সঙ্গে জোরে পারলেন না। নিজেকে ছাড়াতে না পেরে শরীরে ঢিল দিলেন তিনি। অপমানে যতটা না, তারচেয়ে ভয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন। নেশাগ্রস্ত মানুষের মত লাগছে তাঁকে, তাকিয়ে আছেন বুমারের দিকে। 'এর মানে কি?' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করলেন। 'পাউলাকে বলো এখুনি যেন আমাকে ছেড়ে দেয়।'

অমায়িক হেসে বুমার বললেন, 'তুমি লাঞ্চ প্রত্যাখ্যান করেছ, অ্যাবেল। তোমাকে আমি না খেয়ে যেতে দিতে পারি না। তা দিলে তুমি হয়তো ভাববে আমি অতিথিবৎসল নই।'

'আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে, মনে রেখো, কার্টেল তোমাকে ছাড়বে না...'

'খারাপ ব্যবহার কে করছে? আমি তো শুধু তোমাকে খাওয়াতে চাই।' হাসছেন বুমার।

ময়নিহান দিশেহারা বোধ করছেন। কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। পাউলার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে আবার তিনি শরীরটাকে মোচড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু পাউলার গায়ে অসম্ভব শক্তি, তিনি সুবিধে করতে পারছেন না।

বুমার ইঙ্গিত করলেন। পাউলা এবার ভাঁজ করা হাত দিয়ে ময়নিহানের গলাটা পেঁচাল। চেয়ারের পিছনে হেলান দিলেন ময়নিহান, হাঁ করা মুখ আকাশের দিকে তোলা। কোটের পকেট থেকে প্লাস্টিকের একটা চোঙ্গা বের করলেন বুমার, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, ঝুঁকে সেটা গুঁজে দিলেন ময়নিহানের দু'সারি দাঁতের মাঝখানে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ময়নিহানের চোখ দুটো। গলায় পেঁচানো পাউলার হাত আরও টান টান হলো, ফলে তাঁর আর্তনাদ ভোঁতা শোনাচ্ছে। 'রেডি, রডনি,' বলল পাউলা, নির্দয় চেহারায় খুনের নেশা।

'হীরের যখন ব্যবসা করো, তখন হীরে তুমি খেতেও পারবে,' বলে টেবিল থেকে টি-পট আকৃতির ছোট একটা ক্যানিস্টার তুলে নিলেন বুমার। চোঙ্গাটা ময়নিহানের মুখে আটকে গেছে। এক হাত তাঁর নাকের ফুটো চেপে ধরলেন বুমার, অপর হাতে রয়েছে ক্যানিস্টার। সেটা তিনি চোঙ্গার চওড়া মুখে উপুড় করলেন খানিকটা। ডি-গ্রেড, ওয়ান ক্যারাট ডায়মন্ড ক্যানিস্টার থেকে বেরিয়ে এসে চোঙ্গার ভেতর পড়তে শুরু করল। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলেন ময়নিহান। পা ছুঁড়ছেন অনবরত। তবে হাত দুটো পাউলা ছাড়েনি। স্রেফ তীব্র আতঙ্কে মরিয়া হয়ে হীরেগুলো গিলে ফেলার চেষ্টা করছেন ময়নিহান। কিন্তু সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি যে গিলে সারা যাচ্ছে না। তারপর গলায় আর কোন জায়গা থাকল না। দম বন্ধ হয়ে গেল। শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে। দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি। এখন আর নড়ছেন না, ঠোঁটের কোণ থেকে উপচে পড়ছে খুদে হীরে, পাকা চত্বরে পড়ে লাফাচ্ছে।

রডনি ইয়র্ককে শুকনো একটা নালায় কবর দিল ওরা। কুঁড়ের ভেতর মোটা ডেকরন কাপড় পাওয়া গেছে, তাঁবু বানাবার কাজে লাগল: দীর্ঘদিন একটা লাশ পড়ে ছিল বলে ঘরটায় ঢুকতে রাজি হয়নি মলি রেডিও আর জেনারেটর চালু করার জন্যে দু'দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করল মুরল্যান্ড, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আমি তো কোন ছার, জেনারেল ইলেকট্রিক-এর চীফ এঞ্জিনিয়ারও কিছু করতে পারবে না

চারদিন হলো ডাঙায় রয়েছে ওরা। সেদিন পাখির মাংস দিয়ে নাস্তা সেরে রানা বলল, 'একটা বোট নিয়ে এখানে আমরা এসেছি, আরেকটা বোট এখানে ছিল। দুটোই ভাঙা, মেরামতের অযোগ্য এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'কিছুই করার নেই,' মলি বলল। 'অপেক্ষা করতে হবে, যদি কোন জাহাজ এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে।'

'আমি বলি কি, এসো, কারও সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে আমরা নিজেরাই...

'কিভাবে?'

'আমরা ওই দুটো বোট থেকে তৃতীয় একটা বোট তৈরি করতে পারি

আইডিয়াটা সবারই ভাল লাগল। দুই বোটের অক্ষত অংশগুলো নিয়ে শুরু হলো নির্মাণ কাজ। মাস্তুল আছে, আছে হাল ও পাল, আরও আছে একটা আউটবোর্ড এঞ্জিন, কাজেই সাগর পাড়ি দেয়া কোন সমস্যা হবে না। রানা বলল, 'ইয়র্কের নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্ট আর অ্যাডমিরাল্টি চার্ট থাকায় মোটামুটি নিখুঁত একটা কোর্স ধরে নিমবাসে পৌছুনো অসম্ভব হবে না।'

মলি এমন ভাবে তাকাল, যেন পাগল ভাবছে রানাকে। 'প্রলাপ বকছ?'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুরু যখন করেছি, কাজটা আমি শেষ করতে চাই—তোমার ছেলে দুটোকে উদ্ধার করব পেভ লেবারদেরও উদ্ধার করতে হবে। ওদের মধ্যে প্রচুর বাংলাদেশী আছে '

'রানাকে আমি সমর্থন করছি,' নির্দ্বিধায় বলল মুরল্যান্ড 'হল্ট আর পাউলার সঙ্গে আমার কিছু দেনা-পাওনা আছে, আশা করি নিমবাসে গেলে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

বিরক্ত দেখাল মলিকে 'কি বলছ নিজেরাও জানো না। দ্বীপটার নব্বুই ভাগ ঘিরে রেখেছে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর, টপকানো সম্ভব নয় একমাত্র ল্যান্ডিং এরিয়া বলতে লেগুনকে ঘিরে থাকা সৈকত, সেখানে আবার কড়া পাহারা। গুলি না খেয়ে রীফ পেরুনো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'দ্বীপটায় আমরা ঠিকই পা রাখতে পারব, কোন বিপদ হবে না

'আমরা লেগুনে ঢোকার আগেই ড্যাডির পেট্রল বোট দেখে ফেলবে আমাদের, বলল মলি

'বললাম তো, চিন্তার কিছু নেই। পেট্রল বোটকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল আমরা জানি।'

'কি কৌশল, শুনি?'

'সহজ। ওরা যেখানে আমাদেরকে আশা করবে না ঠিক সেখানে ভিড়ব আমরা।'

অসহায় দেখাল মলিকে। 'তোমরা আসলে আমার সঙ্গে কৌতুক করছ। কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস, রানা। ধরা পড়লে আমার ড্যাডি তোমাদেরকে মেরে ফেলবে!'

'এ-সব চিন্তা বাদ দিয়ে নিমবাস দ্বীপের একটা ম্যাপ এঁকে দেখাও আমাকে।'

'ম্যাপ? কি রকম ম্যাপ?'

'প্রতিটি বিল্ডিং, পথ, রাস্তা থাকা চাই, দূরত্বের মাপ সহ,' বলল রানা

'ঠিক আছে, দেব এঁকে–যতটা মনে আছে।'

মুরল্যান্ড রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে নিমবাস কত দূর হতে পারে?'

'চারশো আটাত্তর কিলোমিটার।'

মলি জানতে চাইল, 'পৌঁছুতে কত দিন লাগবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কি করে বলি। স্রোত আর বাতাস অনুকূল পেতে হবে। নতুব বোট কি রকম আচরণ করে তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

মুরল্যান্ড জিজ্ঞেস করল, 'ধরো বোট নিয়ে আমরা নিমবাসের কাছাকাছি পৌঁছুলাম। কিন্তু তারপর দ্বীপটায় আসা-যাওয়া করব কিভাবে?'

'ঘুড়ি বানাবার সরঞ্জাম আর একটা গ্র্যাপলিং হুক পেয়েছি কুঁড়েঘরে,' বলল রানা। 'দ্বীপে ওঠার কাজে ব্যবহার করব।'

'আর নামার কাজে?' কৌতূহলে চকচক করছে মুরল্যান্ডের চোখ জোড়া।

'সেটা সময় হলে ভেবে বের করা যাবে।'

পানি থেকে ত্রিশ গজ দূরে সমতল মাটির ওপর তৈরি হচ্ছে বোটটা। রাতদিন কাজ চলছে এমন কি মলিও বসে নেই। ওকে দেয়া হয়েছে একজোড়া পাল সেলাই করার কাজ প্রথম পালটা মেইন মাস্টের জন্যে তৈরি করল ও। নতুন বোটের তলা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে জঙ্গল থেকে কেটে আনা গাছের কাণ্ড রডনি ইয়র্কের বোট থেকে হালটা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে, সেটা টিলারের সঙ্গে আটকানো হলো। তারপর বোটের পিছনে বসানো হলো চল্লিশ বছরের পুরানো আউটবোর্ড মোটরটা

বোটটাকে পানিতে নামানোর আগের দিন খুব ব্যস্ত সময় কাটল ওদের। রানার রহস্যময় ঘুড়ি তৈরির প্রস্তুতিও পুরোদমে চলছে। ডেক হাউসে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে ঘুড়িটা, সঙ্গে একশো পঞ্চাশ মিটার নাইলন লাইন। নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্টের সঙ্গে খাবারদাবারও লোড করা হলো বোটে। আরও নেয়া হলো বই-পত্র, চার্ট ও ম্যাপ।

আউটবোর্ড মোটর খক খক করে উঠতে হাততালি দিল মলি তারপর সে জানতে চাইল, 'ইয়র্ক যে তেল রেখে গেছেন, তা দিয়ে কতক্ষণ চলবে মোটরটা?'

'ছয় কি সাত ঘণ্টা,' বলল রানা।

'মাত্র!' মলির মুখে ম্লান হয়ে গেল হাসিটা।

পরদিন ঠেলে পানিতে নামানো হলো বোট। আউটবোর্ড মোটর স্টার্ট দিল রানা,

পানিতে একটা বৃত্ত তৈরি করল বোট, তারপর আবার ফিরে এল পাথুরে তীরে। মলির কব্জি ধরে লাফ দিল মুরল্যান্ড, দু'জন একসঙ্গে পড়ল ডেক হাউসের ছাদে। ছাদ থেকে নামার সময় মলি চিৎকার করে জানতে চাইল, 'পাল কি এখুনি তুলব, রানা?'

'আরেকটু পরে,' ককপিট থেকে রানার জবাব ভেসে এল। 'বাতাসের মতিগতি বোঝার জন্যে দ্বীপের উল্টো দিকে যাচ্ছি আমরা, ওখানে সাগর এদিকের চেয়ে শান্ত।'

মুরল্যান্ডের সাহায্য নিয়ে ডেক হাউস থেকে নেমে ককপিটে ঢুকল মলি। চুপচাপ বসে থাকল ওরা, রানার বোট চালানো দেখছে।

চ্যানেল পেরিয়ে এসে খোলা সাগরে পড়ল বোট। সঙ্গে সঙ্গে উদয় হলো একদল হাঙর। আধ ঘণ্টা পর রানা বলল, 'ঠিক আছে, এবার পাল তোলা যেতে পারে।'

পাল তোলার পর বোটের গতি অনেক বেড়ে গেল। বাতাস ওদের অনুকূলে। যাত্রার শুরুটা শুভই বলতে হবে।

হাওয়াই দ্বীপ, লীনাই। ভোর চারটের সময় অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ফোন পেলেন জর্জ রেডক্লিফ। 'ডিশ খুলতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, অ্যাডমিরাল,' বললেন রেডক্লিফ। 'আর পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পেগাশাসে তুলতে পারব ডিশ।'

'পেগাশাস?'

'পেগাশাস হলো ছোট একটা ইন্টারআইল্যান্ড ফ্রেটার, অ্যান্টেনাটাকে পার্ল হারবারে নিয়ে যাবার জন্যে চার্টার করেছি।'

'পার্ল হারবারের কথা ভুলে যান,' বললেন অ্যাডমিরাল। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রুজভেল্টকে ধার হিসেবে পাবার সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। 'মনে রাখবেন, হাতে সময় খুব কম-খুব বেশি হলে আর মাত্র একশো বিশ ঘণ্টা।'

'পার্ল হারবারের কথা ভুলে যাব?' রেডক্লিফ বিস্মিত। 'তাহলে কোথায় নিয়ে যাব অ্যান্টেনা?'

'হালাওয়া বে-র দিকে কোর্স সেট করুন, মলোকাই হারবারে পৌঁছুতে হবে,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'রিফ্লেক্টর বসানোর জন্যে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করেছি আমি।'

'অন্য একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, অ্যাডমিরাল?'

'না, তারচেয়েও ভাল কিছু।'

'চ্যানেলের ওপারে হালাওয়াবে একশো কিলোমিটার দূরেও নয়। এ আপনি কিভাবে ম্যানেজ করলেন?'

'চেষ্টা থাকলে উপায় হয়।'

'আপনি হেঁয়ালি করছেন, অ্যাডমিরাল,' সকৌতুকে অভিযোগ করলেন রেডক্লিফ।

'আমি চাই অ্যান্টেনা নিয়ে কাল সকাল দশটার মধ্যে ওখানে আপনি পৌঁছুবেন।'

'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল,' বললেন রেডক্লিফ, তারপর উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলেন, 'ওদের কোন খবর, অ্যাডমিরাল? নুমার জাহাজগুলো কোনও রিপোর্ট দিল?'

কাদের খবর জিজ্ঞেস করছেন রেডক্লিফ, অ্যাডমিরাল তা জানেন। 'না, কোন খবর নেই তবে সার্চ পুরোদমে চলছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার জাহাজ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না বলে দেয়ার আগেই রানা এজেন্সি চার্টার করা তিনটে জাহাজ পাঠিয়েছে নিউজিল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে। গোটা এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ওরা জাহাজগুলোর সঙ্গে দুটো কপ্টারও আছে।'

'সার্চ পার্টিগুলোকে একটু বলা দরকার যে তারা যেন নিমবাস দ্বীপের আশপাশেও খোঁজ করে।'

'কেন, তা কেন বলা দরকার?'

'মি. রানা ও মুরল্যান্ডের সঙ্গে মলি বুমার আছেন,' বললেন রেডক্লিফ। 'ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেলে, আমার ধারণা, নিমবাস দ্বীপে ওঠার চেষ্টা করবেন ওঁরা। মলি বুমারের যমজ বাচ্চা দুটোকে আটকে রাখা হয়েছে ওই দ্বীপে–মি. রানাকে আমরা যতটা চিনি, তিনি যদি ওদেরকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে চান, আপনি কি খুব অবাক হবেন, অ্যাডমিরাল? তাছাড়া, মি. রানা এ-ও জানেন যে রডনি বুমারের খনিগুলোয় বাংলাদেশী শ্রমিকদের বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

'তাই তো,' বললেন অ্যাডমিরাল, হঠাৎ উৎসাহ বোধ করছেন। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে আমি এখুনি স্যাটেলাইট ফোনে রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করছি ধন্যবাদ, রেডক্লিফ এই সুযোগে সাউন্ড ওয়েভ ফিরে যাবার বিপদটা সম্পর্কেও ওদেরকে আমি সাবধান করে দিই রেড় স্যান্ড, গুডউইল আর নিমবাস দ্বীপের খনি শ্রমিকদের উদ্ধার করার চেষ্টা করুক।'

চাঁদ নেই, তবে তারা জ্বলা আকাশের নিচে নীল-সবুজ ফসফরাস গোটা সাগরকে শিখার মত উজ্জ্বল করে রেখেছে, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত। বাতাসের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম দিকে ভেসে চলেছে ওদের বোট, ঢেউ আর স্রোতের ওপর নাচতে নাচতে। সবুজ আর হলুদ ডেকবন কাপড়ের পাল উলকি আঁকা স্তনের মত ফুলে আছে। বোটটা যে এত সাবলীল ছুটতে পারবে, কেউই ওরা ধারণা করতে পারেনি।

মলি আর মুরল্যান্ড এখন আর ভাবছে না যে তারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করছে। মাঝে-মধ্যেই হাসতে পারছে ওরা, পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়ও পাচ্ছে দু'জনেই উপলব্ধি করছে, রানার প্রতি তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তবে কি করেছে রানা জিজ্ঞেস করলে দু'জনের কেউই সম্ভবত ব্যাখ্যা করতে পারবে না। দিনের পর দিন সাগরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে ওদেরকে, কেয়ামতের প্রচণ্ডতা নিয়ে গ্রাস করতে ছুটে এসেছে ঝড় আর জলোচ্ছ্বাস, বোট ফুটো হয়ে গেছে, ঘিরে ধরেছে হাঙরের দল, ক্ষুৎ-পিপাসায় মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল সবাই, এক ফোঁটা পানির অভাবে ফেটে যাচ্ছিল ছাতি, কিন্তু কখনোই হতাশ হতে দেখা যায়নি রানাকে। কোন না কোন কাজ দিয়ে ব্যস্ত রেখেছে ওদেরকে, নিজেও বসে থাকেনি

প্রয়োজনে ধমক দিয়েছে, হাসাবার চেষ্টা করেছে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে, লক্ষ রেখেছে কার শারীরিক সামর্থ্য ফুরিয়ে আসছে। এত দিকে যে খেয়াল রাখতে পারে, তার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা না জন্মে পারে না। এ-সব রানা খুব একটা সচেতন ভাবে করেনি, এটা ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলতে হবে, স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ।

মলি যখন বুঝতে পারল যে রানাকে সে ভালবেসে ফেলছে, তার স্বাধীনচেতা মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চেয়েছিল। তবে বিদ্রোহ দমন করার প্রয়োজন হয়নি, মন নিজেই আত্মসমর্পণ করে মলি আবিষ্কার করে, রানার প্রতিটি নড়াচড়া লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা চোখ দুটোর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ইয়র্কের চার্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে রানা, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে মলি এক সময় ওর বাহু স্পর্শ করল সে, নরম গলায় জানতে চাইল, 'আমরা এখন কোথায়, রানা?'

'ভোরের আলো ফুটুক, নিমবাস কত দূরে বলতে পারব।'

'তুমি বিশ্রাম নিচ্ছ না কেন? রওনা হবার পর দু'ঘণ্টাও তো ঘুমাওনি।'

আধো অন্ধকারে কম্পাসের দিকে তাকাল রানা। 'যতক্ষণ পারছি জেগে আছি।'

'মুরল্যান্ডও ঘুমাচ্ছেন না,' ইঙ্গিতে মুরল্যান্ডকে দেখাল মলি, লগগুলোর মাঝখানে ফিট করা রাবার টিউবগুলো পরীক্ষা করছে সে।

'কোর্স যদি ঠিক রাখতে পারি,' বলল রানা, 'পরশু ভোরের দিকে তোমার দ্বীপ দেখতে পাবে।'

তারার মেলায় আলোকিত আকাশের দিকে তাকাল মলি 'দেখেছ, স্বর্গ কেমন অপরূপ সাজে সেজেছে?'

'আমার পরিচিত এক মেয়ের মত,' বলল রানা, কম্পাস থেকে চোখ তুলে মলির দিকে তাকাল। 'দু'ফোঁটা কফির মত চোখের মণি, চুল যেন স্বর্ণমুদ্রার শাওয়ার, চেহারা থেকে সোনালি আভা বেরোয়। মেয়েটা শান্ত ও লক্ষ্মী, স্বাধীনচেতা আর বুদ্ধিমতী, তার জন্মই হয়েছে ভালবাসা পাবার জন্যে।'

'শুনে তার সম্পর্কে ভীষণ আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

'এখনও তো সব কথা বলিনি। গোটা সৌরজগতে তার বাবার মত ধনী লোক খুব কমই আছেন

পিঠ ধনুকের মত বাঁকা করল মলি, রানার গায়ে গা ঘষল, কঠিন ভাবটুকু অনুভব করছে তারপর রানার চিবুকে ঠোঁট বুলাল তুমি তাহলে তার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছ, কি বলো?'

'ভক্ত হয়ে পড়েছি মানে? সে আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছে। আর ফেলবেই বা না কেন, প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় সেই তো একমাত্র মেয়ে।'

'কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় তো একমাত্র মেয়ে আমি

মলির কপালে মৃদু চুমো খেলো রানা। 'তাহলে তোমার পবিত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল আমার গোপন ফ্যান্টাসীগুলো পূরণ করা

'আমরা একা হলে কি করা যায় দেখতাম,' ফিসফিস করল মলি। 'আপাতত মহাশয়কে ভুগতে হবে।'

'মুরল্যান্ডকে আমি হেঁটে আসতে বলতে পারি,' বলল রানা, নিঃশব্দে হাসছে

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মলিও হাসল। 'তুমি বললে হয়তো লাফ দিয়ে হাঙরের পেটে চলে যাবেন মুরল্যান্ড, কিন্তু সেটা আমরা কেউই চাই না।' তার স্বাধীনচেতা মন রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কোন রকম আপত্তি তুলছে না, উপলব্ধি করে পুলকিত হলো মলি। 'তুমি বিশেষ এক ধরনের মানুষ,' ফিসফিস করল সে। 'তোমার মত পুরুষকে পাবার জন্যে সব মেয়েই কাঙাল হয়ে ওঠে।'

হেসে উঠল রানা। 'না, কথাটা ঠিক নয়। ভাল লেগেছে এমন অনেক মেয়েকে আমি পাইনি।'

'সেটা হয়তো এইজন্যে যে তোমাকে তারা নাগালের বাইরে বলে মনে করেছে।'

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমিও তো বিশেষ এক ধরনের মেয়ে। সব পুরুষই তোমাকে পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠবে।'

মাথা নাড়ল মলি। 'লাভ নেই। সাগর আর সাগরে যারা বাস করে, আমি তাদের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছি।'

'কারুরই কোন আশা নেই, বলতে চাও?'

'সত্যি নেই।'

'আমার?' ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা।

'তুমি অনন্য পুরুষ, তোমার কথা আলাদা।'

ডেক হাউস থেকে বেরিয়ে এসে মুহূর্তটি নষ্ট করে দিল মুরল্যান্ড 'পাম্পটা দাও তো হে,' রানাকে বলল সে। 'একটা বয়ান্সি টিউব থেকে বাতাস বেরুচ্ছে। লিকটা খুঁজে পেলে মেরামত করতে পারতাম।' পাম্পটা নিয়ে চলে যাবে, তার আগে কালো দিগন্তের দিকে চোখ বুলাল, তারাগুলো যেখানে সাগরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। 'পোর্টসাইডে ওটা আমি কিসের আলো দেখছি?'

পোর্ট সাইডে তাকাতেই একটা সবুজ আলো দেখতে পেল রানা সবুজ আলো জাহাজের স্টারবোর্ড সাইডে জ্বালা হয়। মাস্তুলের মাথায়ও একটা আলো জ্বলছে, সেটা সাদা। অনেকটা দূরে জাহাজটা, উত্তর-পুব দিকে সরে যাচ্ছে। 'জাহাজই,' নিশ্চিত হয়ে বলল রানা। 'প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে।'

'ওরা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না,' ব্যাকুল স্বরে বলল মলি। 'আমাদের তো কোন আলো নেই।'

ডেকহাউসে নেমে গেল মুরল্যান্ড, পাঁচ সেকেন্ড পর ফিরে এল। 'ইয়র্কের শেষ ফ্লেয়ার,' হাত উঁচু করে দেখাল জিনিসটা।

মলির দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কি উদ্ধার পেতে চাও?'

কালো স্রোতের দিকে তাকাল মলি, বোটের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মাথা নাড়ল সে। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার আমি কেউ নই।'

'ববি, তুমি কি বলো? সুস্বাদু খাবার, বিয়ার, নরম বিছানা–লোভ হচ্ছে?'

দাঁত বের করে হাসল মুরল্যান্ড। 'প্রতিশোধ নেয়ার লোভটাই জোরাল মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'পাউলা আর হল্টকে সামনে পেতে চাই।'

মলির কাঁধটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। 'আমি তোমার দলে।'

'আর মাত্র দু'দিন,' কৃতজ্ঞ চিত্তে বিড়বিড় করল মলি। 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে

না আর মাত্র দু'দিন পর আমি আমার বাচ্চাদের দেখতে পাব।'

এক মুহূর্ত কিছু বলল না রানা, সামনের অজানা বাধাগুলোর কথা ভাবছে তারপর নরম সুরে বলল, 'তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে। বুকে জড়িয়ে আদর করবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মলি '

জাহাজটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্তে।

ছয়

হালাওয়াবে; মলোকাই হারবার। বিচ্ছিন্ন অ্যান্টেনা নিয়ে বন্দরে ঢুকছে ইন্টারআইল্যান্ড কার্গো শিপ ক্রুরা সবাই রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কি দেখছে তারা, সহজে জবাব দিতে পারবে না। বন্দরে নোঙর ফেলা অদ্ভুত একটা ভেসেল ওটা জাহাজই বলতে হবে, তবে কি ধরনের জাহাজ? দুশো আটাশ মিটার লম্বা ওটা, ঘন জঙ্গলের মত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ক্রেন, খোলের মাঝখানে তেইশ তলা উঁচু ডেরিক, দেখে মনে হবে একদল মাতাল এঞ্জিনিয়ার এটার ডিজাইন করেছে।

জাহাজটার পিছন দিকে, চৌকো একটা কাঠামোর ওপর প্রশস্ত হেলিপ্যাড ঝুলে আছে, বোঝাই যায় যে নতুন সংযোজন। খোলের সামনের অংশে উঁচু ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচার, অয়েল ট্যাঙ্কারে যেমন থাকে। খোলের মাঝখানটায় অসংখ্য ক্রেন তো আছেই, আরও আছে বিচিত্র আকৃতির বহু মেশিনারি, কোন কোনটাকে বাতিল লোহা-লক্কড়ের স্তূপ বলে মনে হচ্ছে। ঝুলন্ত মাচা, ইস্পাতের মই আর সিঁড়ি, ডেরিক পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া পাইপ, সংখ্যায় এ-সব এত বেশি আর এত কাছাকাছি যেন দাঙ্গা বেধে গেছে। ডেরিকটা আকাশ ছুঁয়েছে, রকেট নিক্ষেপক মঞ্চের মত দেখতে। ফো'ক্যাসলের উঁচু হাউসটায় কোন পোর্ট নেই, সামনের দিকে শুধু এক সারি স্কাইলাইট সদৃশ জানালা। রঙ কবেই ম্লান হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও মরচে ধরেছে। খোলটা মেরিন ব্লু রঙের, তবে সুপারস্ট্রাকচার সাদা। সমস্ত মেশিনারি এককালে রঙ করা হয়েছিল—খয়েরি, হলুদ আর কমলা।

'এ জিনিস চাক্ষুষ করা একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা বটে,' অবাক বিস্ময়ে বিড়বিড় করলেন রেডক্লিফ

ব্রিজ উইং-এ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের একজন উপদেষ্টা, শেলি মারভিন। 'ওহ্ গড! অ্যাডমিরাল ডীপ ফ্যাদম যোগাড় করলেন কোথেকে?' চোখ দুটো কপালে উঠে আছে।

হুইলহাউসের দরজা থেকে উঁকি দিলেন পেগাসাসের ক্যাপটেন। 'কমান্ডার রেডক্লিফ, শিপ-টু-শিপ ফোনে অ্যাডমিরাল।'

হুইলহাউসে ঢুকে ফোনের রিসিভার ধরলেন রেডক্লিফ। 'আপনি এক ঘণ্টা দেরি করে পৌঁছুলেন।' অ্যাডমিরালের গলা পেলেন তিনি।

'সরি, অ্যাডমিরাল। অ্যান্টেনাটা মেরামত করতে হয়েছে। আবার জোড়া লাগাবার সময় ঝামেলা কম হবে।'

'আ· স্মার্ট মুভ,' প্রশংসা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আপনার ক্যাপটেনকে বলুন আমাদের পাশেই যেন নোঙর ফেলেন অ্যান্টেনা সেকশন তুলে আনতে সুবিধে হবে।'

'অ্যাডমিরাল, এটা কি সেই বিখ্যাত ডীপ ফ্যাদম?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'সেটাই, তবে কিছু অদলবদল করা হয়েছে। একটা লঞ্চ নিয়ে চলে আসুন না। শেলি মারভিনকেও সঙ্গে করে আনুন।'

'জ্বী, আসছি।'

সি.আই.এ.-র অনুরোধে ডেল্টা মেরিন নামে একটা বেসরকারী জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ডীপ ফ্যাদম তৈরি করেছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে। রিসার্চ ভেসেল হিসেবেই তৈরি করা হয়, তবে কাজে লাগে উদ্ধারকারী জাহাজ হিসেবে আসলে ডুবিয়ে দেয়ার পর বিদেশী জাহাজ উদ্ধার করাই ছিল আসল কাজ। ডীপ ফ্যাদম সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল, কিন্তু জাহাজটা নিজেই নিজের পরিচয় ফাঁস করে দেয়–প্রশান্ত মহাসাগরের পাঁচ কিলোমিটার গভীরতা থেকে রাশিয়ার একটা গলফ-ক্লাস সাবমেরিন তুলে এনে সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যায়, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে জাহাজটা। মার্কিন সরকার মুখে যা-ই বলুক, সাবমেরিনের প্রতিটি পার্টস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নৌ-বাহিনীর এঞ্জিনিয়াররা। রাশিয়ানদের সাবমেরিন টেকনলজি সম্পর্কে যা জানবার সবই তারা জেনে নেয়।

বিখ্যাত হবার পর ডীপ ফ্যাদমকে কি কাজে লাগানো যায় কেউ তা বুঝতে পারেনি। সি.আই.এ. ওটা সরকারকে দান করে, সরকার দান করে নেভিকে, নেভি মথবল প্রোগ্রামের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। সেই থেকে সানফ্রান্সিসকোর উত্তর-পুবে সুইসান বে-তে পড়েছিল ডীপ ফ্যাদম।

প্রকাণ্ড ভেসেলের ডেকে পা দেয়ার পর জর্জ রেডক্লিফ আর শেলি মারভিনের মনে হলো তাঁরা একটা ইলেকট্রিক জেনারেটিং প্ল্যান্ট-এর মাঝখানে রয়েছেন। কাছ থেকে মেশিনারির সংখ্যা আর আকৃতি রীতিমত শ্বাসরুদ্ধকর বোর্ডিং র‍্যাম্পের মাথায় একা শুধু জাহাজের সেকেন্ড অফিসারের দেখা পাওয়া গেল।

'কোন সিকিউরিটি গার্ড দেখছি না যে?' জিজ্ঞেস করলেন শেলি মারভিন। প্রথম যাত্রার সময় জাহাজটায় কয়েকশো গার্ড ছিল বলে শুনেছেন তিনি।

'তলা থেকে বিদেশী কোন জাহাজ চুরি করছি না,' হাসিমুখে বললেন সেকেন্ড অফিসার, পথ দেখিয়ে এক ডেক নিচের হুইলহাউসে নিয়ে যাচ্ছেন ওদেরকে, 'তাই সিকিউরিটি গার্ডের কোন প্রয়োজন নেই। এটা একটা কমার্শিয়াল অপারেশন'

'আমি জানতাম ডীপ ফ্যাদমকে মথবলে ফেলা হয়েছে,' বললেন রেডক্লিফ

'পাঁচ মাস আগে পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই ছিল,' বললেন সেকেন্ড অফিসার। 'তারপর গ্লোবাল এঞ্জিনিয়ারিং লীজ নিয়েছে, হাওয়াই দ্বীপের দুশো কিলোমিটার দক্ষিণ থেকে কপার আর ম্যাঙ্গেনিজ তুলবে। মেরামতের কাজ চলছিল, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন নুমার তরফ থেকে চার্টার করলেন।'

স্টেটরুমের দরজা খুললেন অফিসার শেলি মারভিনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন রেডক্লিফ ওদের দেখে এগিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন 'আপনাদের

দু'জনকেই ধন্যবাদ,' বললেন তিনি। 'আমি জানি, অ্যান্টেনাটা খুলতে খুব ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।'

'এঞ্জিনিয়ারদের আগে কখনও এরকম নীল হতে দেখিনি আমি,' নুমার উপদেষ্টা বললেন 'প্রতিপক্ষ ছিল মরচে।'

'এই অ্যান্টেনায় কাজ হবে তো?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'খেপে গিয়ে সাগর যদি জয়েন্টগুলো আলগা করে না ফেলে,' জবাব দিলেন রেডক্লিফ, 'কাজ না হবার কোন কারণ নেই।'

ছোটখাট এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'ক্যাপটেন জেমস ফাউলসন...'

'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড,' ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ফাউলসন। 'সব মিলিয়ে আপনারা কতজন থাকবেন জাহাজে?'

'আমাদের দু'জনকে নিয়ে,' বললেন রেডক্লিফ, 'একত্রিশজন পুরুষ আর পাঁচজন মেয়ে কোন অসুবিধে হবে কি?'

'মোটেও না খালি কোয়ার্টারগুলোয় একশোজনকে থাকতে দেয়া যায় খাবারদাবারও আছে মাস দুই চলার মত।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ক্যাপটেন। 'যাই, ক্রেন অপারেটরদের এক জায়গায় জড়ো করি। ওদেরকে ব্রিফ করতে হবে। আপনাদের জাহাজ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যান্টেনা নিয়ে আসতে চাই আমি।' স্টেটরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তাঁর পিছু নিলেন রেডক্লিফ। 'আমিও পেগাসাসে ফিরে যাই, ওখান থেকে তদারক করি কাজটা।'

দু'ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টেনা স্থানান্তরের কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপরই হারবার ছেড়ে রওনা হলো ডীপ ফ্যাদম, গন্তব্য ফিজি দ্বীপপুঞ্জের শুভা আইল্যান্ড।

ফাউলসন বললেন, 'ওহ্-এইট হানড্রেড আওয়ারে মিলিত হবে আপনাদের সাউন্ড ওয়েভ?' মনে মনে একটা হিসাব করলেন তিনি। 'দেখা যাচ্ছে শুভায় আমরা পৌঁছুব ওহ্-এইট আওয়ারের অল্প কিছুক্ষণ আগে। মার্জিনটা ক্ষুরের ফলার মত। চীফ এঞ্জিনিয়ার কি বলেন?'

চীফ এঞ্জিনিয়ার বিল ট্যানার নার্ভাস হাসি হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না সময় মতই পৌঁছুব।'

রেডক্লিফের মুখ ঝুলে পড়ল 'আশা করি সবাই আমরা জানি যে ওই এলাকায় পৌঁছুবার পর যদি কনভারজেন্স আঘাত করে, প্রত্যেকে আমরা মারা যেতে পারি।'

একে একে সবার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তারপর বিড়বিড় করলেন, 'হ্যাঁ, সবাইকেই আমি ব্যাপারটা জানিয়েছি।'

মাঝরাতের খানিক পর নক্ষত্র দেখে চাঁদের আলোয় চার্টের ওপর নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করল রানা ওর হিসেব যদি ভুল না হয়, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিমবাস দ্বীপ দেখতে পাবে ওরা। মুরল্যান্ড আর মলিকে সামনের দিকে নজর রাখতে বলে একা ঘুমিয়ে পড়ল ও, এক ঘণ্টা পর উঠবে।

মনে হলো এইমাত্র চোখ বুজেছে, গায়ে ধাক্কা দিল মলি উত্তেজিত গলায়

বলল, 'দ্বীপ! দ্বীপ!'

'কংগ্রাচুলেশন্স, রানা!' রানার উরুতে একটা চাপড় মারল মুরল্যান্ড। 'আ বিউটিফুল জব অভ নেভিগেশন!'

সামনে তাকিয়ে সাগরে প্রতিফলিত তারা আর চাঁদ ছাড়া আর কিছুই রানা দেখতে পাচ্ছে না। বলতে যাবে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এই সময় পশ্চিম দিগন্তে আলোর একটা টানেলকে একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যেতে দেখল ও, আলোটাকে অনুসরণ করছে উজ্জ্বল লাল একটা আভা। 'তোমাদের দ্বীপে বীকন আছে?' মলিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'দক্ষিণ আগ্নেয়গিরির কিনারায় ছোট একটা লাইটহাউস।'

'যাক, তোমাদের পরিবারও তাহলে মানুষের দু'একটা উপকার করে।'

হেসে উঠল মলি। 'আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না। ওটা তিনি বানিয়েছিলেন পথ হারানো জাহাজকে সাবধান করার জন্যে, নাবিকরা যাতে নিমবাসের কাছাকাছি না আসে।'

'নিমবাসের তীরে নিশ্চয়ই অনেক জাহাজ ধাক্কা খেয়েছে?'

নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল মলি। 'ছোটবেলায় ড্যাডিকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, "আজ আরেকটা জাহাজ ভাঙল"।'

'সারভাইভারদের কথা বলতেন না?'

মাথা নাড়ল মলি। 'না। জাহাজডুবির ঘটনা ঘটলে স্বভাবতই নাবিকদের উদ্ধার করার প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু ড্যাডি এ বিষয়ে কখনোই কোন সিরিয়াস আলোচনা করতেন না। উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই করা হত না। তবে কৌতুক করতেন ড্যাডি, বলতেন—আমন্ত্রণ ছাড়া নিমবাসে কেউ পা রাখলে তার সঙ্গে শয়তানের দেখা হবেই।'

'মানে?'

'মানে, গুরুতর আহত লোকজনকে মেরে ফেলা হত। সুস্থ-সমর্থ লোকগুলোকে খনিতে পাঠানো হত কাজ করতে, ওখানেই মারা যেত তারা। এই নির্মম নৃশংসতার কথা বলার জন্যে নিমবাস থেকে কেউ কখনও পালাতে পারেনি।'

'তুমি পালিয়েছিলে।'

'তাতে বেচারি মাইনারদের কোনই উপকার হয়নি,' ম্লান মুখে বলল মলি। 'পরিবারের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই কেউ গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। পরিস্থিতিটা কর্তৃপক্ষকে যখন ব্যাখ্যা করলাম, ড্যাডি টাকা খাইয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিলেন।'

'চীনা আর বাঙালী মাইনারদের মধ্যে কেউ পালাতে পারেনি?'

থমথমে হয়ে উঠল মলির চেহারা। 'একজনও না। সাধারণ লেবার সবাইকে নিমবাসে মারা যেতে হয়। লোয়ার মাইন পিট-এর তলায় প্রচণ্ড উত্তাপ।'

'উত্তাপ? মানে? উত্তাপ আসবে কোত্থেকে?' রানাকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

'পাথরের ফাটল থেকে গরম বাষ্প বেরোয়।'

মুরল্যান্ড বলল, 'স্বাভাবিক। খনিগুলো তো আগ্নেয়গিরির ভেতরে।'

রানার দিকে তাকাল মলি। 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি ড্যাডির সিকিউরিটি

গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে আমরা তীরে পৌঁছুব।'

'যে পাহাড়-প্রাচীর নিমবাসকে ঘিরে রেখেছে, তার একটা বর্ণনা দাও আমাকে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মলি, তারপর বলল, 'বলার তেমন কিছু নেই। লেগুনের দিকটা ছাড়া বাকি সব দিকে আকাশ ছোঁয়া পাঁচিল পাবে তুমি। পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড সব ঢেউ অনবরত আছাড় খাচ্ছে। পুবদিক একটু শান্ত, তারপরও বিপজ্জনক '

'পুবদিকে ছোটখাট কোন ইনলেট নেই, খুদে সৈকত সহ? কিংবা প্রাচীরের গায়ে অকৃত্রিম পাথুরে চিমনি?'

'আছে। দুটোর কথা মনে পড়ছে। প্রথমটা ঢোকার পথ হিসেবে মন্দ নয়, বালির খুদে একটা বিস্তৃতিও আছে। দ্বিতীয়টা আরও সরু, তবে বালির বিস্তৃতিটুকু একটু বেশি চওড়া। দুটোর কোনটাই আমাদের কাজে লাগবে না। কারণ ওগুলোর ব্লাফ একদম খাড়াভাবে একশো ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। রাতের অন্ধকারে প্রফেশন্যাল একজন রক ক্লাইমবার লেটেস্ট টেকনিক আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে চেষ্টা করলেও ওপরে উঠতে ব্যর্থ হবে।'

'চওড়া সৈকত সহ সরু ওই চ্যানেলে তুমি আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে? মানে, পথ দেখাতে পারবে?'

'আমি কি বলছি বোঝোনি?' মলিকে বিরক্ত দেখাল। 'এরচেয়ে অনেক সহজ আইস পিক নিয়ে এভারেস্টে চড়া। আর তাছাড়া, সিকিউরিটি গার্ড আছে। প্রতি ঘণ্টায় ব্লাফগুলোয় টহল দেয় তারা।'

'রাতের বেলাও?'

'ডায়মন্ড স্মাগলারদের কোন সুযোগই ড্যাডি দেয় না।'

'ক'জন টহল দেয়?'

'দু'জন লোক, পালা শুরু হলে পুরো দ্বীপটা চক্কর দেয়। ওদের পিছু পিছু আরেক দল আসে প্রতি ঘণ্টায়।'

'ব্লাফের কিনারা থেকে নিচের সৈকত কি দেখতে পায় তারা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। পাহাড়-প্রাচীর এত খাড়া, সরাসরি নিচে তাকানো সম্ভব নয়।' রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মলি, চাঁদের আলোয় ওর চোখ দুটো বিশাল দেখাচ্ছে। 'নিমবাসের পিছন দিক সম্পর্কে এত কথা জেনে কি লাভ তোমার? লেগুন ছাড়া তীরে ভেড়া সম্ভব নয়।'

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'আমার ওপর মলির কোনও আস্থা নেই।'

'কেন, তুমি জানো না, মেয়েরা মুখের কথার কোন দাম দেয় না?' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'ওদেরকে করে দেখাতে হয়।'

দ্বীপ নয়, যেন আকাশ ছোঁয়া পাথরের একটা স্তূপ। কারও মুখে কথা নেই, আধখানা চাঁদের আলোয় সবাই নিমবাসের দিকে তাকিয়ে। মলি শুয়ে আছে বো-তে। রানা ইঙ্গিত করলেই আউটবোর্ড মোটরটা স্টার্ট দেবে মুরল্যান্ড, তৈরি হয়ে আছে সে।

নিমবাসের শেষ প্রান্ত ঘুরে পিছন দিকে চলে এসেছে ওদের বোট, আগ্নেয়গিরির পিঠ আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে লাইটহাউসের সচল আলো থেকে। ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা, 'ইনলেটটা কত দূরে, মলি?'

'আমি যতটুকু জানি, লাইটহাউস থেকে এক কিলোমিটার দূরে,' জবাব দিল মলি।

তীররেখা ধরে পুব থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছে বোট, কোর্স ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা হাত তুলে সঙ্কেত দিল ও, সঙ্গে সঙ্গে আউটবোর্ড মোটর স্টার্ট দিল মুরল্যান্ড পাল নামিয়ে নিল রানা, ডেকহাউস থেকে ঘুড়িটা বের করল। বোটের ডেকে সরু এক প্রস্থ লাইনের কুণ্ডলী তৈরি করা হলো। লাইনের যেখানে ঘুড়িটা বাঁধা হয়েছে তার খানিক নিচে ছোট গ্র্যাপলিং হুকটা আটকাল রানা।

বো থেকে মলি বলল, 'সরাসরি পঞ্চাশ মিটার সামনে পাথরের একটা টাওয়ার

'টার্নিং টু পোর্ট,' রিপোর্ট করল মুরল্যান্ড, তীরের দিকে বিশ ডিগ্রী বো ঘোরাল। সারফেসের ওপর জেগে থাকা কালো কয়েকটা পাথরের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে, ওগুলোর চারধারে আলোড়িত হচ্ছে সাদা পানি।

'মলি, এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছ না?' জানতে চাইল রানা।

'নিশ্চিত হওয়া কঠিন,' বলল মলি 'রাতে কখনও ইনলেট খুঁজতে হয়নি আমাকে।'

ঢেউগুলোর ওপর নজর রাখছে রানা। প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি খাড়া হচ্ছে ওগুলো আসছেও ঘন ঘন। 'সাগরের তলা উঠে আসছে। আর বেশি হলে ত্রিশ মিটার এগোতে পারব

'সবুর' মলিকে উত্তেজিত মনে হলো 'পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা বিরতি দেখলাম বলে মনে হলো। সম্ভবত ওটাই সেই ইনলেট—চওড়া সৈকতে পৌঁছেছে।'

'কত দূরে?' জানতে চাইল রানা

'ষাট, কি সত্তর মিটার।' হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে হাত তুলল মলি।

এবার রানাও দেখতে পেল। উঁচু পাথরের টাওয়ারের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে, সেইখানে কালো একটা ছায়া নিচে থেকে উঠে গেছে চূড়া পর্যন্ত, ওই ছায়াটাই ইনলেট মুরল্যান্ডের দিকে ফিরল 'ববি, ইনলেটের মুখ থেকে বিশ মিটার দূরে মিনিট দশেকের জন্যে বোট সিধে করে রাখতে পারবে?'

'কঠিন হবে, ঢেউগুলো যেভাবে ফুলে উঠছে

'চেষ্টা করো,' বলে মলির দিকে ফিরল রানা 'টিলার ধরো তুমি, বো তাক করো সোজা ঢেউয়ের দিকে। আউটবোর্ড সচল রেখে ববিও স্রোতের বিরুদ্ধে স্থির থাকার চেষ্টা করবে, ওর সঙ্গে তাল মেলাতে হবে তোমাকে—বোট যাতে আড়াআড়ি হয়ে না যায়

নিজের তৈরি ঘুড়িটার ভাঁজ খুলল রানা বিস্তৃত করার পর ডেকরন সারফেসের মাপ দাঁড়াল প্রায় আড়াই মিটার উঁচু দু'হাতে ধরে উঁচু করল ওটা বাতাস ওটাকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল শেষ রাতের আকাশে দ্রুত

উঠে যাচ্ছে ঘুড়ি, লাইন ছাড়ছে রানা।

হঠাৎ রানার প্ল্যানটা ধরতে পারল মলি। 'হুক! ব্লাফের মাথায় হুকটা তুমি আটকাতে চাইছ, লাইনটা পাঁচিলে চড়ার কাজে ব্যবহার করবে।'

'তোমার কোন আপত্তি আছে?' ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আছে রানা, অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে বাতাস সাহায্য করছে ওদেরকে পাথুরে পাঁচিলের চূড়ার দিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঘুড়িটাকে লাইনে প্রচণ্ড টান পড়ছে, হাতের তালু জ্যাকেটে জড়িয়ে নিতে হলো। লাইনটা এখন দু'হাতে ধরে আছে রানা, তারপরও মনে হচ্ছে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে হাতদুটো।

ঘুড়ি উঠছে, আর রানার মাথায় একের পর এক দুশ্চিন্তা ঢুকছে। বাতাসের গতিপথ হঠাৎ বদলে গেলে ঘুড়িটা পাহাড়ে লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে। হঠাৎ খুব বড় একটা ঢেউ এসে বোটটাকে আরেক পাশে ঠেলে দিতে পারে। হুকটা পাথরে কোথাও না-ও আটকাতে পারে ব্লাফের মাথায় অকস্মাৎ চলে আসতে পারে সিকিউরিটি গার্ড।

চূড়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল রানা, হুকটা কি ব্লাফের মাথায় পৌঁচেছে? লাইনের একশো মিটারে একটা গিঁট দেয়া আছে, হাত থেকে সেটা বেরিয়ে গেল। আরও বিশ মিটার ছাড়ল রানা, তারপর অনুভব করল লাইন শিথিল হয়ে গেছে। এদিক ওদিক দুলতে শুরু করল ঘুড়ি, তারপর চূড়ার মাথায় পড়ে গেল।

লাইনে কয়েকটা টান দিল রানা, শক্ত হলো সেটা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল একটা। প্রথম চেষ্টাতেই পাথরে আটকেছে হুকটা। 'ইনলেটে ঢুকে পড়ো, ববি,' নির্দেশ দিল ও। 'চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিল মুরল্যান্ড, পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ার গর্তটার ভেতর বোট নিয়ে ঢুকে পড়ল। বোতে ফিরে গিয়ে লুকআউট-এর ভূমিকায় থাকল মলি, মুরল্যান্ডকে পথ নির্দেশ দিচ্ছে। ইনলেটের যত ভেতরে ঢুকছে বোট, পানি ততই গভীর আর শান্ত হয়ে এল। 'সৈকতটা আমি দেখতে পাচ্ছি স্টারবোর্ড আর সামনের দিকে, মাত্র পনেরো মিটার দূরে তাকাও।'

এক মিনিট পর ছোট্ট সৈকতে ভিড়ল বোট মলির দিকে তাকাল রানা। পাহাড়ের চূড়া আড়াল করে রেখেছে চাঁদটাকে, ফলে গাঢ় ছায়ার ভেতর কাঠামোটা অস্পষ্ট দেখাল 'তুমি বাড়ি ফিরে এসেছ,' বলল ও।

পাহাড়ের গায়ে কালো ফাটল, দৃষ্টি দিয়ে সেটাকে অনুসরণ করল মলি। আকাশ আর তারাগুলোও দেখল। 'না, রানা, এটা আমার বাড়ি নয়।'

লাইনটায় জোরে কয়েকটা টান দিল রানা। 'গার্ডরা এসে পড়ার আগেই ওপরে উঠতে হবে আমাদের।'

'আমি আগে উঠব,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমার গায়ে জোর বেশি।'

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।' অন্ধকারে হাসছে রানা।

রানার হাত থেকে নিয়ে মুরল্যান্ডও হ্যাঁচকা টান দিয়ে পরীক্ষা করল লাইনটা। 'আমার মত ভারী একটা বোঝা ধরে রাখতে পারবে তো?'

'ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত জানার কি কোন উপায় আছে?' কৌতুক করল রানা।

'তবে, যদি পড়ো, আমাদের ঘাড়ে পোড়ো না।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল মুরল্যান্ড, পাথরের পাঁচিল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। অন্ধকারে দ্রুত হারিয়ে গেল সে, লাইনের শেষ প্রান্তটা টান টান করে রেখেছে রানা, ঢিল পড়তে দিচ্ছে না। 'বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা দুটো পাথরে বোটটা বেঁধে ফেলো,' মলিকে নির্দেশ দিল ও। 'বোটের দুটো দিকেই বাঁধতে হবে। পালাবার দরকার হলে এই বোটটাই হয়তো পছন্দ করব আমরা।'

রানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল মলি। 'পছন্দ করাকরির সুযোগ তোমার আছে নাকি?'

'নেই মানে? তোমার ড্যাডির একটা ইয়ট বা একটা এয়ারক্রাফট চুরি করা একেবারেই সম্ভব নয় বলতে চাও?'

'এক রেজিমেন্ট সশস্ত্র সৈনিক লাগবে।'

রানা ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

রানার দেখাদেখি পাহাড়-প্রাচীরের ওপর দিকে তাকাল মলি। অন্ধকারে মুরল্যান্ডকে দেখা যাচ্ছে না। তার সচল অস্তিত্ব প্রমাণ করছে লাইনের কাঁপন।

ত্রিশ মিনিট পর দম নেয়ার জন্যে থামল মুরল্যান্ড। বাহু দুটোয় এমন ব্যথা, যেন এক হাজার শয়তান ছোরা মারছে। অমসৃণ আর অসমতল পাথরের কথা মনে রেখে বলতে হবে যে বেশ দ্রুতই উঠে এসেছে সে। লাইন ছাড়া ওঠা সম্ভব হত না। আধুনিক ইকুইপমেন্ট নিয়ে প্রফেশন্যাল রক ক্লাইমবারের এইটুকু উঠতে ছয় ঘণ্টা লাগত

মাত্র এক মিনিট বিশ্রাম নিল মুরল্যান্ড। তারপর আবার রশি ধরে ওপরে ওঠা শুরু হলো। ওভারহ্যাঙগুলোকে যখন পাশ কাটাচ্ছে ও, তখন পাথরে পা বাধিয়ে ব্যাঙের মত লাফাতে হচ্ছে। কোথাও কার্নিস পেলে পা রাখার সুযোগটা ছাড়ছে না। হাতের তালুতে ঘষা খাচ্ছে লাইন, চামড়ায় ফোস্কা পড়ছে আবার থামল সে, মাথার ওপর ছায়া ঢাকা চূড়ার ঠোঁট দেখা যাচ্ছে, তারা ভর্তি আকাশের গায়ে একটা রেখা টেনেছে। আর পাঁচ মিটার, আন্দাজ করল মুরল্যান্ড। দম ফিরে পাবার জন্যে আবার বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে। ওপরে ওঠার পর এরকম শব্দ করে হাঁপাতে থাকলে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু তাড়াতাড়ি চূড়ায় ওঠার একটা তাগিদ অনুভব করল সে। শেষ পাঁচ মিটার দ্রুত পেরিয়ে এল। প্রাচীরের মেঝে অকস্মাৎ উন্মুক্ত হলো তার সামনে। কিনারা থেকে উঠে এল সে, শুয়ে থাকল উপুড় হয়ে, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

তিন মিনিট নড়তে পারল না মুরল্যান্ড। তারপর মাথা তুলে চারপাশটা দেখল সে একটা পথের ওপর পড়ে আছে, পথটা পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে এগিয়েছে। কয়েক কদম সামনে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের একটা পাঁচিল দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার ও ভীতিকর। কোন আলো বা নড়াচড়া নেই দেখে লাইন ধরে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল, পৌঁছে গেল হুকটার কাছে। পরীক্ষা করে দেখল হুকটা বড় একটা পাথরের ভেতর ভালভাবেই সেঁধিয়েছে। দাঁড়াল মুরল্যান্ড, ঘুড়িটা খুলে পথের উল্টোদিকের ঝোপে লুকিয়ে রাখল। ব্লাফের কিনারায় ফিরে এসে লাইনে দু'বার ঝাঁকি দিল সে।

নিচে মলিকে রানা বলল, 'তোমার পালা।'

'এ আমার দ্বারা সম্ভব কিনা জানি না,' বলল মলি। 'বেশি ওপরে উঠতে ভয় করে আমার।'

একটা লূপ বানাল রানা, মলির দুই কাঁধের ওপর দিয়ে কোমরে নামিয়ে এনে শক্ত করে আটকাল। 'লাইনটা শক্ত করে ধরে থাকবে, পাঁচিলের উল্টোদিকে হেলান দেবে, উঠে যাবে হেঁটে। নাগালের মধ্যে পেলে ববি তোমাকে টেনে নেবে।'

পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় দাঁড়িয়েছে মুরল্যান্ড, কিনারার দিকে পিছন ফিরে; লাইনটা কাঁধ ছুঁয়ে নেমে এসেছে হাতে। মলি কম ভারী নয়, ক্লান্ত হয়ে পড়ায় শুধু হাত দিয়ে রশি টেনে তাকে তোলা মুরল্যান্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। কাঁধে লাইন বাধিয়ে হাঁটছে সে, চূড়ার কিনারা থেকে দূরে সরে আসছে। বারো মিনিটের মাথায় কিনারায় পৌঁছুল মলি, পিছিয়ে এসে তাকে ধরে ওপরে তুলে নিল মুরল্যান্ড। লূপটা খুলে নিয়ে বলল, 'আমি রানাকে তুলছি; আপনি পাহারায় থাকুন। উত্তর দিকের পথটা অনেক দূর দেখতে পাবেন, কিন্তু দক্ষিণ দিকে পঞ্চাশ মিটার দূরে পাথরের একটা স্তূপ আছে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে,' বলল মলি। 'ঠিক স্তূপ নয়, পাথরের কয়েকটা পাঁচিল, ভেতরটা ফাঁকা। ছোটবেলায় ওখানে আমি খেলতাম। জায়-গাটাকে দুর্গ বলা হয়, ভেতরে ছোট একটা রেস্ট স্টেশন আছে গার্ডদের জন্যে। টেলিফোনও আছে।'

লাইনটা নিচে নামাচ্ছে মুরল্যান্ড। পরবর্তী পেট্রল এসে পড়ার আগেই রানাকে তুলে আনতে হবে

লাইন পেয়ে নিচে থেকে উঠে আসছে রানা। ওদের দু'জনের চেয়ে দ্রুতই উঠছে ও। কিন্তু কিনারা যখন আর মাত্র দশ মিটার দূরে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও। কেউ ওকে সাবধান করেনি, বা উৎসাহও দেয়নি, শুধু অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা অনুভব করে থেমে গেছে রানা। এর একটাই অর্থ হতে পারে, মুহূর্তটি ওর জন্যে দুঃসময়। নিশ্চয়ই টহলে বেরিয়েছে গার্ডরা, এদিকে তাদেরকে আসতে দেখা গেছে। চূড়ায় কি ঘটছে দেখার উপায় নেই, একটা ফাটল পেয়ে সেটার ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। কান পেতে রাতের আওয়াজ শুনছে।

দুর্গের একটা পাঁচিল ঘুরে আলোটা বেরিয়ে আসতে দেখেছে মলি, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছে মুরল্যান্ডকে। দ্রুত হাতে লাইনটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল মুরল্যান্ড, রানা যাতে সৈকতে নেমে না যায় লাইনের ওপর মাটি আর শুকনো পাতা ছড়াল, কিন্তু হুকটা ঢাকার সময় পেল না।

'রানা যদি এখন ডাক দেয়?' ফিসফিস করল মলি

'আমরা চুপ করে গেছি দেখে সে-ও আওয়াজ করবে না ঠেলে মলিকে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'গার্ডরা যতক্ষণ না চলে যায়, এখান থেকে বেরুবেন না।'

আলোটা এগিয়ে আসছে, বড় হচ্ছে আকারে। মাসের পর মাস এই পথ টহল দিচ্ছে গার্ডরা, কাউকে কোনদিন দেখেনি, কাজেই খুব একটা সতর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু মুরল্যান্ডের পালস লাফিয়ে উঠল, কারণ দেখতে পেল গার্ডরা ধীর পায়ে এগোচ্ছে, প্রতি ইঞ্চি পথ পরীক্ষা করতে করতে। মুরল্যান্ডের জানার কথা নয়; ধরা

পড়া প্রতিটি ডায়মন্ড স্মাগলারের বিচ্ছিন্ন হাতের বিনিময়ে পঁচিশ হাজার ডলার বোনাস দেন রডনি বুমার হাত কেটে নেয়ার পর বাকি শরীরের কি গতি হয়, কেউ তা জানে না এ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। তবে গার্ডরা বোনাসের লোভে পাহারা দেয়ার কাজটায় কোন গাফিলতি করে না।

মুরল্যান্ড আর মলির সরাসরি সামনে গার্ড দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল কিছু একটা দেখতে পেয়েছে তারা। 'আগের পেট্রল এটা দেখেনি কেন? নাকি এক ঘণ্টা আগে এটা এখানে ছিল না?'

'কি জিনিস?' দ্বিতীয় গার্ড জানতে চাইল।

'একটা হুক, সাধারণত বোটে ব্যবহার করা হয়,' পথের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল প্রথম গার্ড। মাটি আর পাতা সরিয়ে লাইনটা বের করে ফেলল সে। 'বারে বা, বারে বা! একটা লাইনও আছে দেখছি, কিনারা থেকে নিচে নেমে গেছে।'

'ব্লাফ হয়ে ওপরে চড়ার ঘটনা তিন বছর আগে একবার ঘটেছিল,' দ্বিতীয় গার্ড বলল। কিনারার খুব একটা কাছে যেতে ভয় পেল সে, টর্চের আলো ফেলে কিছুই দেখতে পেল না

প্রথম গার্ড ছুরি বের করে লাইনটা কাটতে গেল। 'কেউ যদি ওপরে ওঠার জন্যে অপেক্ষায় থাকে, তাকে হতাশ হতে হবে...'

দম আটকে রেখেছে মলি। তার পাশ থেকে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এল মুরল্যান্ড। 'এ কি অভ্যাস, অ্যাঁ? রাতের বেলা ঘুরে বেড়ানো?'

প্রথম গার্ড স্থির হয়ে গেল, হাতে ধরা ছুরির ফলা লাইন ছোঁয় ছোঁয়। দ্বিতীয় গার্ড বন করে আধ পাক ঘুরেই বুশমাস্টার এম-সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেলটা মুরল্যান্ডের দিকে তাক করল। 'নড়বে না। নড়লেই গুলি করব!'

নির্দেশ পালন করল মুরল্যান্ড, তবে পা দুটো টান টান করে লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখল। সাংঘাতিক ভয় পাচ্ছে সে; কারণ জানে ছুরির ফলা লাইনে আঘাত করলেই নিচের সৈকত আর পাথরের ওপর পড়ে যাবে রানা। কিন্তু গার্ডের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, হাতের অস্ত্র নামিয়ে নিল সে

তার সঙ্গী অবাক। 'কি হলো তোমার?' তারপর সে-ও দেখতে পেল।

ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এসে মুরল্যান্ডের পাশে দাঁড়াল মলি, আলোর বৃত্তের মধ্যে ওর চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই, বরং রাগে লালচে হয়ে আছে 'দু'জনেই দেখছি ট্রেনিং ভুলে বসে আছ! অস্ত্র সরাও!' ধমক দিল ও।

টর্চ হাতে গার্ডটা এক পা এগোল, ভাল করে দেখল মলিকে, তারপর বিড়বিড় করল, 'মিস মলি বুমার?'

'চোখে ঠুলি পরেছ নাকি, দেখতে পাও না?'

'কিন্তু...কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে আপনি ডুবে মারা গেছেন

ছেঁড়া ব্লাউজ আর শর্টে কেমন দেখাচ্ছে নিজেকে, আন্দাজ করতে পারল মলি আর যাই হোক, বিলিওনিয়ার ডায়মন্ড টাইকুনের মেয়ে বলে অন্তত মনে হচ্ছে না 'মারা গেলে এখানে আমি এলাম কিভাবে?'

'আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, এই শেষ রাতে এখানে আপনি কি করছেন, মিস মলি?' বিনয়ের সুরেই প্রশ্নটা করল গার্ড, তবে দৃঢ় কণ্ঠে

'আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছি।'

ছুরি ধরা গার্ড ব্যাপারটা মানতে পারছে না। 'মাফ করবেন,' বলল সে, খালি হাত দিয়ে লাইনটা ধরল, বাঁ হাত দিয়ে কাটবে ওটা। 'এখানে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে।'

এগিয়ে এসে রাইফেলধারীর গালে ঠাস করে একটা চড় মারল মলি। কর্তৃত্বের প্রকাশ হতভম্ব করে তুলল গার্ড দু'জনকে, ইতস্তত করছে তারা। প্রতিশোধপরায়ণ কেউটের মত ছোবল মারল মুরল্যান্ড, কাছাকাছি দাঁড়ানো গার্ডের পেটে গুঁতো মারল মাথা দিয়ে। গুঙিয়ে উঠে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ল লোকটা। হোঁচট খেয়ে মুরল্যান্ডও তার ওপর আছাড় খেলো।

একই সঙ্গে মলিও অপর লোকটাকে লক্ষ করে লাফ দিয়েছে। কিন্তু খালি হাতটা সামনে ঠেলে দিয়ে ঠেকাল ওকে গার্ড, ছুরি ফেলে দিয়ে অ্যাসল্ট রাইফেল তুলল মুরল্যান্ডের বুকের দিকে, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল।

মুরল্যান্ড জানে সে মারা যাচ্ছে। ধরাশায়ী অপর গার্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার হাত-পা, আত্মরক্ষার জন্যে কিছুই করতে পারছে না। শরীরটা শক্ত করল সে, মাংসে বুলেট ঢোকার অপেক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু গুলির কোন শব্দ হলো না।

কেউ দেখেনি, ব্লাফের কিনারা থেকে উঠে এসে রাইফেলটা কেড়ে নিল একটা হাত। নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পেল না, কিনারা থেকে নিচের দিকে পতন শুরু হলো গার্ডের। তার চিৎকার ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল।

তারপর চূড়ার কিনারায় আরও একটু উঁচু হলো রানার মাথা, মাটিতে পড়ে থাকা টর্চের আলোয় এখন ওকে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। আলো লাগায় চোখ পিট পিট করছে ও। ধীরে ধীরে বিস্তৃত হলো ঠোঁটের দুই প্রান্ত। হাসছে রানা।

রানাকে জড়িয়ে ধরল মলি। 'একেই বলে সময়জ্ঞান। তুমি আর এক সেকেন্ড দেরি করলে মুরল্যান্ডকে আমরা হারাতাম।'

'তোমার ছোট পপগান কি হলো?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

ব্যাক পকেট থেকে খুদে অটোমেটিকটা বের করে হাতের তালুতে রাখল রানা। 'একটা ফাটলের ভেতর ছিলাম, টর্চের আলো ফেলেও গার্ড আমাকে দেখতে পায়নি। ওখানে এক মিনিট অপেক্ষা করার পর ব্লাফের কিনারায় উঠে উঁকি দিই কি ঘটছে দেখার জন্যে। যখন দেখলাম তুমি গুলি খেতে যাচ্ছ, অস্ত্র বের করে তাক করার সময় ছিল না। কাজেই বিকল্প উপায়টা কাজে লাগালাম।'

'ভাগ্যিস বিকল্প উপায়টা ওর মাথায় আসে,' বলল মলি। 'তা না হলে এখন আপনি এখানে থাকতেন না।'

মুরল্যান্ডের চেহারায় ভাবাবেগের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু বলল, 'এখন থেকে ওই খেলনাটা আমার কাছে থাকবে।' গার্ডের দিকে তাকাল সে, ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে পড়ে আছে মাটিতে, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে পেট। এম-সিক্সটিন তুলে অ্যামনিশন ক্লিপ পরীক্ষা করল মুরল্যান্ড। 'এটা আমাদের কাজে লাগবে।'

'ওকে নিয়ে কি করা হবে?' জানতে চাইল মলি। 'ওর সঙ্গীর মত ওকেও নিচে ফেলে দেব?'

'কোন দরকার নেই,' বলল রানা, কিনারা ঘেষা পথটার দু'দিকে তাকাল। 'ও আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ফেলে রাখি। টহল সেরে ফিরে না গেলে ওর বন্ধুরা খুঁজতে আসবে।'

'পরবর্তী পেট্রল পঞ্চাশ মিনিট পর,' বলল মুরল্যান্ড, লাইনটা টেনে পথের ওপর জড়ো করছে। 'সময় নষ্ট না করে এখুনি রওনা হওয়া দরকার।'

গার্ডকে শক্ত করে বাঁধা হলো, পরনে শুধু আন্ডারঅয়্যার, লাইনে আটকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ব্লাফের কিনারা থেকে দশ মিটার নিচে। ওদেরকে পথ দেখাল মলি, তিনজনের দলটা রওনা হয়ে গেল। খুদে অটোমেটিকটা এখন মুরল্যান্ডের কাছে। রানার পরনে গার্ডের ইউনিফর্ম, হাতে বুশমাস্টার এম-সিক্সটিন। অসহায় বোধ খানিকটা দূর হলেও, রানা জানে মাইনে আর দ্বীপের চারধারে ছড়িয়ে আছে আরও অন্তত একশো গার্ড। কড়া প্রহরাই ওদের একমাত্র সমস্যা নয়। মলির বাচ্চা দুটোকে উদ্ধার করার সমান জরুরী কাজ হলো স্বদেশী এঞ্জিনিয়ার, জিওলজিস্ট আর সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। যদি সম্ভব হয়, তাদেরকে পালাবার একটা পথ করে দিতে হবে। তবে সব কাজের আগের কাজ, নিজেদের পালাবার জন্যে একটা বাহন জোগাড় করা।

পাঁচশো মিটার এগোবার পর একটা হাত তুলে ঘন ঝোপ দেখাল মলি। 'এখান থেকে দ্বীপটাকে আমরা আড়াআড়িভাবে পার হব। ত্রিশ মিটার সামনে একটা পথ বাঁকা হয়ে গেছে, চোখ-কান খোলা রেখে এগোতে পারলে কারও চোখে ধরা না পড়ে সেন্ট্রাল হাউজিং এরিয়ায় পৌঁছে যেতে পারব। কর্মচারীরা সব ওখানেই থাকে।'

'দুই আগ্নেয়গিরির কাছ থেকে কত দূরে রয়েছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুটোর প্রায় মাঝখানে। লেগুনের উল্টোদিকে।'

'তোমার বাচ্চা দুটোকে কোথায় রাখা হয়েছে জানো তুমি?'

'না, জানি না। সম্ভবত জ্যাক টেসটারের সঙ্গে আছে।'

'ট্যুরিস্টের মত ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'একজনকে ধরতে হবে, যে জানে কোথায় রাখা হয়েছে ইকো আর মিরেজকে। সে কে আমি জানি। এখন দ্বীপে সে থাকলেই হয়।'

চুলের কাঁটার মত অনেকগুলো বাঁক নিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা, দ্বীপটাকে দ্বিখণ্ডিত করে বা দ্বীপের মেরুদণ্ড ধরে। কমপাউন্ডটা দূর থেকেই দেখা গেল, মাইনিং এঞ্জিনিয়ার আর সিকিউরিটি গার্ডদের বাসভবন। ঝোপের ভেতর ছায়া পাওয়া গেল, সেই ছায়া ধরে লেবারদের জন্যে তৈরি ডিটেনশন ক্যাম্পটাকে পাশ কাটাল ওরা। ব্যারাক আর খোলা উঠন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে, ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, উঁচু বেড়ার মাথায় বৃত্তাকার রেজার ওয়্যার। গোটা এলাকা এত বেশি ইলেকট্রনিক সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম দিয়ে সুরক্ষিত যে পেরিমিটারের চার ধারে একজন গার্ডকেও হাঁটাচলা করতে দেখা গেল না।

আরও একশো মিটার এগোবার পর থামল মলি, কংক্রিটের একটা রাস্তাকে ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার ইঙ্গিত করল রানা ও মুরল্যান্ডকে। রাস্তার একটা দিক ড্রাইভওয়েতে মিশেছে, সেটা তোরণ.আকৃতির গেট দিয়ে চলে গেছে বুমারের ম্যানর হাউসের দিকে। উল্টোদিকে খানিক দূর যাবার পর দু'ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। চওড়া একটা এভিনিউ ঢাল বেয়ে নেমে গেছে পোর্টে, লেগুনের মাঝখানে। সোডিয়াম ল্যাম্পের হলদেটে আভায় ডক আর ওয়্যারহাউসগুলোকে ভৌতিক লাগছে ডকের পাশে বাঁধা বড় আকারের বোটটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এতটা দূর থেকে রডনি বুমারের বিলাসবহুল ইয়টটাকে চিনতে ভুল হলো না ওর। আপার ডেকে একটা হেলিকপ্টারকে বসে থাকতে দেখে ভারি উৎসাহ বোধ করল।

'দ্বীপে কোন এয়ারস্ট্রিপ আছে?' মলিকে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল মলি। 'তৈরি করতে রাজি হননি ড্যাডি। তাঁর সাগরপথই পছন্দ অস্ট্রেলিয়ান মেইনল্যান্ডে আসা-যাওয়া করার জন্যে হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'পালাবার কি কি পথ আছে জেনে রাখছি। ইয়টের ওপর ওই হেলিকপ্টার কাজে লাগবে।'

'আমরা নাহয় পালালাম,' বলল মলি। 'কিন্তু শ্রমিক আর এঞ্জিনিয়ারদের কি হবে?'

'ওদের ব্যবস্থাও করা হবে,' বলল রানা। 'আমার এজেন্সিকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, অন্তত একটা জাহাজ নিমবাসের আশপাশে নিশ্চয়ই রেখেছে ওরা।'

'তোমার এজেন্সি মানে? যত দূর মনে পড়ছে, তুমি আমাকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলে সরকারী ইনভেস্টিগেটর হিসেবে।'

'আসলে আমি বহুরূপী.' রানার ঠোঁটে সকৌতুক হাসি 'ইয়টটাকে ক'জন গার্ড পাহারা দেয় বলতে পারো?'

'মাত্র একজন, সেই ডকের সিকিউরিটি সিস্টেম মনিটর করে

'ক্রুরা?'

'ইয়ট বাঁধার পর ক্রুদেরকে কোয়ার্টারে থাকতে হয়, ড্যাডির নির্দেশ

রাস্তার আরেক শাখার দিকে তাকাল রানা, বাঁকা হয়ে মেইন কমপাউন্ডের দিকে চলে গেছে। আগ্নেয়গিরির ভেতর খনিগুলো কর্মচাঞ্চল্যে জ্যান্ত হয়ে আছে, কিন্তু বুমার কনসলিডেটেড মাইনিং কমিউনিটির মাঝখানটা একদম খালি পড়ে আছে। ইয়টের পাশে ডকও তাই, কাছাকাছি একটা ওয়্যারহাউসের মাথায় বসানো ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত দেখে মনে হচ্ছে সবাই বিছানায় ঘুমাচ্ছে। ভোর চারটের সময় সেটাই স্বাভাবিক।

'সিকিউরিটি চীফের বাড়িটা দেখাও,' মলিকে বলল রানা

'লেগুনের কাছাকাছি বাড়িগুলোয় ড্যাডির চাকরবাকর আর মাইনিং এঞ্জিনিয়াররা থাকেন,' বলল মলি। 'তুমি যে বাড়িটা খুঁজছ সেটা পাবে সিকিউরিটি গার্ডদের কমপাউন্ডের দক্ষিণ কোণে। ওটার পাঁচিল বাদামী রঙের।'

'দেখতে পাচ্ছি।' ঘাম মোছার জন্যে কপালে আস্তিন ঘষল রানা। 'রাস্তা ছাড়া

অন্য কোনভাবে ওখানে পৌঁছানো যায়?'

'পিছন দিকে একটা ওয়াকওয়ে আছে।'

'চলো দেখি। হাতে সময় খুব কম।'

রাস্তার পাশের ঝোপগুলোর মাথা নিয়মিত ছাঁটা হয়, সেই ঝোপের ছায়ায় থাকল ওরা, এগোল সাবধানে। প্রতি পঞ্চাশ মিটার পরপর একটা করে লম্বা স্ট্রীট লাইট। বুনো ঘাসে বাতাস লাগায় শব্দ হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে জুতোয় চাপা পড়া শুকনো পাতা থেকে। বাদামী রঙের বাড়িটার দিকে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা তিনজন। খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে মলির কানে ঠোঁট ঠেকাল রানা। এখনও ওরা ছায়ার ভেতর। 'বাড়িটার ভেতর আগে কখনও ঢুকছ তুমি?'

'ছোটবেলায় দু'একবার তখন অন্য এক লোক সিকিউরিটি চীফ ছিল, আমার হাতে তাকে মেসেজ পাঠাতেন ড্যাডি,' ফিস ফিস করে জবাব দিল মলি।

'অ্যালার্ম সিস্টেম আছে?'

মাথা নাড়ল মলি। 'কার এত সাহস যে সিকিউরিটি চীফের ডেরায় ঢুকবে?'

'চাকরবাকররা কোথায় থাকে?'

'তারা থাকে অন্য কমপাউন্ডে।'

মুরল্যান্ড বলল, 'পিছনের দরজা দিয়েই যখন ঢুকছি, প্রথমে হানা দিতে চাই কিচে[illegible] খালি পেটে কিচেন দখল করতে যাওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার আছে।'

'ঠিক আছে, রিফ্রিজারেটর খোলার সুযোগ তোমাকেই প্রথম দেয়া হবে,' বলল রানা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে খিড়কি দরজার দিকে এগোল ও। কবাটের গায়ে খুদে একটা জানালা আছে।

জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। একটা হলওয়ে দেখা গেল, আলো খুব কম। শেষ প্রান্তে একটা সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। ল্যাচটা সাবধানে ঘোরাল, ক্লিক করে আওয়াজ হলো। দরজার কবাট সামান্য একটু খুলল রানা। কোন আওয়াজ হচ্ছে না দেখে আরও একটু খুলল। হলওয়েতে ঢুকে সামনে একটা দরজা দেখে ভেতরে ঢুকল। আলো জ্বালল ও। এটা কিচেন। আবার হলওয়েতে বেরিয়ে এসে মুরল্যান্ড আর মলিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ওর পিছু নিয়ে কিচেনে ঢুকল ওরা। 'ইস,' ফিসফিস করে বলল মলি, 'কতদিন গরম বাতাস পাইনি!'

'মাংস আর ডিমের গন্ধ পাচ্ছি আমি,' নাক টেনে বলল মুরল্যান্ড।

'আগে কাজ, তারপর অন্য কিছু,' বলে অ্যাসল্ট রাইফেল বাগিয়ে ধরে আবার হলওয়েতে বেরুল রানা। দেয়াল ঘেঁষে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। ধাপের ওপর কার্পেট, ওঠার সময় কোন আওয়াজ হচ্ছে না।

সিঁড়ির মাথায় উঠে ল্যান্ডিঙের দু'পাশে দুটো দরজা দেখল রানা। ডান দিকেরটা খুলল ও কমপিউটর, টেলিফোন আর ফাইল কেবিনেট সহ প্রাইভেট অফিস এটা।

ল্যান্ডিঙে বেরিয়ে এসে বাম দিকের দরজাটা খুলল। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই আলো জ্বালল। অপূর্ব সুন্দরী একটা বাঙালী মেয়ে, বয়েস হবে আঠারো কি উনিশ,

লম্বা কালো সিল্ক চুল খাটের কিনারা থেকে মেঝেতে ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা রানার দিকে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল সে, তবে শুধু ঘড়ঘড় করে ভোঁতা আওয়াজ বেরুল।

তার পাশে শুয়ে থাকা লোকটা কঠিন পাত্র। পাশ ফিরে শুয়ে আছে সে, চোখ বন্ধ, মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল না। এক চুল নড়ছে না দেখেই সন্দেহ হলো রানার, নিশ্চয়ই জেগে আছে। রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিল ও। বালিশে দুটো গুলি করল। সাইলেন্সার লাগানো আছে, হাততালি দেয়ার মত হালকা আওয়াজ হলো ঝট করে সিধে হয়ে বসল লোকটা, ডান হাতের তালুর দিকে চোখ। একটা বুলেট তার তালু ফুটো করে দিয়েছে।

এবার চিৎকার বেরুল মেয়েটার গলা চিরে, তবে দু'জন পুরুষের কেউই তার দিকে তাকাল না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ওরা, কখন মেয়েটা থামে। সে থামতে রানা বলল, 'বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে দুঃখিত, চীফ।'

চোখ পিট পিট করে রানার দিকে তাকাল রবার্ট হল্ট। 'আমার গার্ডরা ওর চিৎকার শুনতে পেয়েছে। এখুনি তারা এসে পড়বে।' একদম শান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'আমি তা মনে করি না। আমার ধারণা, তোমার বাড়ি থেকে এ-ধরনের চিৎকার আগেও তারা শুনেছে।'

'কে তুমি? কি চাও?'

'মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।'

চোখ কুঁচকে রানাকে খুঁটিয়ে দেখল হল্ট। অবিশ্বাসে ঝুলে পড়ল তার চেহারা 'আপনি...অসম্ভব... আপনি...মাসুদ রানা!'

ঘরের ভেতর মলি আর মুরল্যান্ড ঢুকল। রানার দু'পাশে দাঁড়াল ওরা, কথা বলছে না, তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে।

'আমি কি সত্যি সত্যি কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি?' বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে হল্ট।

'স্বপ্নে তোমার রক্তক্ষরণ হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, হল্টের বালিশের তলায় হাত গলিয়ে একটা নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক বের করল, ছুঁড়ে দিল মুরল্যান্ডের দিকে।

'ঝড় শুরু হবার আগে নিজের চোখে আপনাদেরকে আমি স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে দেখেছি,' ভোঁতা, একঘেয়ে সুরে বলল হল্ট। 'এ কি করে সম্ভব যে আপনারা তিনজনই বেঁচে আছেন!'

'আমাদেরকে একটা তিমি গিলে ফেলে,' বলল মুরল্যান্ড, জানালার পর্দা টেনে দিচ্ছে। 'পেটের ভেতর কারিগরি ফলাই, এরপর কি ঘটেছে কল্পনা করে নাও।'

'আপনারা আসলে পাগল। অস্ত্রগুলো ফেলে দিন। এই দ্বীপ থেকে কোনদিনই আপনারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন না।'

অ্যাসল্ট রাইফেলের মাজলটা হল্টের কপালে চেপে ধরল রানা। 'শুধু প্রশ্ন করলে কথা বলবে। মিস মলির বাচ্চা দুটো কোথায় বলো।'

ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখা গেল হল্টের চোখে। 'আমি আপনার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেব না।'

'তাহলে নির্ঘাত মারা যাবে।'

'না, আপনার হাতে আমার মৃত্যু নেই,' বলল হল্ট, মাথা নাড়ছে। 'আপনি প্রফেশন্যাল খুনী নন। শুনেছি আপনার পেশাই নাকি মানুষকে উদ্ধার করা, তাদের প্রাণ বাঁচানো।'

'মানুষ হলে তাকে উদ্ধার করি,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি বা তোমরা মানুষ নও। অমানুষদের আমি যে খুন করি, তার প্রমাণ পেয়েছে তোমার একজন গার্ড আধ ঘণ্টা আগে। তাকে আমি পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে নিচে ফেলে দিয়েছি।'

ইতস্তত করছে হল্ট, বুঝতে পারছে না কথাটা বিশ্বাস করবে কিনা। 'মি. রডনি বুমার তার নাতিদের নিয়ে কি করেছেন আমি জানি না।'

হল্টের কপাল থেকে রাইফেলের মাজল সরিয়ে একটা হাঁটুর ওপর চেপে ধরল রানা। 'মলি, তিন পর্যন্ত গোণো।'

'এক,' সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল মলি, 'দুই...তিন।'

ট্রিগার টেনে নিল রানা। হল্টের হাঁটুর হাড় চুরমার হয়ে গেল। তার পাশ থেকে মেয়েটা আবার আর্তনাদ করে উঠল।

'এই, তুমি চুপ করো!' ধমক দিল রানা। 'তোমার কোন ভয় নেই।'

তারপরও মেয়েটা থামছে না দেখে মুরল্যান্ড তার মুখে হাত চেপে ধরল।

আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে হল্ট। 'আমার হাঁটু! আমার হাঁটু!' তীব্র ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। 'আমি আর হাঁটতে পারব না! ওহ্ গড।'

তার একটা কনুইয়ের ওপর মাজল ঠেকাল রানা। 'আমার খুব তাড়া আছে রে, ভাই একটা পা গেছে। হাতটা যদি বাঁচাতে চাও তো বলো–কোথায় ওরা?'

'আর সব লেবারের সঙ্গে বাচ্চা দুটোকেও খনিতে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে,' বলল হল্ট 'ওদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকে তারা।'

মলির দিকে ফিরল রানা 'তোমার পালা।'

আবেগে কাঁপছে মলি। হল্টের দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'ও মিথ্যে কথা বলছে। ড্যাডির ওভারশিয়ার জ্যাক টেসটারের কাছে আছে ইকো আর মিরেজ। সে ওদেরকে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না।'

'এই টেসটার থাকে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'ম্যানসনের পাশে একটা গেস্টহাউসে,' বলল মলি 'ড্যাডি ডাকলেই যাতে সাড়া দিতে পারে '

হল্টের দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, অমানুষ, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। এর খেসারত দিতে হবে তোমাকে একটা কনুই হারিয়ে।'

'না, প্লীজ, না!' ব্যথায় গোঙাচ্ছিল হল্ট, দু'সারি দাঁতের মাঝখান দিয়ে হিস হিস করে উঠল। 'আপনি জিতেছেন। ওরা দুই যমজ ভাই টেসটারের কোয়ার্টারে আছে। মি. বুমার ওদেরকে সত্যি সত্যি লেবারদের সঙ্গে কাজ করতে পাঠাননি।'

হল্টের বাম চোখের সামনে মাজল তুলল রানা। 'শেষ একটা প্রশ্ন। কপ্টারের পাইলট ঘুমায় কোথায়?'

'ভাঙা হাত নিয়ে কোম্পানীর মেডিকেল ক্লিনিকে আছে,' গোঙাতে গোঙাতে জবাব দিল হল্ট। 'সে আপনাদেরকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না।'

রানার ইঙ্গিতে হল্টকে বেঁধে ফেলল মুরল্যান্ড। বালিশের কভার ছিঁড়ে গুঁজে দেয়া হলো তার মুখের ভেতর। মুরল্যান্ড একাই তাকে ক্লজিটের ভেতর ভরে বাইরে থেকে কবাট বন্ধ করে দিল।

মেয়েটাকে জেরা করল রানা। তার নাম তসলিমা, আরও সাতটা মেয়ের সঙ্গে ঢাকা থেকে অস্ট্রেলিয়া হয়ে নিমবাসে এসেছে। আনা হয়েছে নার্সিং-এর চাকরি দেয়ার নাম করে, কিন্তু জোর করে দেহদানে বাধ্য করা হচ্ছে। রানা তাকে জানাল, 'দ্বীপটা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানেই অপেক্ষা করবে তুমি. পালাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে কেউ একজন এসে তোমাকে খবর দেবে। ঠিক আছে?'

মাথা কাত করে রাজি হলো মেয়েটা।

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'চলো, টেসটারের খোঁজ করা যাক।'

প্রতিবাদ করল মুরল্যান্ড, 'কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়েছ রিফ্রিজারেটরে হানা দিতে পারব। আমার পেটে প্রত্যাখ্যান সূচক বেদনা শুরু হয়েছে।'

'এখন আর ও-সবের সময় নেই,' বলল রানা। 'তোমার খাদ ভরানোর সময় পরেও পাওয়া যাবে।'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড, হল্টের নাইন মিলিমিটারটা বেল্টে গুঁজে রাখতে রাখতে বলল, 'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার পেটের বিরুদ্ধে এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র?'

সাত

সকাল পাঁচটা। এক রঙা আকাশ, দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, সারি সারি নিচু ঢেউ বিরতিহীন গড়িয়ে চলেছে অদৃশ্য তীরের দিকে। আজ শনিবার, রোজকার মতই সাধারণ একটা দিন। টোঙ্গা, ফিজি, শুভা ইত্যাদি দ্বীপগুলো ধীরে ধীরে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। এরইমধ্যে সাগর থেকে ফিরতে শুরু করেছে মাছ ধরার নৌকা আর ট্রলারগুলো। একটু পরই হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবে ঝাঁক ঝাঁক ট্যুরিস্ট, সৈকতে রোদ পোহাবে, সাঁতার কাটবে সাগরে। এখনও কেউ তারা জানে না যে আজকের দিনটাই তাদের জীবনের শেষ দিন হয়ে উঠতে পারে।

ফুল স্পীডে ছুটছে ডীপ ফ্যাদম, গন্তব্য অ্যাকুসটিক কনভারজেন্স সাইট। এরইমধ্যে চারটে উৎস থেকে রওনা হয়ে গেছে ভীতিকর সাউন্ড ওয়েভ।

ব্রিজের স্টারবোর্ড উইংয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, চোখে বিনকিউলার। ডীপ ফ্যাদমের বো-র দিক থেকে উড়ে আসছে একটা সী হক হেলিকপ্টার, গায়ে নুমা লেখা, সেটাকেই দেখছেন তিনি। জাহাজের পিছন দিকের ল্যান্ডিং প্যাডে নামল ওটা, ভেতর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। খানিক পরই ব্রিজে অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা করল তারা।

'ড্রপ অপারেশন কেমন হলো?' উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

ড. কায়েস এক হাতে দাড়ি মুচড়ে হাসলেন। 'চার প্রস্থ রিমোট সেনসিং ইন্সট্রুমেন্ট সারফেসের নিচে ফিট করা হয়েছে, প্রতিটি সেট কনভারজেন্স জোন

থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।'

'এগুলো আমরা ফিট করেছি সাউন্ড ওয়েভ যে পথ ধরে আসবে সরাসরি সেই পথের ওপর,' জর্জ রেডক্লিফ বললেন। 'পথগুলো অঙ্ক কষে বের করা হয়েছে, আশা করি আমাদের বিজ্ঞানীরা হিসেবে কোন ভুল করেননি।'

'ওগুলো সেট করা হয়েছে ফাইনাল অ্যাপ্রোচ আর সাউন্ড ইনটেনসিটি পরিমাপ করার জন্যে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

মাথা ঝাঁকালেন ড. কায়েস। 'আন্ডারওয়াটার মোডেম থেকে টেলিমেট্রিক ডাটা রিলে করা হবে সারফেস ফ্লোটেশন স্যাটেলাইট লিঙ্ক-এর মাধ্যমে ডীপ ফ্যাদমের অনবোর্ড প্রসেসর আর অ্যানালিস্ট টার্মিনালে।'

'আবহাওয়া আর স্রোত আমাদের অনুকূলে,' বললেন রেডক্লিফ। 'এ যদি বজায় থাকে, সবগুলো সাউন্ড ওয়েভ আমাদের হিসাব করা সময়েই পৌঁছাবে।'

'ওয়ার্নিং টাইম?'

'গড় হিসাব হলো, পানির তলায় শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে পনেরো শো মিটার,' জবাব দিলেন ড. কায়েস। 'সাউন্ড ওয়েভ মোডেমকে পাশ কাটাবার পর রিফ্লেক্টর ডিশে আঘাত হানতে বিশ সেকেন্ড সময় নেবে।'

'মাত্র বিশ সেকেন্ড?' গম্ভীর দেখাল অ্যাডমিরালকে। 'মানসিক প্রস্তুতির জন্যে সময়টা খুবই কম।'

'আমার আরও একটা হিসাব হলো,' বললেন ড. কায়েস, এখনও তিনি এক হাতে দাড়ি পাকাচ্ছেন, 'সবগুলো সাউন্ড ওয়েভ পুরোপুরি বা নিঃশেষে নিমবাসের দিকে রওনা হতে সাড়ে চার মিনিট সময় নেবে। জাহাজের যারা নিরাপদ শেলটারে আশ্রয় নেবে না নির্ঘাত তাদের কষ্টকর মৃত্যু হবে।'

শুভা দ্বীপের দিকে তাকিয়ে একটা পাহাড় দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল। 'দ্বীপের তীরে বা সৈকতে যারা থাকবে?'

'অল্প সময়ের জন্যে ব্যথা হবে মাথায়। তবে স্থায়ী কোন ক্ষতি হবে না।'

ব্রিজের জানালা দিয়ে মেশিনারিগুলোর দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল; জাহাজের মাঝখান থেকে আকাশ ছুঁয়েছে। ডেরিক আর ক্রেন থেকে কত মাইল কেবল আর হাইড্রলিক লাইন বেরিয়ে এসেছে, কার সাধ্য হিসাব করে। মেয়ে ও পুরুষদের ডজন ডজন টীম ঝুলন্ত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রকাণ্ড রিফ্লেক্টর শীল্ড জোড়া লাগাবার কাজে ব্যস্ত। লিঙ্কগুলো সংখ্যায় এত বেশি, গুনে যেন শেষ করা যাবে না। দৈত্যাকার ডেরিক শীল্ডের মেইন ফ্রেম ধরে রেখেছে, ওটার চারধারে ক্রেনের জঙ্গল, নম্বর লাগানো পার্টসগুলো তুলে এনে যার যার নিজস্ব পটে ঢোকাচ্ছে জোড়া লাগাবার কাজে। রেডক্লিফকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কানেকটরগুলোয় তেল মাখিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিটি পার্টস দ্রুত সাবলীল ভঙ্গিতে জোড়া লেগে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ধরে এগিয়ে চলেছে কাজ। আর মাত্র দুটো পার্টস ফিট করতে হবে।

ব্রিজ থেকে শুভা আর ফিজি দ্বীপ পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। সারি সারি হোটেল, টাওয়ার, এয়ারপোর্ট, সবই চিনতে পারছেন। অবশ্য দক্ষিণ-পুবের টোঙ্গা দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে না। সাউন্ড ওয়েভ তিনটে দ্বীপেই আঘাত হানবে তাদের হিসেবে যদি কোন মারাত্মক ভুল হয়ে থাকে। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে ডীপ ফ্যাদমের ক্যাপটেন ফাউলসনের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'ক্যাপটেন ফাউলসন।'

ডিজিটাল নাম্বার চেক করছিলেন ক্যাপটেন। মুখ তুললেন। 'অ্যাডমিরাল।'

'সাইট আর কত দূরে?'

হাসলেন ফাউলসন। গত এক ঘণ্টায় এই একই প্রশ্ন অন্তত বিশবার করলেন অ্যাডমিরাল। 'ওখানে পৌঁছুতে আর বিশ মিনিট লাগবে, অ্যাডমিরাল। তারপর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম অনুসরণ করে জাহাজটাকে আমরা পিনপয়েন্টে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।'

'তারমানে রিফ্লেক্টর শীল্ডকে জায়গা মত বসাবার জন্যে আমাদের হাতে সময় থাকবে মাত্র চল্লিশ মিনিট।'

'ছয় মিনিট দশ সেকেন্ড পর কানভারজেন্স!' জাহাজের লাউডস্পীকারে গম গম করে উঠল ক্যাপটেন ফাউলসনের ভারী গলা। 'জাহাজের সবাই সামনের দিকে চলে যান, এঞ্জিনরূমের স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে আশ্রয় নিন। জলদি, জলদি! ছুটুন, হাঁটবেন না!'

মই, সিঁড়ি আর মাচা থেকে ঝপ ঝপ করে নামছে সবাই, নেমেই ছুটছে পাম্প রূমের দিকে; জাহাজের গভীর পেটের ভেতর সেটা। ওখানে বিশজন লোক তোয়ালে, কুশন, চাদর ইত্যাদি দিয়ে সাপ্লাই কমপার্টমেন্টের সমস্ত ফাঁক-ফোকর বন্ধ করছে ব্যস্ত হাতে। কোন ভাবেই ভেতরে কোন শব্দ ঢুকতে দেয়া যাবে না

ভেতরে ঢোকার সময় বাধা পেলেন হ্যামিলটন আর ড. কায়েস। দু'জন অফিসার ওদেরকে দাঁড় করালেন, হাতে ধরিয়ে দিলেন সাউন্ড-ডেডেনিং হেডগিয়ার। ওগুলো কানের ওপর পরলেন ওঁরা। কমপার্টমেন্টের এক কোণে জড়ো হয়েছে নুমার লোকজন, অ্যাডমিরাল আর ড. কায়েসকে দেখতে পেয়ে খুশি হলো সবাই। ওদের সঙ্গে শেলি মারভিনও রয়েছেন। সবাই তাঁরা মনিটরিং সিস্টেমের সামনে দাঁড়ালেন। সিস্টেমটা আন্ডারওয়াটার সেনসর আর ওয়ার্নিং মোডেমের সঙ্গে সংযুক্ত।

কমপার্টমেন্টটা খুব একটা বড় নয় আকারে, ছিয়ানব্বুইজন মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। অক্সিজেনে টান পড়েছে এরইমধ্যে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ক্যাপটেন ফাউলসন দু'হাত উঁচু করে মুঠো পাকালেন। রোমহর্ষক নাটকীয় মুহূর্তটি উপস্থিত। সব কিছু এখন ঝুলে আছে ল্যারি কিং-এর কমপিউটর নেটওয়র্কের অ্যানালাইজ করা ডাটার ওপর। জাহাজ যেখানে রাখতে বলা হয়েছে সেখানেই রাখা হয়েছে, শীল্ডটাও কিং-এর হিসাব অনুসারে নির্ধারিত পজিশনে ফিট করা হয়েছে, হিসাবটা চেক করেছেন ড. কায়েস। যা যা দরকার সবই করা হয়েছে। তারপরও যদি অঘটন ঘটে, কারও কিছু করার নেই।

পাঁচ সেকেন্ড পেরুল, তারপর দশ। ঘাড়ে, চুলের ভেতর, ঠাণ্ডা ঘামের স্পর্শ অনুভব করছেন অ্যাডমিরাল। তারপর হঠাৎ ত্রিশ কিলোমিটার দূরের অ্যাকুসটিক সেনসর ইনকামিং সাউন্ড ওয়েভ রেজিস্টার করতে শুরু করল।

'হায় খোদা!' ড. কায়েস বিড়বিড় করে উঠলেন। 'স্কেল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেনসর! আমি যে হিসাব দিয়েছিলাম, ইনটেনসিটি তারচেয়েও অনেক বেশি।'

'বিশ সেকেন্ড। গণনা শুরু হয়েছে,' ঘোষণা করলেন অ্যাডমিরাল।

কানভারজেন্সের প্রথম লক্ষণ ছোট একটা অনুরণন, দ্রুত বিস্তৃত হলো। কম্বল মোড়া বাল্কহেড কাঁপতে শুরু করল, সেই সঙ্গে শোনা গেল অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন। আওয়াজটা সাউন্ড-ডেডেনিং ইয়ার প্রটেক্টর ভেদ করছে। ছোট্ট জায়গার ভেতর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো সামান্য আচ্ছন্ন বোধ করল, এক-আধটু মাথাও ঘুরল, তবে বমি পেল না কারুরই, কিংবা কেউ আতঙ্কিত হলো না। অস্বস্তির ভাবটুকু দূর হলো খানিক পরই। অ্যাডমিরাল ও ড. কায়েস পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন, সাফল্যের তৃপ্তিকর অনুভূতি গ্রাস করছে দু'জনকে।

দীর্ঘ পাঁচ মিনিট পর বিপদ কেটে গেল। অনুরণন মিলিয়ে গেল দূরে, পিছনে রেখে গেল প্রায় অতিপ্রাকৃত নিস্তব্ধতা।

সবার আগে রেডক্লিফ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। কান থেকে ইয়ার প্রটেক্টর খুলে বললেন, 'ক্যাপটেন ফাউলসন, ক্রুদের দরজা খুলতে বলুন। তাজা বাতাস চাই!'

কুশন আর কাপড়চোপড় সরিয়ে দরজা খোলা হলো। এঞ্জিনরুম থেকে তেলের গন্ধ নিয়ে বাতাস ঢুকল ভেতরে। প্রায় একযোগে সবাই কান থেকে সাউন্ড ডেডেনার খুলে ফেলছে। কোন বিপদ হয়নি, কাজেই পরম স্বস্তি বোধ করছে তারা, পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, চিৎকার করছে আনন্দে। তারপর ধীরে ধীরে, সুশৃঙ্খলভাবে, স্টোরেজ রুম থেকে বেরিয়ে এল সবাই। কমপ্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এল তাজা বাতাসে।

হুইলহাউসে সবার আগে পৌছুলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। ছোঁ দিয়ে বিনকিউলার তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন ব্রিজ উইংয়ে। দ্বীপের দিকে ফোকাস করলেন তিনি, মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে।

রাস্তার ওপর লাইন দিয়ে ছুটছে কার। রোদ পোহাতে আসা ট্যুরিস্টরা স্বচ্ছন্দে সৈকতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণে হাসি ফুটল তাঁর মুখে।

'বিশাল একটা বিজয়, অ্যাডমিরাল,' হ্যামিলটনের হাতটা ধরে ঝাঁকালেন ড. কায়েস। 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের ধারণা আপনি মিথ্যে প্রমাণিত করেছেন।'

'আপনার অমূল্য জ্ঞান আর পরামর্শ আমাকে সাহায্য করেছে, ড. কায়েস,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'রিফ্লেক্টরের ধারণাটা আপনার ছিল। কাজেই সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনারই।'

আবেগে অধীর হয়ে রেডক্লিফ ও শেলি মারভিন, দু'জনেই আলিঙ্গন করলেন অ্যাডমিরালকে, অন্য কোন পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা চিন্তাও করা যেত না। 'প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষকে আপনি বাঁচিয়েছেন, অ্যাডমিরাল,' বললেন রেডক্লিফ। 'কংগ্রাচুলেশন্স! এ আপনার একার সাফল্য!'

'এ আমাদের সবার সাফল্য,' শুধরে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে একটা টীম কাজ করেছে।'

হঠাৎ থমথমে হয়ে উঠল রেডক্লিফের চেহারা। 'খুবই দুঃখজনক যে এখানে কি ঘটল দেখার জন্যে মাসুদ রানা নেই।'

'তবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে রানাই প্রথম ধরতে পেরেছিল দায়ী আসলে সাউন্ড ওয়েভ।'

সারি সারি ইন্সট্রুমেন্টের ওপর ঝুঁকে কি যেন পরীক্ষা করছেন ড. কায়েস। 'রিফ্লেক্টর নিখুঁত পজিশনে ছিল,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'অ্যাকুসটিক এনার্জি রিভার্স হয়ে গেছে, ঠিক যেমনটি আমরা চেয়েছিলাম।'

'এখন সেটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন শেলি মারভিন।

'অন্য তিনটে দ্বীপের মাইনিং অপারেশন থেকে বেরিয়ে আসা এনার্জি নিম্নবাসের সাউন্ড ওয়েভের সঙ্গে মিশে নিমবাসের দিকে ফিরে যাচ্ছে, যে-কোন জেট প্লেনের চেয়ে দ্রুতগতিতে। ওগুলোর সম্মিলিত ফোর্স জলমগ্ন ভিতে আঘাত হানবে এখন থেকে প্রায় সাতানব্বুই মিনিট পর।'

'লোকটার তখনকার চেহারা দেখতে পেলে খুশি হতাম।'

'কার চেহারা?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইলেন ড. কায়েস।

'রডনি বুমারের,' বললেন শেলি মারভিন। 'তাঁর ব্যক্তিগত দ্বীপ যখন দোল খেতে শুরু করবে।'

গোটা বুমার এস্টেটকে ঘিরে রেখেছে লাভা-রক দিয়ে তৈরি উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলটার মাঝখানে বিশাল তোরণ আকৃতির গেট, তারই একপাশে কিছু ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে ওরা তিনজন। তোরণের ভেতর ইঁট বিছানো ড্রাইভওয়ে বড় একটা লনকে ঘিরে এগিয়েছে। বাড়ির সরাসরি সামনে লম্বা একটা কাঠামো রয়েছে, গাড়ির আরোহীদের ওঠা-নামা আড়াল করার জন্যে। খানিক পর পর উজ্জ্বল ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলছে, ড্রাইভওয়ে আর বাড়িটা দিনের মত আলোকিত। ভেতরে ঢোকার পথে বাধা হলো লোহার গেটটা, দেখে মনে হচ্ছে মধ্যযুগের কোন দুর্গ থেকে তুলে এনে বসানো হয়েছে এখানে। প্রায় পাঁচ মিটার পুরু তোরণের সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ডদের জন্যে ছোট একটা অফিস রয়েছে।

'ভেতরে ঢোকার অন্য কোন পথ নেই?' নিচু গলায় মলিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওই তোরণই একমাত্র পথ।'

'ড্রেনের কোন পাইপ বা ছোট একটা নালা, পাঁচিলের তলা দিয়ে ভেতরে ঢোকেনি?'

'না, ও-সব কিছুই নেই।'

'সিকিউরিটি ডিটেকটর?'

'পাঁচিলের মাথায় লেযার বীম আছে। মাটিতে খানিক পরপর ইনফ্রারেড বডি হিট সেনসর। বিড়ালের চেয়ে বড় কিছু হলেই সিকিউরিটি অফিসে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। আপনাআপনি চালু হয়ে যাবে টিভি ক্যামেরা।'

'কতজন গার্ড?'

'রাতে দু'জন, দিনে চারজন।'

'কুকুর নেই?'

অন্ধকারে মাথা নাড়ল মলি। 'ড্যাডি পছন্দ করে না।'

গেটের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কপালে চিন্তার রেখা, সতর্ক দৃষ্টিতে গার্ডদের গতিবিধি লক্ষ করছে। তারা কেউ বাইরে বেরুচ্ছে না, ভেতরে থেকেই সিকিউরিটি সিস্টেম মনিটর করছে। দু'জনেই তারা দীর্ঘদেহী নিগ্রো। অবশেষে সিধে হলো রানা, ইউনিফর্মে হাত বুলাল, তাকাল মুরল্যান্ডের দিকে। 'দেখি বোকা বানিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারি কিনা। আমি গেট না খোলা পর্যন্ত আড়াল থেকে তোমরা বেরুবে না।'

অ্যাসল্ট রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে পকেট থেকে সুইস আর্মি নাইফ বের করল রানা। ছোট একটা ফলা লম্বা করে নিজের একটা আঙুল সামান্য কাটল, টিপে রক্ত বের করে মেখে নিল মুখে। গেটের সামনে পৌঁছে হাঁটু ঠেকাল মাটিতে, দু'হাতে বার ধরল। নিচু গলায় কাতরাতে শুরু করল ও, যেন ব্যথায় মরে যাচ্ছে। তারই ফাঁকে বলছে, 'সাহায্য করো! আমার সাহায্য দরকার!'

অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল দু'জন গার্ড, তাড়াতাড়ি গেট খুলল। তাদের বাড়ানো হাতের ওপর নেতিয়ে পড়ল রানা।

'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'কে তোমার এই অবস্থা করল?'

'চীনাদের একটা গ্যাং টানেল তৈরি করে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডক থেকে আসছিলাম, পিছন থেকে হামলা করে আমার ওপর। পালিয়ে আসার আগে ওদের দু'জনকে খুন করেছি...'

'মেইন সিকিউরিটি কমপাউন্ডকে সতর্ক করতে হয়,' দ্বিতীয় গার্ড বলল।

'আগে আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো,' গুঙিয়ে উঠল রানা। 'ওরা সম্ভবত আমার খুলিটা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

দু'জন মিলে রানাকে দাঁড় করাল, ওর হাত দুটো তুলে নিল নিজেদের কাঁধে। বোঝাটা খানিকটা বয়ে, খানিকটা টেনে নিয়ে অফিসের দিকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে হাত দুটো নাড়াচাড়া করল রানা, যতক্ষণ না দুই কনুইয়ের ভাঁজে গার্ডদের ঘাড় দুটো পেল। দরজা পেরুবার সময় যে-ই তারা ওর শরীরের আরও কাছে সরে এল, এক পা পিছিয়ে এসে মাথা দুটো পরস্পরের সঙ্গে বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠুকে দিল। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল খুলির হাড় ভেঙে গেছে। দু'জনেই ঢলে পড়ল মেঝেতে, অন্তত পরবর্তী দু'ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরবে না।

বিড়ালের মত নিঃশব্দে অফিসে ঢুকল মুরল্যান্ড আর মলি। সারি সারি ভিডিও মনিটরের সামনে দুটো চেয়ারে গার্ড দু'জনকে বসিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'বাইরে থেকে কেউ তাকালে ভাববে সিনেমা দেখার সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সিকিউরিটি সিস্টেমটা দ্রুত চেক করল রানা, বন্ধ করে দিল অ্যালার্মগুলো। মুরল্যান্ড ইতিমধ্যে টাই আর বেল্ট খুলে গার্ডদের বেঁধে ফেলেছে। মলি হঠাৎ বলল, 'রানা, আমি জানি ড্যাডির সঙ্গে তোমার একটা বোঝাপড়া আছে। কিন্তু আমি চাই তুমি আগে আমার ছেলে দুটোকে উদ্ধার করো।'

'টেসটারের কোয়ার্টার কোনদিকে তুমি জানো?'

'ম্যানর হাউসের পিছনে গাছপালার ভেতর দুটো গেস্টহাউস আছে, তারই একটায় থাকে টেসটার।'

'কোনটায় তুমি জানো না?'

'অনেক বছর পর দ্বীপে ফিরেছি। যত দূর মনে পড়ছে, ম্যানর হাউসের কাছাকাছি গেস্টহাউসটায় থাকে সে।'

ড্রাইভওয়ে ধরে শান্তভাবে এগোল ওরা, সবার আগে রানা। গাছপালার আড়ালে প্রথম গেস্টহাউসটা দেখা যাচ্ছে। সদর দরজার সামনে এসে থামল ওরা। ইতিমধ্যে পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। খোঁজাখুঁজিতে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। দিনের আলোয় ওদের উপস্থিতি গোপন রাখা যাবে না। রানা জানে, প্রথমে রডনি বুমারকে দরকার ওর, তাকে ধরতে পারলে মলির ছেলে দুটোর খোঁজ পাওয়া যাবে, স্যাটেলাইট টেলিফোন অথবা ওয়ায়্যারলেসের সাহায্যে যোগাযোগও করা সম্ভব হবে রানা এজেন্সির জাহাজগুলোর সঙ্গে, যদি তারা ওর দেয়া নির্দেশ মত নিমবাসের আশপাশে কোথাও থেকে থাকে।

তবু, মলির অনুরোধ ফেলতে পারল না রানা, প্রথমে গেস্টহাউসেই ঢুঁ মারতে হলো। কিন্তু গেস্টহাউসে ঢোকার পর দেখা গেল সেটা খালি পড়ে আছে, কেউ নেই।

মলি কাঁদছে, ওর ধারণা ইকো আর মিরেজকে খুন করা হয়েছে। বারবার বলছে, 'ড্যাডিকে আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি না। ড্যাডি সব পারে।'

ওর কাঁধে হাত রেখে অভয় দিল রানা। 'তোমাকে আসলে ভুল বোঝানো হয়েছে, মলি,' বলল ও। 'তোমার বাবা কোনদিনই ইকো আর মিরেজকে টেসটারের জিম্মায় রাখেননি। ওদেরকে মাইনে কাজ করানো হয়, এটাও মিথ্যে কথা। এ-সব বলা হয়েছে তোমাকে নরম করার জন্যে, তুমি যাতে তোমার বাবার কথা মত চলো।'

'তুমি বলছ ওরা বেঁচে আছে?' রানার একটা হাত ধরে ঝাঁকাল মলি।

'শুধু বলছি না, আমি জানি। তোমার বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে এ-কথা বলে উনি আসলে তোমাকে কষ্ট দিতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করো, মলি। তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান, তোমার বাচ্চারাই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সবই তো ওরা পাবে, তাই না? তুমি যেহেতু অবাধ্য, তোমাকে তাঁর দরকার নেই। কিন্তু ইকো আর মিরেজকে দরকার আছে। উনি চান ওদেরকে নিজের মত করে মানুষ করবেন। তুমি মারা গেলে তাতেই তাঁর সুবিধে। তোমাকে আমাদের সঙ্গে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে সেটাই তিনি প্রমাণ করেছেন।'

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মলি বলল, 'আমি তাহলে কি ধরনের বোকা?'

'এখন আমাদের ম্যানর হাউসে যাওয়া উচিত,' বলল রানা 'কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা ভেবে দেখো। তোমার দেখা উচিত নয় এমন ঘটনা ওখানে ঘটতে পারে।'

'দেখা উচিত নয় কোনটা? ড্যাডির মৃত্যু?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মলি।

'বাধ্য না হলে কাউকে আমরা খুন করব না,' বলল রানা। 'তবু আমি চাই তুমি নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে থাকো।'

'না। আমি সঙ্গে না থাকলে ম্যানর হাউসের কোথায় কি আছে তোমরা জানবে কিভাবে?'

'একটা ধারণা দাও দেখি।'

'ম্যানর হাউসের সব ক'টা ঘরের দরজা থেকে ভেতর দিকের একটা বারান্দায় বেরুনো যায়, শুধু একটা বাদে,' বলল মলি। 'ড্যাডির স্টাডি রুমের একটা আলাদা দরজা আছে, সেটা দিয়ে স্কোয়াশ কোর্টে বেরুনো যায়।'

'স্কোয়াশ কোর্ট মানে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'যেখানে স্কোয়াশ খেলা হয়,' বলল রানা, তারপর মলির দিকে তাকাল। 'তোমার পুরানো বেডরুমটা কোনদিকে?'

'বাগানের ওদিকটায়, সুইমিং পুলটাকে পাশ কাটিয়ে ইস্ট উইং হয়ে যেতে হয়, ডানদিকের তৃতীয় দরজাটা।'

'ঠিক আছে, আমার ধারণা ওখানেই পাওয়া যাবে ইকো আর মিরেজকে,' বলল রানা। 'যাও, ওদের সঙ্গে দেখা করো। তোমার সঙ্গে মুরল্যান্ড থাকবে।'

'আর তুমি?'

'আমি যাচ্ছি তোমার ড্যাডির ফোনটা ধার চাইতে।'

আট

নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড ভলকানিক অবজারভেটরি থেকে ডীপ ফ্যাদমে একটা ফোন এল। ফোনটা করেছেন নুমার চীফ জিওলজিস্ট লেড নোরিশ। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে তিনি বললেন, 'এখানকার জিওফিজিসিস্টরা খুব খারাপ একটা খবর দিচ্ছেন, অ্যাডমিরাল। নিমবাসে সাউন্ড রে এনার্জির আঘাত সম্পর্কে।'

'কি ঘটতে পারে?'

'নিমবাসের দুই প্রান্তে দুটো আগ্নেয়গিরি আছে, নাম রডগার আর উইংকেলম্যান। ওগুলোর নিচে যে প্লেট আছে সেটার অবস্থা খুবই ভীতিকর। বারোশো পঁচিশ আর বারোশো পঁচাত্তর সালে একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছিল ওগুলো...'

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্যে অ্যাডমিরাল বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি এর আগে আমাকে জানিয়েছেন, কনভারজেন্সের ধাক্কায় আগ্নেয়গিরি দুটো বিস্ফোরিত হবার আশঙ্কা শতকরা মাত্র বিশ ভাগ।'

'এখানকার এক্সপার্টরা অতীত ইতিহাস আর সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলছেন, ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

'সাউন্ড ওয়েভ নিমবাসে পৌঁছুবে দুর্বল শক্তি নিয়ে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তাতে উদ্‌গীরণ শুরু হবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'হত না, কিন্তু আগ্নেয়গিরির ভেতর অসংখ্য টানেল আর শ্যাফট তৈরি করায় বাইরের যে-কোন কম্পন ট্রিগার টেনে দেয়ার কাজ করবে,' বললেন লেড নোরিশ। 'সংক্ষেপে, রডনি বুমার যদি খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ না করেন, আগ্নেয়গিরি দুটো বিস্ফারিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। যে-কোন মুহূর্তে তরল লাভার উদ্‌গীরণ শুরু হয়ে যেতে পারে।'

'ওহ্ গড! তরল লাভার উদ্‌গীরণ! তাহলে তো মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে! নিমবাসে কয়েক হাজার নিরীহ মাইনার আছে!'

'যা হবার হয়েছে, এখন দেখুন...'

'সাউন্ড ওয়েভ নিমবাসের দিকে ফেরত না পাঠালেও পারতাম আমরা...'

'অন্য কোনদিকে পাঠালে ফিশিং ফ্লীট বা জাহাজ বহরে আঘাত করতে পারত,' বললেন চীফ জিওলজিস্ট। 'সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপাবেন না, অ্যাডমিরাল। সবাই আমরা একমত হয়েছিলাম, এটাই নিরাপদ উপায়।'

'এখন কি কিছুই করার নেই?'

'নিমবাসে সাউন্ড ওয়েভ কখন পৌঁছাবে?' জানতে চাইলেন লেড নোরিশ।

হাতঘড়ি দেখলেন অ্যাডমিরাল। 'আর মাত্র একত্রিশ মিনিট বাকি আছে।'

'এখনও সময় আছে, নিমবাস থেকে সবাইকে পালাতে বলুন।'

'হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন থেকে এরইমধ্যে আমাদের লোক রডনি বুমারের মাইনিং ম্যানেজমেন্টকে সতর্ক করার চেষ্টা করছে কিন্তু বুমারের নির্দেশে সব ক'টা মাইনিং অপারেশনের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে বুমার যেন চাইছেন কিছু একটা ঘটুক।'

'তাঁর নিজস্ব একটা ডেডলাইন আছে, সেটা শেষ হবার আগে চাইছেন না কেউ বাধা দিক।' এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন অ্যাডমিরাল, তারপর জানতে চাইলেন, 'সবচেয়ে খারাপ কি ঘটতে পারে?'

'এখানকার এক্সপার্টরা বলছেন, বিস্ফোরিত হলে রডগার আর উইংকেলম্যান থেকে লাভা বেরিয়ে আসবে নদীর আকারে।'

'এ-ধরনের একটা বিপর্যয় থেকে কারও কি বাঁচার সম্ভাবনা আছে?'

'নির্ভর করে দ্বীপের কোন দিকটা থেকে লাভার বিস্ফোরণ শুরু হবে তার ওপর। যদি পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়, একজনও বাঁচবে বলে মনে হয় না। কারণ ওদিকটাতেই থাকে সবাই।'

'আর যদি পুব দিক থেকে শুরু হয়?'

'পালাবার খানিকটা সময় পাওয়া যাবে,' বললেন লেড নোরিশ। 'এখন রাখি, অ্যাডমিরাল। নতুন কোন তথ্য পেলেই আপনাকে জানাব।'

ফোনের সুইচ বন্ধ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। অবয়বে কোন রেখা ফুটল না। চোখের পাতা কাঁপল না যদিও মনে মনে অপরাধবোধে জর্জরিত হচ্ছেন

হঠাৎ সংবিৎ ফিরল কাঁধে টোকা পড়ায়।

রেডক্লিফ বললেন, 'অ্যাডমিরাল, আপনার ফোন

'আমি এখন কারও সঙ্গে কথা বলব না।'

'বলবেন।' ফোনের রিসিভারটা তুলে বাড়িয়ে ধরলেন রেডক্লিফ 'এই লাইনে সংযোগ দেয়া হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকালেন অ্যাডমিরাল। 'হু ইজ দিস?'

'গুড মর্নিং, অ্যাডমিরাল। আপনি শুভায় কি করছেন?'

কেঁপে ওঠার মত মানুষ হ্যামিলটন নন, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কাঁপছেন, যেন

পায়ের নিচ থেকে ডেকটা গায়েব হয়ে গেছে। 'রানা? সত্যি তুমি? ইজ ইট ইউ, মাই বয়?'

'আমি আর মুরল্যান্ড আর মলি বুমার।'

'ওহ্ গড! তোমরা সবাই বেঁচে আছ!' অ্যাডমিরালের মনে হলো তাঁর শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক ঢেউ জেগেছে।

'মুরল্যান্ড জানতে চাইছে আপনি কেমন আছেন, অ্যাডমিরাল।'

'ও কেমন আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'খেতে দিইনি বলে আমার ওপর খুব রাগ।'

'প্রায় তিন হপ্তা তোমাদের কোন খোঁজ নেই। বুমার তোমাদেরকে টাইফুনের মুখে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছেন শোনার পর আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে...'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, অ্যাডমিরাল। পরে এক সময় গল্প করা যাবে। আপনি বরং এখন আমাকে অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে বলুন। আমি খুব চিন্তায় আছি।'

'দেখা হলে বলব। এখন তুমি কোত্থেকে বলছ?'

'অনেক কষ্টে নিমবাসে পৌঁছেছি,' বলল রানা। 'কথা বলছি রডনি বুমারের স্টাডি থেকে।'

অবিশ্বাসে বোবা হয়ে গেলেন হ্যামিলটন। কয়েক সেকেন্ড পর বললেন, 'তুমি সিরিয়াস, রানা? নিমবাসে তোমরা কি করছ?'

'এখানেই আমরা উঠেছি। আপনাকে ফোন করার আগে রানা এজেন্সির রেসকিউ জাহাজ সার্চার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি। নিমবাসের কাছাকাছি ছিল ওরা, আমারই নির্দেশে। লেগুনে ঢুকে ওদেরকে তৈরি থাকতে বলেছি, আমি বললেই সৈকতে ভিড়বে, উদ্ধার করে নিয়ে যাবে পেভ লেবারদের। রেড স্যান্ড আর গুডউইল থেকেও। পেভ লেবারদের উদ্ধার করবে বাকি দুটো জাহাজ। মলি বুমারের যমজ বাচ্চা দুটোকে সঙ্গে নেব আমরা। তাসমান সাগর হয়ে অস্ট্রেলিয়া যাবারই ইচ্ছে...'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

'অ্যাডমিরাল, লাইনে আপনি আছেন তো?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

'রানা, আমার কথা শোনো!' ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'তোমরা চরম বিপদের মধ্যে আছ! পালাও, ফর গড'স সেক! এখুনি, রানা, এখুনি!'

আধ সেকেন্ড পর রানা বলল, 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই, রানা,' বললেন অ্যাডমিরাল, থরথর করে কাঁপছেন। 'শুধু এইটুকু বলি, অবিশ্বাস্য ইনটেনসিটি নিয়ে একটা সাউন্ড রে নিমবাসে আঘাত হানতে যাচ্ছে এখন থেকে ছাব্বিশ মিনিটের মাথায়। এই আঘাতে রডগার আর উইংকেলম্যান বিস্ফোরিত হতে পারে। যদি পশ্চিম দিক থেকে লাভার উদ্‌গীরণ শুরু হয়, দ্বীপের কেউই বাঁচবে না। সময় থাকতে নিমবাস ত্যাগ করো তোমরা। আর কোন কথা নয়। সমস্ত যোগাযোগ আমি বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি।'

ফোনের সুইচ বন্ধ করে দিলেন অ্যাডমিরাল।

*

খবরটা যেন রানার বুকে ছোরা মারল। জানালা দিয়ে হেলিকপ্টারটা দেখতে পাচ্ছে ও, লেগুনের জেটিতে বাঁধা ইয়টের ওপর বসে রয়েছে। দূরত্বটা আন্দাজ করল, প্রায় এক কিলোমিটার। বোঝা হিসেবে দু'টো বাচ্চা ছেলে থাকবে সঙ্গে, ডকে পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লেগে যাবে। পথে নানা রকম বাধা পড়তে পারে, তাহলে আরও বেশি সময় লাগবে। একটা কার বা ট্রাক পেলে ভাল হয়। নিমবাসে কি তা আছে?

মুরল্যান্ড আর মলি এত দেরি করছে কেন? ওরা কি বাচ্চা দুটোকে খুঁজে পায়নি?

লেগুনের মাঝখানে তাকাল রানা, রানা এজেন্সির চার্টার করা জাহাজটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর নির্দেশের অপেক্ষায়। স্যাটেলাইট টেলিফোনের রিসিভার তুলে ক্যাপটেন সাদিককে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল, 'দ্বিতীয় জেটিতে জাহাজ ভেড়াও। তোমরা ষোলোজন আছ, সবাই অস্ত্র হাতে তৈরি থাকো, তবে দ্বীপ থেকে কেউ যেন তোমাদেরকে দেখতে না পায়। শুধু আক্রান্ত হলে গুলি করবে। বেশিরভাগ গার্ড অস্ট্রেলিয়ান শ্বেতাঙ্গ, কিছু নিগ্রোও আছে। গোলাগুলি শুরু হলে শুধু ওদেরকে টার্গেট করবে।'

'বাঙালী আর চীনা লেবাররা কি জাহাজে উঠতে পারবে? গোলাগুলির মধ্যে?' জানতে চাইল রানা এজেন্সির এজেন্ট সাদিক আহমেদ, নৌ-বাহিনীর সাবেক অফিসার সে।

'এঞ্জিনিয়ার, জিওলজিস্ট, লেবার, সব মিলিয়ে প্রায় দু'আড়াই হাজার মানুষ,' বলল রানা, দ্রুত চিন্তা করছে। 'সবাই হয়তো জাহাজে উঠতে পারবে না। কে পারবে, কে পারবে না, সেটা বড় কথা নয়, সমস্যা হলো এখন থেকে পঁচিশ মিনিট পর দুটো আগ্নেয়গিরিই বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। হাতে কয়েক মিনিট থাকতেই লেগুন ছেড়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে যেতে হবে তোমাদেরকে।'

'মাসুদ ভাই, ওরা কি জানে যে জাহাজে উঠে পালাতে হবে সবাইকে?'

'এখনও কেউ কিছু জানে না। তবে আমি রডনি বুমারকে ধরতে যাচ্ছি। তাঁকে পেলে খবরটা লেবারদের জানাতে বাধ্য করব। কিন্তু আমি যদি ব্যর্থ হই, লাউডস্পীকারে ওদেরকে তোমরা ডাকবে–এখন থেকে ঠিক সাত মিনিট পর। আরেকটা কথা। লেগুনের কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ি আছে, তার একটায় সিকিউরিটি চীফ থাকে। ওটার পাঁচিল বাদামী রঙের। দোতলার একটা ঘরে বাঙালী এক মেয়ে আছে। লেবারদের কাউকে বা এজেন্সির কাউকে পাঠিয়ে তাকেও জাহাজে আনতে হবে।'

'জ্বী, ঠিক আছে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে জানালা দিয়ে প্রথমে মাউন্ট উইংকলম্যানের দিকে তাকাল রানা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে মাউন্ট রডগারের দিকে। শান্ত ও নিরীহ দেখাচ্ছে পাহাড় দুটোকে। ঢালগুলোয় সবুজের সমারোহ দেখে কল্পনা করা কঠিন যে ওগুলোর ভেতরে টগবগ করে ফুটছে লাভার নদী, আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসবে সব, গ্রাস করবে গোটা নিমবাসকে।

অস্থির হয়ে রডনি বুমারের রিভলভিং চেয়ার ছাড়ল রানা, ডেস্ক ঘুরে এগোচ্ছে।

তিন সেকেন্ড পর কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, যেন পাথর হয়ে গেল। অন্দরমহলের একটা দরজা খুলে গেছে, ভেতরে ঢুকছেন রডনি বুমার।

তাঁর এক হাতে ধূমায়িত কফির কাপ, এক বগলের নিচে একটা ফাইল। কোঁচকানো প্যাকস পরে আছেন, শার্টটা হলুদ, সঙ্গে একটা বো টাই। খানিকটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। কামরায় আরও কেউ আছে, বুঝতে পেরে মুখ তুলে তাকালেন, বিস্ময়ের চেয়ে কৌতূহলই বেশি। আগন্তুক ইউনিফর্ম পরে আছে দেখে প্রথমে তিনি রানাকে একজন সিকিউরিটি গার্ড বলে মনে করলেন। এখানে কি দরকার, জিজ্ঞেস করার জন্যে মুখ খুলতে যাবেন, রানাকে চিনতে পেরে মুখটা ঝুলে পড়ল। ফাইলটা মেঝেতে পড়ে গেল। হাতটা নেমে এল শরীরের পাশে, প্যাকস আর কার্পেটে ছিটকে পড়ল কফি। 'আপনি তো মারা গেছেন!'

'তাহলে আপনি ভূত দেখছেন।'

'এ অসম্ভব! ওই টাইফুন...' রানার হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল দেখে থেমে গেলেন বুমার। 'কি করে সম্ভব হলো? আপনি একা? নাকি মলিও বেঁচে গেছে?'

'সত্যি আপনার স্পর্ধা আছে। একমাত্র মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এখন আবার জানতে চাইছেন সে বেঁচে আছে কিনা।'

'কে বলল মলিকে আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি?' আবার রানার হাতের রাইফেলটার দিকে তাকালেন বুমার। 'আমাকে রিপোর্ট করা হয়েছে, মলি স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে গেছে।'

'রিপোর্টটা সত্যি কিনা চেক করেছিলেন?' জানতে চাইল রানা। 'ঝড় থামার পর তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন? নাকি তাকে আপনার কোন দরকার নেই, দরকার শুধু তার ছেলে দুটোকে?'

'আমি একজন টাইকুন। আমি মারা গেলে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কারও হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য থাকা উচিত। মলি আমার এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে পারেনি।'

'দুঃসংবাদ আছে, বুমার,' বলল রানা। 'তিনটে দ্বীপ–নিমবাস, গুড উইল আর রেড স্যান্ড–আপনার মাথায় ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।'

বুমার কথাগুলোর অর্থ করতে পারলেন না। 'আপনি আমাকে খুন করতে চান?'

মাথা নাড়ল রানা। 'বাধ্য না হলে চাই না। বরং আপনাকে আমি বাঁচাতে চাই ভয়াবহ একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে। নিমবাসের আগ্নেয়গিরি দুটো বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। এখানে আপনার যা কিছু আছে সব তরল লাভা হজম করে ফেলবে।'

ক্ষীণ হাসি ফুটল বুমারের ঠোঁটে। 'আমি জানি। সেজন্যেই তো সব খনি খালি করে ফেলছি। তবে ঘটনাটা ঘটতে এখনও কয়েকদিন বাকি আছে।'

'ব্যাখ্যা করা কঠিন। টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো আমি নিজেও জানি না। তবে এক্সপার্টরা জানিয়েছেন যে আর মাত্র কয়েক মিনিট পরই দ্বীপ তিনটের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সাউন্ড রে, হ্যাঁ, একটা সাউন্ড রে, প্রচণ্ড ইনটেনসিটি নিয়ে আঘাত হানবে...' ঘুরে বুমারের পিছনে চলে এল রানা, রাইফেলের মাজল ঠেকাল তাঁর শিরদাঁড়ায়। 'হাতে সময় নেই। ফোন করুন আপনার সুপারিনটেনডেন্ট আর

সুপারভাইজারদের। লেগুনে একটা জাহাজ ভিড়েছে। নির্দেশ দিন পেভ লেবার, এঞ্জিনিয়ার আর জিওলজিস্টরা যেন এখুনি যে-যার কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে জাহাজে চড়ে।'

'জাহাজ? কোথায় জাহাজ?' জানালা দিয়ে লেগুনের দিকে তাকালেন বুমার। জাহাজটাকে দেখতে পেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'এত কিছু ঘটে গেছে অথচ আমি কিছু জানি না!'

'আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন!' কঠিন সুরে বলল রানা। 'যা বলছি করুন।'

'হুমকি-ধামকিতে নত হব, আমাকে দেখে তাই মনে হয়?'

তাঁর শিরদাঁড়া থেকে মাজল তুলে নিয়ে গুলি করল রানা। বুমারের একটা কানের অর্ধেক উড়ে গেল। রাইফেলে সাপ্রেসর থাকায় খুব একটা শব্দ হলো না। 'এরপর আমি আপনার শিরদাঁড়ায় গুলি করব,' বলল রানা!

দু'পা এগিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন বুমার। কান থেকে রক্ত ঝরছে, যদিও চেহারায় ব্যথার কোন ভাব ফুটল না। ডায়াল করার পর এক হাতে কানটা তিনি চেপে ধরলেন শুধু। রিসিভারে তিনি বললেন, 'পাউলা? রডনি। হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে। কোন ব্যাখ্যা চেয়ো না। গার্ডদের বলো তারা যেন বিদেশী সমস্ত লেবার, এঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীদের ছেড়ে দেয়। লেগুনে একটা জাহাজ আছে, সবাইকে ওটায় চড়তে বলতে হবে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'এখন কি হবে?'

'এখন আমরা দেখব আপনার গার্ডরা কি করে, মাইনারদের সবাইকে জাহাজে উঠতে দেয় কিনা।'

'তারপর?'

'তারপর আমরাও পালাব,' বলল রানা। 'আপনাকেও প্রাণে বাঁচার একটা সুযোগ দেয়া হবে।'

'আপনি সত্যি আমাকে খুন করতে আসেননি?' বুমারকে বিস্মিত দেখাল।

'কে বলল আমি খুনী?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আমার কাজ আপনাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া। বিচারে আপনি যদি অপরাধী সাব্যস্ত হন, শাস্তি পেতে হবে। সেটা মৃত্যুদণ্ড হবারই বেশি সম্ভাবনা, কি বলেন?'

বুমার নিঃশব্দে হাসলেন। 'আমাকে শাস্তি দেয়া এত সহজ নয়।'

কথা না বলে হাতঘড়ি দেখল রানা। জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল, তবে রাইফেলটা এখনও বুমারের দিকে তাক করা।

বুমার পাউলাকে ফোন করার পর মাত্র তিন মিনিট পেরিয়েছে। আগ্নেয়গিরির ঢালে খানিক পর পর খনির খোলা মুখ, সেগুলো থেকে সন্ত্রস্ত পিঁপড়ের মত ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে মাইনাররা। কালো ভূত বললেই হয়, পরনে ছেঁড়া প্যান্ট বা শর্টস, বেশিরভাগই খালি গায়ে। ভূতগুলো সব কঙ্কাল সার, গায়ে শুধু চামড়া ঝুলে আছে।

মানুষের আরও একটা স্রোত দেখা গেল, পেভ লেবারদের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে লেগুনের দিকে প্রাণপণে ছুটছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। যাক, পাউলা রডনি বুমারের নির্দেশ ঠিকমতই পালন করেছে।

রাইফেলটা একটু উঁচু করে বুমারের কপালে তাক করল রানা। 'এবার আপনি কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটবেন,' বলল ও। 'কোন রকম চালাকি করতে দেখলে শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দেব।'

বুমারের চেহারায় ব্যথা-বেদনার চিহ্নমাত্র নেই। ঠোঁট বাঁকা করে ক্ষীণ একটু হাসলেন। কানের ক্ষতটা এক হাতে চেপে রেখেছেন। ধীরে ধীরে ঘুরলেন তিনি, দরজার দিকে এগোচ্ছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্টাডিরুমে ঢুকে পড়ল পাউলা। উত্তেজিত, দিশেহারা লাগছে তাকে। পরে আছে সিল্ক রোব, সেটা হাঁটু ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে। গার্ড ইউনিফর্ম পরে থাকায় সে-ও প্রথমে রানাকে চিনতে পারল না, বুঝতে পারল না বুমার বিপদের মধ্যে রয়েছেন। 'কি ব্যাপার, রডনি? তুমি হঠাৎ সমস্ত মাইনারকে বিদায় করে দিচ্ছ যে?' হঠাৎ লক্ষ করল মাথায় চেপে ধরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। 'কি সর্বনাশ, তুমি আহত হলে কিভাবে?'

'আমাদের এখানে অবাঞ্ছিত অতিথি ঢুকে পড়েছেন, পাউলা,' বললেন বুমার, মনে মনে আন্দাজ করলেন পিছনে দাঁড়ানো রানার দৃষ্টি অবশ্যই পাউলার দিকে নিবদ্ধ। পাউলা তাঁর দিকে ছুটে আসছে, এই ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে একবার দেখেও নিলেন চোখের কোণ দিয়ে। পলকের জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল পাউলাকে, তারপর বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল মুখ—এতক্ষণে রানাকে চিনতে পেরেছে সে। 'না! না! এ সম্ভব নয়।'

এই ছন্দপতনের অপেক্ষাতেই ছিলেন বুমার। শরীরটাকে ক্ষিপ্রবেগে মুচড়ে ঘুরলেন তিনি, এক হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন গান ব্যারেল।

রানা অবশ্য ট্রিগার টেনে দিয়েছে। এক পশলা বুলেট ছুটে গিয়ে দেয়ালে লাগল। অমানুষিক পরিশ্রম আর অনিদ্রায় দুর্বল শরীর, রিয়্যাক্ট করতে এক পলক দেরি করে ফেলেছে রানা। তিন হপ্তা ধরে শক্তি ক্ষয় হয়েছে, এখন তার মাসুল দিতে হলো। চোখের সামনে শ্লথগতিতে ঘটছে ঘটনাটা। দেখতে পেল হাতের রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়া হলো জানালার দিকে, কাচ ভেঙে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

রানার ওপর খেপা গণ্ডারের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন বুমার। তাঁকে খামচি মারল রানা, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। বুমারের বয়েস হলেও, রানার চেয়ে অনেক বেশি ওজন তাঁর, এলোপাতাড়ি নির্মম ঘুসি মারছেন ওর নাকে-মুখে। তারপর হঠাৎ রণকৌশল বদলে রানার চোখে নখ সহ আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। মাথাটা ঝট করে সরিয়ে নিয়ে চোখ বাঁচাল রানা, তবে কানের ওপর মাথায় একটা ঘুসি খেলো। ব্রেনের ভেতর আলোকিত অনেকগুলো রঙ বিস্ফোরিত হলো, আচ্ছন্ন বোধ করছে ও। মরিয়া হয়ে বসে পড়ল রানা, ঘুসির বর্ষণ থেকে রেহাই পাবার জন্যে মেঝেতে শুয়ে গড়িয়ে দিল শরীরটা।

বুমার ছুটে আসছে দেখে দুটো গড়ান দিয়ে লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা। প্রৌঢ় ডায়মন্ড মাইনার খালি হাতে লড়তে নেমে বহু লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাঁধ আর হাতের পেশী প্রফেশন্যাল বক্সারদের মত। যুবা বয়েসে খনির ভেতর তরুণ শ্রমিকদের শায়েস্তা করার সময় গর্ব করে বলতেন, ছুরি বা আগ্নেয়াস্ত্র কিছুই

তাঁর দরকার নেই। এই বয়েসে মানুষ ছাতুর মত নরম হয়ে যায়, কিন্তু এখনও তিনি লোহার মত শক্ত।

ঝাপসা দেখছে রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা কাটাবার চেষ্টা করল। নিজেকে থেতলানো বক্সারের মত লাগছে, বেল বাজার অপেক্ষায় রশি ধরে কোন রকমে ঝুলে আছে, ভাবছে কি কৌশল করলে জেতা যাবে। বুমারের পেশীশক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা খুব কম মার্শাল-আর্ট এক্সপার্টের পক্ষেই সম্ভব। হীরকসম্রাটকে কাবু করতে হলে একটা এলিফেন্ট গান দরকার। এখন এখানে মুরল্যান্ডের উপস্থিতি জরুরী ছিল। তার কাছে ছোট হলেও একটা অটোমেটিক আছে। দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা, সম্ভাব্য অ্যাকশন নিয়ে ভাবছে, এক এক করে বাতিলও করে দিচ্ছে সেগুলো, কারণ জানে অ্যাকশন শেষ হবার আগেই দেখা যাবে যে ওর দু'একটা হাড় ভেঙে গেছে। ডেস্ক ঘুরে ফাঁকি দিচ্ছে বুমারকে, তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে, ফলে ব্যথা করছে মুখ।

হাতে কিছু একটা থাকা দরকার। খালি হাতে এই লোকের সঙ্গে পারা যাবে না। 'আপনার উদ্দেশ্যটা কি? পচা দাঁত দিয়ে কামড়াবেন?'

অপমানটা প্রত্যাশা পূরণ করল। উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠে রানার পেট লক্ষ্য করে লাথি চালালেন বুমার। ক্ষীণ বিলম্ব ঘটায় রানার নিতম্বে সামান্য একটা ঘষা খেলো তাঁর পা। আঘাত করতে না পারায় আরও খেপে গেলেন বুমার, এবার রানাকে লক্ষ্য করে সরাসরি লাফ দিলেন। শান্তভাবে এক পা পিছিয়ে এসে ডেস্ক থেকে মেটাল ডেস্ক-ল্যাম্পটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা, ঘোরাল একদিক থেকে আরেক দিকে।

হাত তুলে ওটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করলেন বুমার, তবে দেরি করে ফেলায় বাড়ি খেলেন কব্জিতে, কব্জি ভেঙে কাঁধে আঘাত করল ল্যাম্প, মট করে আওয়াজ হলো. কলার বোনও ভেঙে গেছে। আহত বাঘের মত গর্জে উঠলেন বুমার, ছুটে এলেন আবার রানার দিকে। এবার মাথা লক্ষ্য করে ঘুসি মারলেন।

নিচু হলো রানা, ল্যাম্পটাও নিচের দিকে চালাল। বুমারের হাঁটুর নিচে হাড়ে লাগল, এত জোরে যে রানার হাত থেকে ছুটে গেল ভোঁতা অস্ত্রটা। আঘাতটা মারাত্মকই, অথচ তারপরও দেখা গেল বিপুল বিক্রমে রানার দিকে ছুটে আসছেন বুমার। তাঁর ঘাড়ের পাশে ফুলে উঠেছে রগগুলো। চোখ দুটো বিস্ফারিত, টকটকে লাল। মুখ খুলে হাঁপাচ্ছেন, চিবুক থেকে লালা ঝুলছে। দেখে মনে হচ্ছে হাসছেন। দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে লাফ দিলেন আবার।

কিন্তু টার্গেটে পৌঁছুতে পারলেন না। তাঁর ডান পা ভাঁজ হয়ে গেল, ভারী বস্তার মত মেঝেতে পড়লেন। ল্যাম্পের গোড়াটা নিশ্চয়ই তাঁর হাঁটুর নিচে হাড় ভেঙে দিয়েছে। এবার! বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, এক লাফে উঠে দাঁড়াল ডেস্কের ওপর। ডেস্ক থেকে আবার লাফ দিল, জুতো পরা দুই পা দিয়ে পড়ল বুমারের নগ্ন গলায়। বুমারের সবগুলো হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল, ওগুলোর ফাঁকে জিভের ডগাও দেখা যাচ্ছে। খালি বাতাসে খামচি মারছে একটা হাত। অপর হাত আর দুই পা ছুঁড়ছেন। ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে। পাঁচ সেকেন্ড পর স্থির হয়ে গেলেন। নিষ্প্রাণ হয়ে গেল চোখ দুটো।

দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশ্বাস ফেলছে রানা, জানে না দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছে কোত্থেকে। পাউলার দিকে তাকাল, মেয়েটা রডনি বুমারকে সাহায্য করার কোন চেষ্টাই করেনি। কার্পেটে পড়ে থাকা লাশটার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, শোক বা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই চেহারায়। 'আপনি ওকে খুন করেছেন,' শান্ত গলায় বলল।

'নিজের দোষে মরেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা।

লাশটার ওপর থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল পাউলা। 'আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত, মি. রানা। রূপোর একটা প্লেটে করে বুমার কনসলিডেটেড মাইনিং লিমিটেড আমার হাতে তুলে দেয়ায়।'

'তোমার শোকের মাত্রা আমাকে অভিভূত করছে।'

হাসল পাউলা। 'আপনি আমার মস্ত একটা উপকার করেছেন।'

'আমি যতদূর জানি, রডনি আপনাকে বিয়ে করেননি,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তো মলি আর ওর ওই ছেলে পাবে, তাই না?'

'মলি কিছুই পাবে না, কারণ রডনি তার উইলে ওকে কিছুই দিয়ে যায়নি,' বলল পাউলা, ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। 'আর, আপনি ভুল জানেন–এক হপ্তা আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

'আর ইকো ও মিরেজ?'

'হ্যাঁ, রডনির উইলে ওদেরকে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি দেয়া হয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকাল পাউলা। 'তবে বাচ্চারা তো রোজই কোন না কোন অ্যাক্সিডেন্ট করছে।'

কঠিন সুরে রানা কিছু বলতে যাবে, দরজায় উদয় হলো রোগা-পাতলা এক তরুণ। রোগা, তবে শরীরটা পাকানো রশির মত।

'এই যে, শেলফিন, ঠিক সময়েই এসেছ,' বলল পাউলা। 'এই ভদ্রলোক, মাসুদ রানা, রডনিকে খুন করেছেন। তুমি বডিগার্ড, প্রতিশোধ নাও–খুন করো ওকে।'

রানার খেয়াল আছে, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে রডগার আর উইংকেলম্যান। কিন্তু জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখার সময়ও নেই মাইনাররা সবাই জাহাজে চড়তে পেরেছে কিনা। আরও একটা চিন্তার কারণ মুরল্যান্ড ও মলি। নিশ্চয়ই তারা বাচ্চা দুটোকে পায়নি, পেলে এতক্ষণে ফিরে আসত।

শেলফিনের দিকে তাকাল রানা। স্টাডিরুমে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। বসের লাশটা একবার দেখল, তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। হাসছে সে। বিধ্বস্ত রানাকে দেখেই বুঝে নিয়েছে, এ লোকের লড়াই করার শক্তি নেই।

রানাও জানে, এই মুহূর্তে একটা খরগোস কাবু করাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রতিপক্ষ দুর্বল ভাবছে ওকে, কাজেই অবাক করে দেয়ার সুযোগটা নিতে হবে ওকে। কিছুই বুঝতে না দিয়ে অকস্মাৎ বুনো মোষের মত মাথা নিচু করে ডাইভ দিল ও, গুঁতো মারল শেলফিনের পেটে। কিন্তু তাতে লাভ হলো সামান্যই, বা প্রায় হলোই না। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল শেলফিন, কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল পায়ের ওপর। রানা ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই ওর বগলের তলায় হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল শেলফিন, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আধ পাক

ঘোরাল, তারপর অনায়াসে ছুঁড়ে দিল একটা বুককেসের ওপর, রানার পিঠ কাচের দরজা চুরমার করে দিল। অবিশ্বাস্যই বটে যে কাঁপা কাঁপা পায়ে এখনও রানা দাঁড়িয়ে আছে, মেঝের ওপর ঢলে পড়েনি।

যন্ত্রণায় খাবি খাচ্ছে রানা। শরীরের সব ক'টা হাড়ই যেন ভেঙে গেছে। সমস্ত ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও, আবার ছুটে গেল শেলফিনকে লক্ষ্য করে। নিচ থেকে ওপর দিকে ঘুসি চালিয়ে শেলফিনের চিবুকে লাগাতে পারল, দেখতে পেল থেতলানো মাংস থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঘুসিটা প্রচণ্ড ছিল, অন্য কোন লোক হলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাত। কিন্তু শেলফিন হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্ত মুছে হাসতে লাগল। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে রানার দিকে হেঁটে আসছে সে, বক্সারের মত মাথা নিচু করে।

পা বাড়িয়ে মাথাটা নিচু করে নিল রানা, শেলফিনের চালানো ঘুসি এড়িয়ে আবার তাকে আঘাত করল পেটের নিচের দিকে। অনুভব করল ওর মুঠো মাংসের ভেতর ঢুকে হাড়ে ধাক্কা খেলো। পরমুহূর্তে ছিটকে পিছন দিকে পড়ল রানা, শেলফিনের দ্বিতীয় ঘুসিটা বুকে লেগেছে। ওর মনে হলো, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ছাতু হয়ে গেছে। এত জোরাল ঘুসি আগে বোধহয় কখনও খায়নি।

কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকল রানা, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে। যেন কুয়াশার ভেতর রয়েছে ও, অনেক কষ্টে হাঁটুর ওপর সিধে হলো। টলতে টলতে দাঁড়াতেও পারল, শেষ একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়।

পা বাড়িয়ে সামনে চলে এল শেলফিন, কনুই দিয়ে মারল পাঁজরে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল হাড় ভেঙেছে। বুকে নতুন ব্যথা শুরু হলো, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে হাত আর হাঁটুতে। কার্পেটের নকশার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানা, ইচ্ছে হলো কার্পেটের ওপরই চিরকাল এভাবে পড়ে থাকে। কে জানে, ও হয়তো মারা গেছে, এবং মারা যাবার পর যেখানে এসেছে সেখানে এই নকশা করা কার্পেট ছাড়া আর কিছু নেই।

অসহায় বোধ করছে রানা, জানে শরীর ওর কথা শুনবে না। ফায়ারপ্লেসের পোকারটা নাগালের মধ্যে পাবার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল, কিন্তু চোখে ঝাপসা দেখছে, নাগালের মধ্যে পেলেও শক্ত করে মুঠোয় ধরার শক্তি নেই। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল শেলফিন ঝুঁকছে। ওর একটা পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। খোলা দরজার চৌকাঠে আটকে গেল শরীরটা। পা ছেড়ে মাথার কাছে সরে এল শেলফিন, ওকে ধরে বসাল, তারপর চোখ সই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল। ওখানেই পড়ে থাকল রানা, প্রায় অচেতন, ব্যথায় অবশ, অনুভব না করলেও আন্দাজ করতে পারছে, ডান চোখের ওপর থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, শেলফিন রানার সঙ্গে সেই খেলা খেলছে। তবে একটু পরই একঘেয়ে লাগবে তার, তখন মেরে ফেলবে। শরীরে যে আর একটু শক্তি অবশিষ্ট আছে, জানা ছিল না, কিভাবে যেন ধীরে ধীরে দাঁড়াতে পেরেছে, আর তাতেই তুঙ্গে উঠে গেছে রানার আত্মবিশ্বাস। পা কাঁপছে, শরীর টলছে, কিন্তু গ্রাহ্য করতে চাইছে না। শেষ আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে।

'দেরি হলো, কারণ দুই ব্যাটা চাকর বাচ্চা দুটোকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল,' বলল মুরল্যান্ড, হঠাৎ দোরগোড়ায় উদয় হয়েছে। 'দরজা ভাঙতে সময় লাগল।'

কামরার চারদিকে তাকাল রানা, কিন্তু পাউলাকে কোথাও দেখতে পেল না।

মুরল্যান্ড দোরগোড়া থেকে আবার বলল, 'আমাকে একটা চান্স দাও, দোস্ত।' রানার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। শেলফিনের দিকে তাকাল, আঙুল নেড়ে ডাকল তাকে। 'এই ব্যাটা, এদিকে আয়। আহত মানুষের সঙ্গে লড়তে যাওয়াটা কাপুরুষতা।'

'না, ববি।' একটা হাত তুলে মুরল্যান্ডকে সামনে এগোতে নিষেধ করল রানা। 'ওর মরণ আমার হাতেই হতে হবে। যদি দেখো আমি পারছি না, ওকে তুমি গুলি করবে।'

মুরল্যান্ডের পিছনে এসে দাঁড়াল মলি। রানার রক্তাক্ত মুখ হয়ে দৃষ্টি নামল বুমারের লাশের ওপর। 'কি হয়েছে ড্যাডির?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন,' বিড়বিড় করল রানা।

'শেলফিন, আমি আসছি,' বলে পা বাড়াল রানা। সামনের দিকে ঝুঁকে আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে তৈরি হলো শেলফিন।

প্রথম দুটো ঘুসি ঝট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে এড়িয়ে যেতে পারল রানা। তৃতীয় ঘুসিটা এক পা পিছিয়ে দিল ওকে। তবে পড়ে যায়নি, থামেওনি, আবার এগোচ্ছে। শেলফিন লক্ষ করল, রানা শুধু আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, পাল্টা আঘাত করতে চাইছে না। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে পিছাতে শুরু করল সে।

ভঙ্গিটা রানার আত্মরক্ষার, তবে সামনে বাড়ছে; আর আক্রমণের ভঙ্গি নিয়ে পিছু হটছে শেলফিন। ডেস্ক ঘুরে চক্কর দিচ্ছে ওরা। রানার চেহারায় অতি সতর্ক বা ভয় ভয় ভাব রয়েছে, সেটা দেখে শেলফিন ভাবতেও পারেনি হঠাৎ লাফ দেবে ও। কাজেই শেলফিনকে খানিকটা অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে গেল রানা, প্রথম লাফেই দু'হাতের নাগালের মধ্যে চলে এল তার লম্বা গলাটা। এই গলা ধরার জন্যেই এতক্ষণ পাঁয়তারা কষছিল রানা।

ধরার পর ছাড়ায় কার সাধ্য। শেলফিন প্রায় অক্ষত, কোথাও তেমন জোরাল আঘাত পায়নি, কাজেই নিজেকে ছাড়াবার জন্যে যথেষ্ট শক্তি পাচ্ছে সে। কিন্তু কনুই চালিয়ে বা ঘুসি মেরে কোন লাভ হচ্ছে না। রানা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, যত আঘাতই আসুক, গলাটা কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না। দু'হাত দিয়ে পাইপটা শক্ত করেই ধরেছে ও, তবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় শেলফিনের কনুই আর হাঁটু অনবরত আঘাত করায় কোন রকমে শুধু ধরে থাকতেই পারছে, চাপ বাড়াতে পারছে না।

ধীরে ধীরে একটা আতঙ্ক ভর করল, কনুই আর হাঁটু চালানো বন্ধ করে রানার হাত থেকে শেলফিন এখন গলাটা মুক্ত করতে চাইছে। রানার দুই কব্জি ধরে নিচের দিকে টান দিচ্ছে সে।

এবার রানা সুযোগ পেল শেলফিনের গলায় চাপ বাড়াবার। এতক্ষণ গলা ধরে ঝুলে ছিল, এবার পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘৃণা আর আক্রোশ থেকে

উৎসারিত প্রবল আসুরিক শক্তি অনুভব করছে দুই হাতে। শেলফিনের গলা বুজে গেছে, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে সে। এমন সহজ একটা কৌশলে দুর্বল প্রতিপক্ষ তাকে কাবু করে ফেলছে, এ সে বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু যে আতঙ্কে, তা নয়, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখ জোড়া। দুর্বল হয়ে পড়ছে সে, আর সেটা অনুভব করে রানার হাতে যেন আরও জোর এসে যাচ্ছে। মনে হলো এক সময় কোটর ছেড়ে শেলফিনের চোখ দুটো বেরিয়ে আসবে। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার। অক্সিজেনের অভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করল গোটা শরীর। তারপর স্থির হয়ে গেল। গলাটা ছেড়ে দিল রানা। মেঝের ওপর ঢলে পড়ল শেলফিনের নিষ্প্রাণ দেহ।

মাতালের মত লাগছে রানাকে, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে; টলতে টলতে বলল, 'এখুনি পালাতে হবে। নিমবাস থাকছে না, ধুলোর প্রতিটি কণা আকাশে উড়বে।'

'কি বললে? আবার বলো।' হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ড।

'খুলে বলার সময় নেই। নিমবাস বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।' মলির দিকে তাকাল রানা। 'বাড়ির আশপাশে যানবাহন কিছু আছে কিনা জানো?' হাতঘড়ির দিকে তাকাতে ভয় করছে ওর, তবু তাকাল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নির্ধারিত সময় শেষ হতে আর মাত্র আট মিনিট বাকি। ওর প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলছে মলি, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। জেটির দিকে এখনও বহু লোক ছুটছে, তাদের সংখ্যা এক দেড়শোর কম নয়, বেশিরভাগই বেঁটে আর হলদেটে; কিন্তু ছুটছে অকারণে, রানা এজেন্সির চার্টার করা জাহাজ এরইমধ্যে জেটি থেকে রওনা হয়ে গেছে, লেগুন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে খোলা সাগরে। এক কিলোমিটার দূরে লোকগুলো, রানার চিৎকার তাদের কানে পৌঁছুবে না, তবু ওর বলতে ইচ্ছে করল তারা যেন দ্বিতীয় জেটিতে বাঁধা ইয়টে উঠে পড়ে।

লোকগুলো শেষ পর্যন্ত কি করল দেখার সুযোগ হলো না, ওকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল মলি। 'কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না? বাড়ির পাশের গ্যারেজে দুটো মিনিকার আছে, খনিগুলোয় আসা-যাওয়া করার কাজে ড্যাডি ব্যবহার করতেন।'

একটা বাচ্চাকে ধরে কাঁধে তুলে নিল রানা। 'কার কি নাম তোমাদের?'

রানার মুখে রক্ত দেখে ভয় পেয়েছে, ছেলেটা তোতলাতে শুরু করল, 'ইকো।' হাত তুলে ভাইকে দেখাল সে, মুরল্যান্ডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'মিরেজ।'

'কখনও হেলিকপ্টারে চড়েছ, ইকো?'

'না, তবে চড়ার খুব শখ।'

'শখ থাকলে সেটা একদিন মেটেই।'

স্টাডিরুম থেকে সবার শেষে বেরুচ্ছে মলি। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকাল ও। আপনমনে মাথা নাড়ল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল করিডরে।

নয়

বাড়ির পাশের গ্যারেজে অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি মিনিকার দুটো পাওয়া গেল। এগুলো হোল্ডেন নামে পরিচিত। হলুদ রঙ করা, খনিতে আসা-যাওয়া করতে সুবিধে হবে ভেবে সবগুলো দরজা খুলে ফেলা হয়েছে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, ইগনিশনেই চাবি পাওয়া গেল। সবাইকে নিয়ে প্রথম কারটায় চড়ল রানা। সহজেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

তোরণ কাছাকাছি চলে আসছে দেখে লাফ দিয়ে নিচে নামল মুরল্যান্ড, ছুটে গিয়ে খুলে দিল গেট। রাস্তায় মাত্র উঠে এসেছে কার, সিকিউরিটি গার্ডে বোঝাই একটা ভ্যানকে উল্টোদিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল। 'হাসো সবাই, হাত নাড়ো,' নির্দেশ দিল রানা। 'দেখে যাতে মনে হয় রডনি বুমারের আত্মীয়স্বজন তোমরা।'

ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার ভ্যানের গতি কমাল, হোল্ডেনের আরোহীদেরকে কৌতূহল নিয়ে দেখছে। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে, স্যালুটও করল। চিনল কিনা বলা কঠিন, সম্ভবত ধরে নিয়েছে মালিকের অতিথি হবে। তোরণের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল ভ্যান। হোল্ডেনের গতি বাড়িয়ে দিল রানা, ডকের দিকে ছুটছে।

ডকের পথে কোন লোককে দেখা যাচ্ছে না। কোন ট্রাক বা কারও নেই। দুটো জেটিই খালি পড়ে আছে। চীনা পেভ লেবাররা কোনদিকে গেছে বুঝতে পারল না রানা। হাতঘড়ির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে ও, খুব বেশি হলে হাতে আর তিন কি চার মিনিট সময় আছে।

'ভ্যানটা ফিরে আসছে,' হঠাৎ সতর্ক করল মুরল্যান্ড।

তোরণের পাশে অফিস রুমে লাশ পড়ে আছে, ওগুলো দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ভ্যানের সিকিউরিটি গার্ডরা। তবে এত তাড়াতাড়ি ওরা ধাওয়া করবে, ধারণা করেনি রানা। ওর মাথায় এখন একটাই চিন্তা, গার্ডরা ওদেরকে গুলি করার রেঞ্জে পাবার আগেই হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে ওরা উঠে যেতে পারবে কিনা।

উইন্ডশীল্ডের দিকে হাত লম্বা করে সামনের গার্ডকে দেখাল মুরল্যান্ড, সিকিউরিটি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে মিনিকারের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওর কি ব্যবস্থা করা হবে?'

'তোমার কাছে অটোমেটিক আছে কি করতে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি যদি ভয় দেখিয়ে ভাগাতে ব্যর্থ হই, গুলি করে ফেলে দেবে।'

ঘণ্টায় একশো বিশ কিলোমিটার স্পীডে কাঠের ডকে উঠে পড়ল রানা, পরমুহূর্তে ব্রেক পেডালে পা চেপে ধরল, চাকাগুলোকে হড়কাতে দিয়ে গাড়ির নাক তাক করল সরাসরি সিকিউরিটি অফিসের দিকে। অনিশ্চিত গার্ড বুঝতে পারল না কোন দিকে লাফ দেবে, নিরাপদ মনে হওয়ায় শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

কার সিধে করে নিয়ে গ্যাংওয়ের পাশে থামল রানা। 'জলদি!' লাফ দিয়ে নিচে নামল ও। 'ববি, কপ্টারে উঠে যাও, রশি খুলে স্টার্ট দাও এঞ্জিন। মলি, বাচ্চাদের নিয়ে সেলুনে ঢুকে পড়ো, কেউ যেন দেখতে না পায়। কপ্টারের রোটর ব্লেড না ঘোরা পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করো। তারপর ছুটবে।'

'তুমি কি করবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, কার থেকে বাচ্চা দুটোকে বের করার কাজে মলিকে সাহায্য করছে। ইকো আর মিরেজকে নিয়ে গ্যাংওয়ে ধরে ছুটল মলি।

'মুরিং লাইন খুলে ডক থেকে ইয়ট সরাব, গার্ডরা যাতে উঠতে না পারে।'

বোলার্ড থেকে ইয়টের ভারী মুরিং লাইন খুলতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা, খোলার পর কিনারা দিয়ে ফেলে দিতে হলো পানিতে। ম্যানর হাউসের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটার দিকে শেষ একবার তাকাল ও। মেইন রোডে বাঁক ঘোরার সময় ভ্যানের ড্রাইভার ভুল করে বসেছে, চাকা হড়কে যাওয়ায় আড়াআড়ি ভঙ্গিতে কাদাভর্তি মাঠে নেমে গেছে ভ্যান। লেগুনের দিকের রাস্তায় ফিরে আসতে বেশ কয়েকটা মূল্যবান সেকেন্ড নষ্ট হলো তাদের।

হেলিকপ্টারের এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। আর সেই শব্দের সঙ্গে ইয়টের ভেতর থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ।

গ্যাংওয়ে ধরে ছুটল রানা, ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বুকের রক্ত। নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে ও, সার্চ না করেই মলি আর বাচ্চা দুটোকে ইয়টে ঢুকতে বলায়। নাইন মিলিমিটারের খোঁজে পকেটে হাত ভরল, তারপর মনে পড়ল ওটা মুরল্যান্ডকে দিয়েছিল। ডেক ধরে ছুটছে, বিড়বিড় করছে আপনমনে, 'প্লীজ, গড!' প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেলল সেলুনের দরজা, লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

মলির করুণ আকুতি শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা।

'না, পাউলা, না! ওদেরকে মেরো না, প্লীজ!'

দৃশ্যটা দেখে রানার গোটা অস্তিত্ব কেঁপে উঠল, শোকে খাঁ-খাঁ হয়ে উঠল মনটা। মলি মেঝেতে, পিঠ ঠেকে আছে একটা বুককেসের গায়ে, বাচ্চারা ওর বাহু খামচে ধরে আছে, দু'জনেই ভয়ে ফোঁপাচ্ছে। রক্তলাল একটা দাগ ছড়িয়ে পড়ছে ব্লাউজে, ঠিক নাভির ওপর ছোট্ট একটা ফুটো।

সেলুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পাউলা, হাতের ছোট অটোমেটিকটা বাচ্চা দুটোর দিকে তাক করা, তার মুখ আর নগ্ন বাহু পালিশ করা আইভরির মত। চোখে শ্বাপদের ঠাণ্ডা দৃষ্টি, চেহারায় কোন আবেগ নেই, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে শক্ত ভাবে চেপে বসেছে। চোখ তুলে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, রানা যেন ছাই হয়ে যাবে। 'আমি জানি তুমি মরোনি,' বলল সে, গলার আওয়াজ শুনে মনে হবে নেশা করেছে।

ধীর পায়ে এগোল রানা, থামল মলি আর ওর বাচ্চা দুটোকে আড়াল করে। 'অস্ত্রটা ফেলে দাও, পাউলা। তা না হলে তোমার অবস্থাও শেলফিনের মত হবে।'

'মলি আর ওর বাচ্চা দুটোই তো শেষ বাধা,' বলে হেসে উঠল পাউলা।

'এখন অবশ্য তুমিও একটা উটকো ঝামেলা, মাসুদ রানা।' হাতের অটোমেটিকটার দিকে তাকাল সে। 'এতে অনেকগুলো বুলেট আছে। প্রথমে মলিকে মারব, তারপর বাচ্চা দুটোকে, সবশেষে তোমাকে। বাধা দেবে? পারলে দাও।' খিলখিল করে হেসে উঠল সে।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। 'মলি তো এরইমধ্যে মারা গেছে,' মিথ্যে কথা বলল ও।

একপাশে ঝুঁকে রানার পিছনে মেঝেতে পড়ে থাকা মলিকে দেখার চেষ্টা করল পাউলা। 'তাহলে চাক্ষুষ করো কিভাবে আমি তার যমজ ছেলে দুটোকে পরপারে পাঠিয়ে দিই।'

'না!' রানার পিছন থেকে আঁতকে উঠল মলি। 'দোহাই লাগে, আমার বাচ্চাদের মেরো না!'

হাতের অস্ত্র তুলে রানাকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করছে পাউলা, মলি আর বাচ্চা দুটোকে গুলি করার জন্যে।

লাফ দিল রানা; জানে নির্ঘাত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। শূন্যে থাকতেই দেখতে পেল অটোমেটিকের মাজল ওর বুকের দিকে ঘুরে গেল। দূরত্বটা অনেক বেশি, গুলি হবার আগে অতিক্রম করা সম্ভব হবে না, জানে। দু'মিটার দূর থেকে পাউলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

প্রায় একই সঙ্গে দুটো বুলেট ধাক্কা মারল রানাকে, মাংস ভেদ করে ভেতরে ঢুকল। ধাক্কাগুলো রানা প্রায় অনুভবই করল না, ঘৃণা আর রাগে এমনই অবশ হয়ে আছে শরীর। কোন ব্যথাও লাগছে না। পাউলার ওপর পড়ল ও। পাউলার নরম শরীরটা পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল, আছাড় খেলো নিচু কফি টেবিলের ওপর, ভারী বস্তার মত তাকে পিষে দিল রানার ভারী শরীর। রোমহর্ষক একটা আওয়াজ হলো, যেন শুকনো একটা ডাল ভেঙে গেল–শিরদাঁড়াটা তিন জায়গায় ফেটে গেছে।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল পাউলার গলা চিরে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হলেও, চোখ দুটো থেকে আক্রোশ আর ঘৃণা এতটুকু দূর হয়নি। 'উচিত শাস্তি হয়েছে তোমার...,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে পাউলার শরীর, তাকিয়ে আছে রানার পাঁজর আর বুকের দিকে, ওই দুই জায়গা থেকে রক্তের বৃত্ত বড় হচ্ছে। '...তুমি মারা যাচ্ছ।' অস্ত্রটা এখনও শক্ত হাতে ধরে আছে, আরেকবার তুলতে চাইছে রানার দিকে। কিন্তু মস্তিষ্কের নির্দেশ মত কাজ করছে না শরীরটা। হঠাৎ পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছে সে।

'হয়তো,' ধীরে ধীরে বলল রানা, মুখের হাসিটা যেন কফিনের শক্ত হাতলের মত কঠিন, নিশ্চিতভাবে জানে পাউলার শিরদাঁড়া মেরামত যোগ্য নয়। 'তবে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকার চেয়ে ভাল সেটা।'

পাউলার ওপর থেকে নিজেকে তুলে হোঁচট খেতে খেতে মলির দিকে এগোল রানা। নিজের কথা ভুলে বাচ্চা দুটোকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মলি। বাচ্চা দুটো কাঁদছে এখনও, ভয়ে কাঁপছে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, লক্ষ্মী সোনারা, মানিকরা আমার,' বিড়বিড় করছে ও। 'তোমার কাকা আছেন, তিনিই

তোমাদের দেখবেন...'

মলির পাশে হাঁটু গেড়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। বুলেট খুদে একটা ফুটো করে ভেতরে ঢুকেছে, কিন্তু বেরিয়ে গেছে পিঠে বিরাট একটা গর্ত তৈরি করে। যাবার পথে ভেতরের নাড়ি আর রক্তনালীগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এরইমধ্যে রক্তবমি করেছে মলি। বলে দেয়ার দরকার নেই যে মারা যাচ্ছে বেচারি। তবু এখুনি যদি হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব হয়, ডাক্তাররা একটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রানার হৃদয় যেন বরফ ভর্তি কোন গহ্বরে পড়ে গেছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল ওর, যদিও গলা থেকে কোন শব্দ বেরুল না, শুধু শোকে কাতর ক্ষীণ গোঙানির একটা আওয়াজ উঠে এল অন্তরের অন্তস্তল থেকে।

ওদের পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখে অস্থির হয়ে উঠল মুরল্যান্ড। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গেছে, দ্বীপের মাথায় পুবের আকাশ কমলা হয়ে উঠেছে। হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে ইয়টের ডেকে নামল সে, ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের নিচে মাথা নত করে ছুটল। ঠিক এই সময় সিকিউরিটি গার্ডদের নিয়ে ভ্যানটাও উঠে এল ডকে। মুরল্যান্ড ভাবছে, রানা আর মলির হলো কি? কি করছে ওরা? মুরিং লাইন দেখতে পেল সে, শিথিল হয়ে ঝুলছে পানিতে। ইয়ট এরইমধ্যে স্রোতের মধ্যে ধরা পড়েছে, ডক থেকে সরে এসেছে প্রায় ত্রিশ মিটারের মত।

আতঙ্ক অনুভব করছে মুরল্যান্ড। গার্ডরা এখনও কেন গুলি করছে না ভেবে অবাক হলো সে। মালিকের ইয়ট আর কপ্টারের ক্ষতি হবে, তাই? নাকি মালিকের মেয়ে ইয়টে আছে বলে?

গার্ডরা ডক ধরে ছুটে আসছে। ইয়ট থেকে আর মাত্র একশো মিটার দূরে তারা।

গার্ডরা আসছে, তার ওপর রানার কোন খবর নেই, এ-সব নিয়ে এতই উদ্বিগ্ন মুরল্যান্ড যে গোটা দ্বীপ জুড়ে কুকুর-বিড়াল আর গরু-ছাগলের অস্থিরতা বা চিৎকার-চেঁচামেচি খেয়ালই করল না সে। খেয়াল করল না দ্বীপের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি চক্কর দিতে শুরু করেছে। অদ্ভুত একটা মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, সেই সঙ্গে পায়ের নিচে ডেক কেঁপে উঠল, কেঁপে উঠল ডক, মাটি আর পাহাড়ী ঢাল; উথলে উঠল লেগুনের পানি। সাউন্ড ওয়েভ প্রচণ্ড ইনটেনসিটি নিয়ে আঘাত করেছে নিমবাসকে।

মেইন সেলুন যখন আর মাত্র কয়েক পা দূরে, ঘাড় ফিরিয়ে গার্ডদের দিকে তাকাল মুরল্যান্ড, আর তখনই বুঝতে পারল কি ঘটছে। গার্ডরা ডকে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে গেছে, ডকের পাটাতন সাগরের ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু হচ্ছে। ইয়ট ও হেলিকপ্টারের কথা ভুলে গেছে তারা, ভুলে গেছে প্রতিপক্ষের কথা, সবাই মুখ তুলে তাকিয়ে আছে কালো ধোঁয়ার একটা ছোট্ট মেঘের দিকে। মাউন্ট রডগার থেকে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়াটা। আগ্নেয়গিরির ঢালের ওপর তাকাল মুরল্যান্ড, নিগ্রো আর শ্বেতাঙ্গ গার্ডরা খনির মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে দলে দলে। মাউন্ড উইংকেলম্যানের দিকে

তাকাল মুরল্যান্ড, ওটা থেকেও ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। রানার সতর্কবাণী মনে পড়ল তার। নিমবাস তাহলে সত্যি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।

দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে সেলুনে ঢুকল সে। পরক্ষণে পাথর হয়ে গেল। রানার বুক আর কোমর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে গুঙিয়ে উঠল। মলির ক্ষতটাও দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে কফি টেবিলের ওপর প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে থাকা পাউলা পারকারকে। 'গড, কি ঘটল?'

উত্তর না দিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'ভূমিকম্প শুরু হয়েছে?'

'মাটি কাঁপছে। পাহাড়ের মাথা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'তাহলে আর আমাদের হাতে সময় নেই।'

রানার পাশে হাঁটু গাড়ল মুরল্যান্ড, মলির আঘাতটা পরীক্ষা করল। চেহারা কালো হয়ে গেল তার। 'দেখে ভাল মনে হচ্ছে না।'

মুখ তুলে তাকাল মলি, চোখে করুণ আবেদন। 'আমার বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আপনারা চলে যান, প্লীজ।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড। 'এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয় আমরা সবাই যাব, নয়তো কেউ যাবে না।'

হাত বাড়িয়ে মুরল্যান্ডের বাহু খামচে ধরল রানা। 'সময় নেই। যে-কোন মুহূর্তে গোটা দ্বীপ উড়ে যাবে। যাওয়া আমারও হচ্ছে না। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে চলে যাও তুমি। এখুনি যাও। এই মুহূর্তে। কোন তর্ক নয়।'

যেন বজ্রাঘাতে বোবা হয়ে গেছে মুরল্যান্ড। অবিশ্বাসে তার মাথা ঠিক মত কাজ করছে না। রানাকে ছেড়ে যেতে হবে, এই চিন্তা আতঙ্কিত করে তুলল তাকে, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল শরীরটা। এরকম সঙ্কটময় মুহূর্ত ওদের কর্মজীবনে আরও অনেকবার এসেছে, বন্ধুকে ছেড়ে যাবার কথা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি সে। 'অসম্ভব। তোমাদের কাউকেই আমি ফেলে যেতে পারি না।' ঝুঁকল সে, মলির শরীরের নিচে হাত গলাচ্ছে, বুকে তুলে নেবে। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

কনুইয়ের ধাক্কায় মুরল্যান্ডের হাত সরিয়ে দিল মলি। 'রানাই ঠিক বলছে, আপনি বুঝতে পারছেন না? সময় নেই, শুধু আমার বাচ্চা দুটোকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন। আমাদেরকে আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান? দু'জনের কেউই আমরা বাঁচব না।'

রডনি ইয়র্কের লগবুক আর চিঠিগুলো মুরল্যান্ডের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'ইয়র্কের কাহিনী তার পরিবারকে যেন জানানো হয়,' বলল ও, গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ শান্ত। 'নাউ ফর গড'স সেক, ছেলে দুটোকে নিয়ে পালাও তুমি।'

যাকে কেউ কখনও কাঁদতে দেখেনি, সেই মুরল্যান্ডের চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। 'তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? আমাকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দেবে না?' রানার দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বাইরে হঠাৎ করেই দুনিয়াটা আকাশবিহীন হয়ে গেছে। মাউন্ট উইংকেলম্যান ছাই উদ্‌গীরণ করছে। সেই ছাই ঘন মেঘ হয়ে ঢেকে ফেলেছে

গোটা আকাশ। গুরুগম্ভীর বজ্রপাতের মত গর্জন ভেসে এল। চোখের পলকে অন্ধকার হয়ে গেল নতুন প্রভাত। প্রকাণ্ড ছাতার আকৃতি নিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে চূড়া থেকে। ধোঁয়ার ভেতর লকলক করছে আগুনের টাওয়ার। তারপর কেয়ামত শুরু হয়ে গেল। বিকট গর্জনের সঙ্গে হাজার হাজার টন গলিত লাভা লাফ দিল শূন্যে।

মুরল্যান্ডের মনে হলো তার আত্মা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, শোকে কাতর চোখে বাস্তবতা উপলব্ধি করার শান্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল। 'ঠিক আছে।' ফোঁপাচ্ছে সে। 'কেউ যখন এখানে আমাকে চায় না, যাচ্ছি আমি।'

তার হাতটা ধরল রানা। 'বিদায়, দোস্ত। কোনদিন ভুলো না যে তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ।'

'আবার দেখা হবে,' ভাঙা গলায় বিড় বিড় করল মুরল্যান্ড, আবার তার কান্না পাচ্ছে। এই কয়েক সেকেন্ডে তার বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। কিছু বলতে চাইল সে, গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না, মলির বাচ্চা দুটোকে দুই বগলে নিয়ে সিধে হলো, ছুটে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

ডায়মন্ড মাইনের ভেতর শ্রমিক আর সুপারভাইজার যারা ঘুমাচ্ছিল, ভূমিকম্প শুরু হতেই এগজিট ট্যানেল দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

পাতালের ভেতর তাপমাত্রা অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বাড়ছে। গার্ড, শ্রমিক আর সুপারভাইজাররা উন্মাদের মত সাগরের দিকে ছুটছে, ভুল করে ধরে নিয়েছে ওদিকটাই বোধহয় নিরাপদ। তবে একটা দল ছুটল দুই আগ্নেয়গিরির মাঝখানে ছোট একটা পাহাড়ের দিকে। নিমবাসে আদৌ কেউ যদি বেঁচে যায়, ওখানে যারা পৌঁছুতে পারবে তাদেরই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যে এক দেড়শো লোককে জেটির দিকে ছুটতে দেখেছিল রানা, দিক বদলে ওদিকেই চলে গেছে তারা।

দুই দৈত্য বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে থাকার পর আজ আবার জাগছে। ভয়ঙ্কর নৃত্য প্রদর্শনীতে একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। মাউন্ট উইংকেলম্যান জ্যান্ত হলো প্রথমে গোড়ায় কয়েকটা বিশাল আকৃতির ফাটল তৈরি করে, সেই ফাটল থেকে অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত আকাশে উঠে এল বিপুল পরিমাণ লাভা। ফাটলগুলোর পাশে সারি সারি শ্যাফট তৈরি হলো, ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিল আগুনের পর্দা। উপুড় করা নদীর মত ঢাল বেয়ে নেমে এল গলিত লাভা, বন-জঙ্গল ডুবিয়ে দিয়ে ছুটছে।

বাতাসে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হওয়ায় গাছপালাগুলো পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেতে শুরু করেছে। লাভার আক্রমণে ধরাশায়ী হলো পরমুহূর্তে, ছাই হয়ে গেল পুড়ে, তলিয়ে গেল তরল পাথরের নিচে। বন্যার মত ধেয়ে আসা লাভার গ্রাস থেকে যে-সব ঝোপ বা গাছ রক্ষা পেল সেগুলোকে কালো আর মরা দেখাচ্ছে। আকাশ থেকে খসে পড়া পাখিতে ভরে গেছে নিচের মাটি—ধোঁয়া, ছাই আর আগুনের শিখায় মারা গেছে।

যেন স্বর্গীয় কারও নির্দেশে সিকিউরিটি কমপাউন্ড ডুবিয়ে দিয়ে গলিত লাভা এক কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটাল চীনা পেভ লেবারদের ডিটেনশন ক্যাম্পটাকে, ফলে অন্তত তিনশো মাইনার প্রাণে বেঁচে গেল। উইংকেলম্যানের লাভা পরিমাণে বিপুল হলেও, গতি তেমন জোরাল নয়, খিঁচে দৌড় দিলে সাধারণ একজন মানুষ আগে থাকতে পারবে। উইংকেলম্যান প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করল বেশি, তবে প্রাণ হরণ করল কম।

কিন্তু তারপর শুরু হলো মাউন্ড রডগারের পালা।

কয়েক হাজার মিটার নিচে থেকে লাভা যে চাপ সৃষ্টি করছে তা সহ্য করতে পারল না রডগারের পশ্চিম ঢাল। তরল পাথর, প্রচণ্ড উত্তাপে সাদা হয়ে আছে, একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলল ঢালের পুরু ত্বক, সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটল ফাটলগুলো, ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ফুটন্ত কাদা আর বাষ্প। শব্দ শুনে মনে হলো এক হাজার ট্রেন ছুটে আসছে। ফাটলগুলো থেকে যা কিছু বেরুচ্ছে সবই সবেগে উঠে যাচ্ছে আকাশে। তারপর শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। লাভার উদ্গীরণ শুরু হলো আরও খানিক পরে। কাচ গলে গেল, কংক্রিট বিল্ডিং ধরাশায়ী হলো, যে-কোন কাঠামো চোখের পলকে ছাইয়ে পরিণত হলো। ধাবমান লাভা পিছনে এমন কিছু রেখে গেল না যার আকৃতি চেনা যায়।

সবশেষে বেরিয়ে এল টকটকে লাল লাভা। আগে যদি নদী উপুড় করা হয়ে থাকে, এবার সাগর ঢেলে দেয়া হয়েছে। সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দিয়ে লাল লাভা ঝাঁপ দিল লেগুনে। টগবগ করে ফুটতে শুরু করল পানি। গরম বাষ্পে ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। নিমবাসকে সৌন্দর্যের আধার বলা হত, কুৎসিত ছাই আর নোংরা কাদায় ঢাকা পড়ে গেছে সব।

ডক আর ইয়টে জ্বলন্ত পাথর বৃষ্টি শুরু হবার আগেই হেলিকপ্টার নিয়ে নিমবাস থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে মুরল্যান্ড। ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের ব্যাপকতা সে দেখতে পাচ্ছে না। দৃশ্যটা ঢেকে রেখেছে বিশাল অবিচ্ছিন্ন ছাইয়ের মেঘ, দ্বীপ থেকে তিন হাজার মিটার উঁচু।

ক্ষীণ হলেও একটা আশা জাগল মুরল্যান্ডের মনে যখন সে দেখল হঠাৎ করে সচল হয়ে উঠেছে ইয়টটা। লেগুনের পানি কেটে রীফ ঘিরে থাকা চ্যানেলের দিকে এগোচ্ছে ওটা। আঘাত যতই গুরুতর হোক, ইয়টটা চালু করতে পেরেছে রানা। তবে যত দ্রুতবেগেই ছুটুক ইয়ট, জ্বলন্ত গ্যাসের মত ছাইয়ের যে মেঘটা লেগুনে ঝাঁপ দেয়ার আগে সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, প্রতিযোগিতায় তার সঙ্গে পারবে না। মুরল্যান্ডের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। ছুটন্ত ইয়টের পিছু নিল ধাবমান অগ্নিকুণ্ড, মাঝখানের দূরত্ব চোখের পলকে কমে আসছে। গ্যাস, বাষ্প, ছাই, লাল শিখা, ফুটন্ত পানি গিলে ফেলল ইয়টটাকে, আকাশ থেকে এখন আর সেটাকে দেখতেই পাচ্ছে না মুরল্যান্ড। হাজার ফুট ওপর থেকে দেখে মনে হলো নারকীয় ওই অগ্নিকুণ্ডে দু'চার সেকেন্ডের বেশি বেঁচে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

শরবিদ্ধ পাখির মত শোকে কাতর হয়ে পড়ল মুরল্যান্ড। বাচ্চা দুটোর মা আর প্রিয়তম বন্ধু নিচে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখার জন্যে বেঁচে আছে সে, এরচেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণকে অভিশাপ দিচ্ছে সে, অভিশাপ দিচ্ছে নিজের অসহায়ত্বকে। কার প্রতি জানে না, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল সে। অভ্যাসবশত কপ্টার চালাচ্ছে, সমস্ত রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা হয়ে গেছে চেহারা। সে জানে, তার অন্তরের ব্যথা কোনদিনই সারবে না। চিরকাল কৌতুক করতে অভ্যস্ত সে, নিমবাস দ্বীপের সঙ্গে মৃত্যু ঘটল সেটার। রানার সঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে সে, বিপদের সময় সাহায্য করার জন্যে সব সময় পরস্পরকে কাছে পেয়েছে তারা। এমন বহুবার ঘটেছে যখন মনে হয়েছে রানা বেঁচে নেই, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে অভয় দিয়েছে মুরল্যান্ড–রানা মরতে পারে না। তার দৃষ্টিতে রানা অমর।

বিশ্বাসের একটা ফুলকি তৈরি হচ্ছে মুরল্যান্ডের ভেতরে। ফুয়েল গজ দেখে নিয়ে চার্ট স্টাডি করল, সিদ্ধান্ত নিল বাচ্চাদের নিয়ে তাসমানিয়ার হুবার্টে ল্যান্ড করাই ভাল। ওদেরকে কর্তৃপক্ষের নিরাপদ হাতে তুলে দিয়ে ফুয়েল নেবে সে, তারপর নিমবাসে ফিরে আসবে। আর কিছুর জন্যে না হোক, বন্ধুর লাশটা উদ্ধার করতে হবে তাকে।

রানাকে হতাশ করবে না মুরল্যান্ড। জীবিতকালে কখনও করেনি, মৃত্যুর পরও করবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে হালকা বোধ করল সে। ইকো আর মিরেজের সঙ্গে শান্ত সুরে কথা বলল। ইতিমধ্যে ছেলে দুটো ভয় কাটিয়ে উঠেছে, জানালা দিয়ে অবাক হয়ে নিচের সাগর দেখছে।

কপ্টার নিয়ে মুরল্যান্ড ইয়ট ত্যাগ করতেই টলতে টলতে সিধে হলো রানা, সিঙ্ক থেকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে জড়িয়ে দিল মলির মাথায়। তারপর যেখানে যত কুশন, চেয়ার ও অন্যান্য ফার্নিচার পেল সব জড়ো করল মলির চারধারে; স্তূপটার নিচে প্রায় চাপা পড়ে গেল সে। আগুনের একটা নদী ধেয়ে আসছে, জানে রানা। অথচ মলিকে রক্ষার জন্যে আর কিছুই ওর করার নেই। হোঁচট খাচ্ছে, কোন রকমে হুইলহাউসে ঢুকতে পারল, শরীরের একটা পাশ খামচে ধরে আছে। ওখানে, অ্যাবডমিনাল মাসলে একটা বুলেট ঢুকেছে, খুদে একটা ফুটো করেছে কোলনে, মুখ লুকিয়েছে পেলভিক গার্ডলে। দ্বিতীয় বুলেটটা পাঁজরের হাড়ে ঘষা খেয়ে চুপসে দিয়েছে একটা ফুসফুস, তারপর বেরিয়ে গেছে পিঠের পেশী ভেদ করে। চোখের সামনে কালো হয়ে আসছে জগৎ, তাতে খসে পড়া ঠেকাবার জন্যে সমস্ত ইচ্ছেশক্তি এক করে কনসোলের ইন্সট্রুমেন্ট আর কন্ট্রোল চেক করছে ও।

ইয়টে ফুয়েল প্রায় নেই বললেই চলে। সম্ভবত কোথাও যাবার প্রয়োজন হলেই শুধু রিফুয়েলের আয়োজন করে ক্রুরা। নির্দিষ্ট সুইচ খুঁজে পেয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, থ্রটল ঠেলে দিল সামনের দিকে। উঁচু হলো বো, পায়ের নিচে ডেক কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে স্টার্নের পিছনের পানিতে সফেন আলোড়ন সৃষ্টি

হলো। হেলমের ম্যানুয়েল কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করছে রানা, খোলা সাগরের দিকে কোর্স।

উত্তপ্ত ছাই মোটা চাদরের মত খসে পড়ছে। ধাবমান আগুনের গর্জন শুনতে পাচ্ছে রানা। জ্বলন্ত পাথর অগ্নিগোলকের আকৃতি নিয়ে নেমে আসছে আকাশ থেকে, পানিতে পড়লে হিসহিস আওয়াজের সঙ্গে বাষ্পের মেঘ তৈরি হচ্ছে। এই অগ্নিগোলক বেরিয়ে আসছে মাউন্ট রডগার থেকে, কামানের গোলার মত, তারপর বিরতিহীন খসে পড়ছে লেগুনে। লাভার স্রোত ঢেউয়ের আকৃতি নিয়ে ছুটে আসছে একের পর এক, একটার ওপর চড়াও হচ্ছে একটা, এভাবে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠছে, লেগুনে ঝাঁপ দেয়ার পরও গতি কমছে না, ধাওয়া করছে ইয়টটাকে। এরইমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে লেগুনের একটা অংশ, লাভার স্রোত এখন দুশো মিটার উঁচু, অতিকায় ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল ইয়টের ওপর, লেগুন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেই। পিছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো ইয়ট, রাডার আর রেডিও মাস্ট উড়ে গেল লাভা স্রোতের তোড়ে, পিছু নিল লাইফবোট, রেইলিং আর ডেক ফার্নিচার। আলোড়িত অগ্নিকুণ্ডের ভেতর দিয়ে আহত তিমির মত সামনে এগোবার চেষ্টা করছে ইয়ট। অগ্নিশিখায় মোড়া পাথর আছড়ে পড়ল সুপার-স্ট্রাকচার-এর ছাদ আর ডেকে, ইয়টটাকে দুমড়ে-মুচড়ে আবর্জনায় পরিণত করছে।

হুইলহাউসে ফোস্কা পড়ার মত গরম। রানার মনে হলো কেউ যেন উত্তপ্ত লাল মলম লেপে দিয়েছে ওর গায়ে। শ্বাসকষ্টে ছটফট করছে ও, বিশেষ করে একটা ফুসফুস চুপসে যাওয়ায় অক্সিজেনের অভাবে অতিরিক্ত ভুগছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, মলি যেন বেঁচে থাকে। পরনের ইউনিফর্ম থেকে ধোঁয়া উঠছে, এরইমধ্যে কুঁকড়ে গেছে মাথার চুল। হেলম ধরে হাঁপাচ্ছে রানা। অগ্নিঝড়ের বিকট গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুকের খাঁচায় হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। এত সবের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা এঞ্জিনের নিয়মিত আওয়াজ আর ইয়টটার মজবুত কাঠামো।

ওর চারপাশের জানালাগুলোয় ফাটল ধরল, তারপর ভেঙে পড়ল। এবার আর রেহাই নেই, ভাবল রানা। সম্পূর্ণ মনোযোগ, প্রতিটি স্নায়ু বোট চালাবার কাজে মগ্ন, যেন শুধু ইচ্ছেশক্তির জোরে আরও দ্রুত সামনের দিকে ছুটবে ওটা। তারপর হঠাৎ করে জলপ্রপাতের মত অবিচ্ছিন্ন আগুনের পর্দা হালকা হয়ে গেল, পিছিয়ে পড়ল, নোংরা পানি থেকে পান্না সবুজ স্বচ্ছ পানিতে চলে এল বোট। লাল টকটকে লাভা আর আগুনের ঢেউ অবশেষে সম্মুখগতি হারিয়ে ফেলেছে। তাজা বাতাসে ফুসফুস ভরল রানা। যদিও জানে না জখমগুলো কতটুকু গুরুতর, তবে গ্রাহ্য করছে না।

চ্যানেল হয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে এল ইয়ট। কনসোলের দিকে মন দিল রানা। নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্ট এখন আর কাজ করছে না। রেডিও আর স্যাটেলাইট ফোন, দুটোর সাহায্যেই মেডে পাঠাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দুটোই ডেড। এঞ্জিনগুলো ছাড়া বোটের কিছুই কাজ করছে না। অটোমেটিক কোর্স সেট করতে না পেরে বো পশ্চিম দিকে তাক করে হেলমটা বেঁধে রাখল রানা।

নিমবাস দ্বীপে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে গেছে, এ-খবর নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রেসকিউ শিপ এদিকে এলে ভাঙাচোরা ইয়টটাকে ঠিকই দেখতে পাবে।

কাঁপা কাঁপা পা ফেলে সেলুনে, মলির কাছে ফিরে আসছে রানা। অগ্নিদগ্ধ সেলুনে সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, ভাবতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হুইলহাউস আর সেলুনের মাঝখানে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল। সেলুনে হামলা করার পর আগুন তার স্বভাবসুলভ কাজ ঠিকমত সারতে পারেনি। মোটা ফাইবার গ্লাস আবরণ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। প্রচণ্ড উত্তাপ প্রথমে জানালার কাচগুলোকে ফাটিয়ে দিয়েছে, আগুনের শিখা ভেতরে ঢুকেছে ওই পথেই। ঢুকলেও সোফা আর চেয়ার, কাপড়চোপড় আর কুশনগুলোর নাগাল পায়নি।

চট করে একবার পাউলার দিকে তাকাল রানা। মাথার চুল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খোলা চোখ দুটো দুধের মত ঘোলা, গায়ের ত্বক সেদ্ধ চিংড়ি মাছের মত। হালকা কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠছে দামী কাপড়চোপড় থেকে। মৃত্যু এসে তাকে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

ব্যথা আর জখমের কথা ভুলে ব্যস্ত হাতে ফার্নিচারগুলো সরিয়ে স্তূপটার ভেতর থেকে মলিকে বের করল রানা। নিজের সঙ্গে কথা বলছে ও, মলির বেঁচে থাকা দরকার। ওর তো আমার জন্যে অপেক্ষা করার কথা। আমিই তো ওকে অভয় আর সান্ত্বনা দেব। বেচারি এত বছর পর ছেলে দুটোকে ফিরে পেয়েও নিজের কাছে রাখতে পারল না। ভয়ে বুক কাঁপছে, শেষ কুশনটা সরিয়ে ফেলল রানা। স্বস্তিবোধটা ঠাণ্ডা ঝর্ণার পানিতে অবগাহনের মত লাগল।

'মলি!' হাঁটু গেড়ে প্রায় ঢলে পড়ল রানা, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মলিকে। এতক্ষণে খেয়াল করল তার দু'পায়ের মাঝখানে কার্পেটের ওপর প্রচুর রক্ত জমে আছে। তাকে বুকে টেনে নিল ও, মাথাটা চেপে ধরল চওড়া কাঁধে, নাকে-চোখে ঠোঁট বুলাচ্ছে।

'তোমার ভুরু,' ফিসফিস করল মলি, ক্ষীণ হলেও হাসিটা দেখে মনে হবে খুব মজা পাচ্ছে।

'কি হয়েছে ভুরুর?'

'পুড়ে গেছে। মাথার চুলও তো।'

'সব সময় হ্যান্ডসাম দেখাবে এমন কোন কথা আছে?'

'আমার চোখে চিরকাল হ্যান্ডসাম থাকবে তুমি।' তারপর হঠাৎ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল মলির, বিষণ্ন ও উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। 'আমার বাচ্চারা? তারা কি নিরাপদ…?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বস্ত করল রানা। 'লাভা লেগুনে নেমে আসার আগেই ববি ওদেরকে নিয়ে আকাশে উঠে গেছে। এতক্ষণে নিরাপদ কোন তীরের কাছাকাছি চলে গেছে ওরা।'

মলির মুখ জোছনার মত ম্লান। কাচকড়ার ভঙ্গুর পুতুল যেন একটা। 'তোমাকে কথাটা বলা হয়নি। এখন বলি?' উত্তরের জন্যে থামল না। 'আমি

তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

'আমি জানতাম,' বিড়বিড় করল রানা, গলা বুজে আসছে।

'তুমিও কি আমাকে ভালবাস, সামান্য একটুখানি?'

'আমি আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তোমাকে ভালবাসি।'

একটা হাত তুলে ছাই লেগে থাকা রানার মুখে হাত বুলাল মলি। 'মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, অথচ প্রতিবার বিপদ হলেই মনে মনে তোমাকে ডেকেছি, আর কিভাবে যেন জানতে পেরে ছুটে এসেছ তুমি। কেন? কেন এত মায়া জাগালে?' কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলল। 'এই, আমাকে আরেকটু শক্ত করে ধরো তুমি। আমি তোমার হাতের ভেতর মরতে চাই।'

'তুমি মরবে না,' বলল রানা, হৃদয়টার টুকরো হওয়া ঠেকাতে পারছে না। 'তোমাকে নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণে বেরুব আমি, সঙ্গে ইকো আর মিরেজ থাকবে, গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়াব আমরা। দেখো না, কি মজা করি...'

'তুমি কি জানো, রানা, তোমার ভেতর একজন বোহেমিয়ান বাস করে? আমি জানি, আমার ভেতর করে। আমি বেঁচে থাকলে ভবঘুরে একটা জোড়া হতাম আমরা। দুনিয়াটাকে চষে বেড়াতাম।' তারপর মলি একটা গানের চরণ আবৃত্তি করল, 'টু ড্রিফটারস অফ টু সী দা ওয়ার্ল্ড।'

পরবর্তী লাইনটা বলে গেল রানা, 'দেয়ার ইজ সাচ আ লট অব ওয়ার্ল্ড টু সী।'

'আমার কথা ভুলে যেয়ো না, রানা। আর, আমার ছেলে দুটোকে দেখো।' সত্যি সত্যি আনন্দে হাসছে মলি। তারপর প্রজাপতির ডানার মত চোখের পাতা ঝাপটাল। স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

'না!' আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল রানা।

ওরও সমস্ত জীবনীশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। সচেতন থাকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে তলিয়ে গেল রানা, বোধহয় জানেও না কখন চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে।

শুভা দ্বীপের কাছে ডীপ ফ্যাদমে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, কপ্টারের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে কি ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল মুরল্যান্ড, তারপর অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের এয়ার-টু-সী রেসকিউ ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করল। হুবার্টে পৌছুবার আগেই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা আর নিউজ মিডিয়ার রিপোর্টাররা একের পর এক ফোন করে অস্থির করে তুলল তাকে, ভূমিকম্প আর লাভা উদগীরণের বিশদ বিবরণ জানতে চাইছে সবাই, জানতে চাইছে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ।

তাসমানিয়ার রাজধানীতে পৌছে এয়ারপোর্টটা খুঁজে নিল মুরল্যান্ড, কথা বলল টাওয়ারের সঙ্গে। মেইন টার্মিন্যাল থেকে আধ কিলোমিটার দূরে ল্যান্ড করার অনুমতি পাওয়া গেল। ল্যান্ড সাইটের ওপর ঝুলে থাকার সময় নিচে লোকজনের বিশাল ভিড় দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে।

এঞ্জিন বন্ধ করে প্যাসেঞ্জার ডোর খোলার পর সব কিছু সুশৃঙ্খল-ভাবে ঘটল। ইমিগ্রেশন অফিসাররা কপ্টারে চড়লেন, পাসপোর্ট ছাড়া মুরল্যান্ড আর বাচ্চা দুটোর অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করলেন তাঁরা। সোশিয়াল সার্ভিস কর্তৃপক্ষ মলির ছেলে দুটোর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিল, মুরল্যান্ডকে কথা দিল জনককে খুঁজে পাওয়ামাত্র ওদেরকে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হবে।

তারপর ক্লান্ত ও অভুক্ত মুরল্যান্ড যে-ই মাত্র কপ্টার থেকে নামল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশো রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার ছেঁকে ধরল তাকে, তার নাকের চারপাশে মাইক্রোফোন ঠেলে দিল, টিভি ক্যামেরা তাক করল মুখে, চিৎকার করে এক হাজার একটা প্রশ্ন করছে।

মুখে হাসি ঝুলিয়ে একটা মাত্র প্রশ্নের জবাব দিল মুরল্যান্ড, আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রথম যে ক'জন নিহত হয়েছে তার মধ্যে রডনি বুমারও আছেন।

রিপোর্টারদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এয়ারপোর্টেই সিকিউরিটি পুলিসের অফিসে আশ্রয় নিল মুরল্যান্ড, ওখান থেকে যোগাযোগ করল ইউ. এস. কনসুলেট প্রধানের সঙ্গে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কপ্টার রিফুয়েলিঙের খরচ মেটাতে রাজি হলেন তিনি। নিমবাস দ্বীপে ফেরার জন্যে রিটার্ন ফ্লাইট আবার দেরি হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার আপৎকালীন রিলিফ-এর ডিরেক্টর একটা অনুরোধ করায়–মুরল্যান্ড কি কপ্টারে করে ফুড আর মেডিকেল সাপ্লাই নিয়ে যেতে পারবে? রাজি হতে হলো তাকে। রিফুয়েলিং-এর কাজ চলছে, কপ্টারের চারধারে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সে। কপ্টারের প্যাসেঞ্জার সীট খোলার কাজ শুরু হলো একটু পরই, ফুড আর মেডিকেল সাপ্লাইয়ের জন্যে আরও জায়গা দরকার। একজন রিলিফ ওয়ার্কার পনির ভরা বিরাট একটা স্যান্ডউইচ আর বিয়ারের কয়েকটা বোতল নিয়ে আসায় কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল মুরল্যান্ডের মন

তাকে অবাক করে দিয়ে টাওয়ার থেকে এক লোক এসে জানিয়ে গেল একটু পরই তার সঙ্গে দেখা করবেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে, পাগল কিনা ভাবছে। মাত্র চার ঘণ্টা আগে অ্যাডমিরালের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে সে, তখন তিনি ফিজির কাছাকাছি শুভা দ্বীপে ছিলেন।

রহস্যটা পরিষ্কার হলো ইউ. এস. নেভির একটা সুপারসনিক ফাইটার যখন ল্যান্ড করল রানওয়েতে। কপ্টারের কাছেই থামল সেটা, বুদ্বুদের ঢাকনি তুলে নিচে তাকালেন স্বয়ং জর্জ হ্যামিলটন। মইয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে লাফ দিয়ে অ্যাসফল্টের ওপর নামলেন তিনি, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মুরল্যান্ডকে। 'ববি, তুমি জানো না তোমাকে ফিরে পেয়ে কত খুশি আমি।'

'আমি খুশি নই,' ম্লান সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'খুশি হতাম আমার বদলে এখানে রানা থাকলে।'

'পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়ে সময় নষ্ট করা স্রেফ অর্থহীন,' বললেন অ্যাডমিরাল, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকেও। 'চলো যাই, রানাকে খুঁজে বের করি।'

'তার আগে আপনি কাপড় পাল্টাবেন না?'

'এই স্টার ওয়ার সুট খুলব ফ্লাইটে থাকার সময়। নেভিকে ফিরিয়ে দেব আমার যখন সময় হবে।'

পাঁচ মিনিট পর দুই মেট্রিক টন রিলিফ নিয়ে আকাশে উঠল কপ্টার, তাসমান সাগরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে নিমবাস দ্বীপের দিকে। আরও তিন মিনিট পর স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল। রানা এজেন্সির চার্টার করা জাহাজগুলো একে একে নুমার চীফকে রিপোর্ট করছে, তিনটে দ্বীপ থেকেই পেভ লেবার সহ মাইনিং এঞ্জিনিয়ারদের উদ্ধার করতে পেরেছে তারা, ফুল স্পীডে ফিরে যাচ্ছে বাংলাদেশী সমুদ্রসীমার দিকে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নেভিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিমবাস ছাড়াও গুডউইল আর রেড স্যান্ডে রিলিফ সামগ্রী ও ডাক্তার পাঠাতে হবে। দুশো নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সমস্ত কমার্শিয়াল শিপকেও অনুরোধ করা হয়েছে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্যে। বিস্ময়করই বলতে হবে যে ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা দেখে বিপুল প্রাণহানির যে আশঙ্কা করা হয়েছিল তা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। বেশিরভাগ চীনা শ্রমিক লাভা আর অগ্নিঝড়ের পথ থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সুপারভাইজারদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেঁচে গেছে। তবে আশিজনকে নিয়ে গড়া বুমারের সিকিউরিটি ফোর্স প্রায় পুরোটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, গুরুতর দগ্ধ মাত্র সাতজনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের বেশিরভাগই মারা গেছে ফুসফুসে ছাই ঢোকায়।

শেষ বিকেলের দিকে লাভার উদ্‌গীরণ শ্লথ হয়ে এল। ফাটল আর শ্যাফটের মুখ থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে এখনও নামছে স্রোত, তবে অলস গতিতে। দুটো আগ্নেয়গিরিই আকারে আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে। রডগার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, রয়ে গেছে চওড়া ও কুৎসিত একটা গর্ত। উইংকেলম্যানকে দেখে মনে হবে উটের কুঁজ, আগের উচ্চতা সিকি ভাগে নেমে এসেছে।

লেগুনের পানি নোংরা হয়ে গেছে, আবর্জনায় ভর্তি। দ্বীপের মাত্র কয়েকটা বিল্ডিংই দাঁড়িয়ে আছে, তবে কোনটাই অক্ষত নয়। বনজঙ্গল সবই নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

লেগুনের ওপর চলে এল ওদের কপ্টার। ইয়টটাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে মুরল্যান্ডের বুক ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল। ডক পুড়ে গেছে, লাভার ভারে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বেশিরভাগ।

অ্যাডমিরাল শুধু আতঙ্কিত নন, অপরাধবোধে জর্জরিত হচ্ছেন। 'এত লোক মারা গেল,' বিড়বিড় করছেন তিনি, 'আমি দায়ী, আমি দায়ী।'

শান্ত চোখে তাঁর দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'এখানে একজন লোক মারা

গেছে, তার বিনিময়ে অন্য জায়গায় দশ হাজার লোক বেঁচে গেছে। সব মিলিয়ে অন্তত বিশ লাখ লোককে আপনি নতুন জীবন দান করেছেন।'

'তবে...' বিষণ্ণ চিত্তে মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল।

একটা রেসকিউ শিপ-এর ওপর দিয়ে উড়ে এল মুরল্যান্ড, এরই মধ্যে লেগুনে নোঙর ফেলেছে। নিমবাসে প্রথমে নেমেছে অস্ট্রেলিয়ান আর্মির একটা ইউনিট প্যারাশুটযোগে, নেমেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করেছে তারা। ওখানেই ল্যান্ড করল ওদের কপ্টার। অস্ট্রেলিয়ান আর্মির একজন মেজর ছুটে এলেন, সঙ্গে এইড। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ! আপনারাই প্রথম রিলিফ নিয়ে এলেন!'

'আমাদের মিশনের লক্ষ্য একটা নয়, দুটো,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সাপ্লাই পৌঁছে দিলাম, এবার এক বন্ধুর সন্ধান চাই–শেষবার দেখা গেছে রডনি বুমারের ব্যক্তিগত ইয়টে।'

মেজর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'সম্ভবত ডুবে গেছে। আন্ডারওয়াটার সার্চ শুরু করার আগে লেগুন থেকে আবর্জনা সরাতে হবে। এক হপ্তার কাজ '

'আমরা ধারণা করছি, বোটটা হয়তো খোলা সাগরে পৌঁছুতে পে রেছিল।'

'আপনাদের বন্ধু কি যোগাযোগ করেছেন?'

অ্যাডমিরাল মাথা নাড়লেন।

'দুঃখিত, তবে বেঁচে গেছেন বলে মনে হয় না।'

'দুঃখিত আমিও।' দেখে মনে হলো অ্যাডমিরাল দশ লক্ষ কিলোমিটার দূরে কোথাও তাকিয়ে আছেন, দরজার পাশে দাঁড়ানো অফিসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। তবে এক সেকেন্ড পরই বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। 'সাপ্লাই খালাস করার কাজে একটু সাহায্য করতে পারবেন কি?'

সাপ্লাই খালাস করার পর হুবার্টে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে মুরল্যান্ড। সে বা অ্যাডমিরাল, কেউই কোন কথা বলছে না। রোটর ঘুরতে শুরু করেছে, এই সময় কপ্টারের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল মেজরকে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত দুটো নাড়ছেন। সাইড উইন্ডো খুলে বাইরে ঝুঁকল মুরল্যান্ড।

'ভাবলাম আপনাদের জানানো দরকার,' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল মেজরের গলা। 'আমার কমিউনিকেশন অফিসার এই মাত্র একটা রিলিফ শিপ থেকে মেসেজটা পেয়েছে। ভাঙাচোরা একটা বোট দেখতে পেয়েছে তারা, নিমবাস থেকে চব্বিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে।'

মুরল্যান্ডের চেহারা বদলে গেল। 'চেক করেছে ওরা? দেখেছে কেউ বেঁচে আছে কিনা?'

'না। বোটটার অবস্থা খুবই করুণ। দেখে মনে হয়েছে পরিত্যক্ত। ক্যাপটেন সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর প্রথম কাজ মেডিকেল টীমটাকে নিমবাসে পৌঁছে দেয়া।'

'ধন্যবাদ, মেজর।' অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল মুরল্যান্ড। 'শুনলেন?'

'তোমার কপ্টার তাড়াতাড়ি আকাশে তোলো,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল।

আকাশে ওঠার দশ মিনিট পর ইয়টটাকে খুঁজে পেল ওরা, নিমবাস থেকে

ঠিক চব্বিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ঢেউয়ের মিছিলে দোল খাচ্ছে। পানিতে অনেক বেশি ডুবে আছে বোট, পোর্টের দিকে দশ ডিগ্রী কাতও। ওপরের অংশ দেখে মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁটা দিয়ে যা কিছু ছিল সব ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। পুরু ছাই জমে আছে ডেকে।

'হেলিকপ্টার প্যাড পরিষ্কারই মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল।

নিরাপদেই ওখানে ল্যান্ড করল মুরল্যান্ড। দু'জনের বুকই ধুকধুক করছে। কেউ জানে না কি দেখতে হবে।

প্রথমে নামল মুরল্যান্ড, রশি দিয়ে ডেকের সঙ্গে কপ্টারটাকে বাঁধল। দু'এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কয়লা হয়ে যাওয়া ডেকের ওপর দিয়ে মেইন সেলুনের দিকে পা বাড়াল ওরা। কোন আওয়াজ না করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক কোণে স্থির হয়ে আছে জোড়া মূর্তি, দেখতে পেয়ে হতাশায় মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো শক্তভাবে বন্ধ করে রাখলেন, মানসিক যাতনা সহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করছেন। দৃশ্যটা এত নিষ্ঠুর মনে হলো, তিনি নড়তে পারছেন না। জোড়া মূর্তি দুটোর মধ্যে জীবনের কোন আভাস বা লক্ষণ নেই। শোক যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটাকে থামিয়ে দেবে। বিষণ্ন বিহ্বলতা গ্রাস করে ফেলেছে তাঁকে। ওরা দু'জনেই তাহলে মারা গেছে, ভাবছেন তিনি।

মলিকে দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে রানা। ওর মুখের একটা পাশ শুকনো রক্তে তৈরি মুখোশের অংশ বলে মনে হচ্ছে। ওর সবটুকু বুকও গাঢ় রঙে রঞ্জিত। কোঁকড়ানো কাপড়, পোড়া ভুরু আর চুল, গলা আর হাতের ফোস্কা, সব মিলিয়ে ভৌতিক একটা চেহারা দাঁড়িয়েছে। মারা গিয়ে থাকলে খুব কষ্ট পেয়েই মরেছে।

আর মলিকে দেখে মনে হচ্ছে সে মারা গেছে এ-কথা না জেনেই যে তার এই ঘুম অনন্তকাল ভাঙবে না।

রানার পাশে হাঁটু গাড়ল মুরল্যান্ড, বিশ্বাস করতে রাজি নয় প্রাণপ্রিয় বন্ধু বেঁচে নেই। আলতোভাবে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল সে, 'রানা! আমার সঙ্গে কথা বলো, দোস্ত!' ফোঁপাচ্ছে সে।

মুরল্যান্ডকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন অ্যাডমিরাল। 'ও চলে গেছে,' বিষণ্ন সুরে ফিসফিস করলেন তিনি।

পরমুহূর্তে দু'জনেই অবিশ্বাসে পাথর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে খুলে গেল রানার চোখ। অ্যাডমিরাল আর মুরল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চিনতে পারছে না। ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠল, বিড়বিড় করল ও, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি।'

***